

মধুসূদন

শশাঙ্কমোহন সেন

মধুসূদন

MADHUSUDAN

(A Critical Appreciation)

Sasanka Mohan Sen

Edited by Prof. Pratap Mukhopadhyay, M A.

Price Rupees Four only

Revised Second Edition

মধুসূদন

(অন্তর্জীবন ও প্রতিভা)

* *

শশাঙ্কমোহন সেন

অধ্যাপক প্রতাপ মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. সম্পাদিত

* * *

এ. মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাইভেট লিঃ কলিকাতা-১২

প্রকাশক ঃ
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
ম্যানেজিং ডিরেক্টার
এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং প্রাঃ লিঃ
২, বঙ্কিম চ্যাটার্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

প্রথম প্রকাশ ঃ ১৯২৮

সংশোধিত দ্বিতীয় সংস্করণ ঃ ১৯৫৯

মূল্য ৪৲ (চারি টাকা) মাত্র

মুদ্রাকর ঃ
শ্রীসত্যচরণ ঘোষ
মিহির প্রেস
৯এ, সরকার বাই লেন
কলিকাতা-৭

॥ উৎসর্গ ॥

বঙ্গভাষা

ও

বঙ্গ সাহিত্যের অভ্যুদয় পঞ্জিকায়

যাঁহার নাম অবিনশ্বর অক্ষরে অঙ্কিত হইয়াছে,

বাঙালী জাতির সারস্বত যজ্ঞের

প্রধান ঋত্বিক্

সেই

স্বনাম-সমুজ্জ্বল

স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

সরস্বতী শাস্ত্রবাচস্পতি

মহোদয়ের করকমলে

বঙ্গবাণীর সেবক কর্তৃক

নবজীবনপ্রাপ্ত নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের আদিকবির

অন্তর্জীবন ও প্রতিভা-ধারণার

এই

অকিঞ্চন গ্রন্থ প্রযত্ন

আন্তরিক শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার

নিদর্শনরূপে

সমর্পিত

হইল।

[মূল উৎসর্গ-পত্রের প্রতিলিপি]

নিবেদন

'নবপর্যায় বঙ্গদর্শনে'র ১৩০৮ সালের বৈশাখ সংখ্যায় 'রচনা সম্বন্ধে জুবেয়ারের বচন' শীর্ষক রচনায় রবীন্দ্রনাথ সাহিত্য সমালোচনার গুরু কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা প্রসঙ্গে জুবেয়ারের রচনার অনুবাদে বলেছেন: 'লেখকের মনের সহিত পরিচয় করাইয়া দেওয়াই সমালোচনার সৌন্দর্য,' এবং অন্যত্র (দ্রঃ 'সাহিত্য-বিচার' প্রবন্ধ) তিনি সমালোচকের ধর্মের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেছেন: 'সাহিত্যের বিচার হচ্ছে সাহিত্যের ব্যাখ্যা......'। প্রস্তুত-গ্রন্থে কবি-অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন মহাশয়ও সমালোচনার মূলপ্রণালীর পরিচয় দিতে গিয়ে লিখেছেন,'......কোন Judgment নহে Interpretation', অর্থাৎ 'উত্তম-অধম' বলে চূড়ান্ত 'রায়' প্রকাশ নয়, তার ব্যাখ্যা-ই প্রকৃত সাহিত্য-সমালোচকের কার্য। যুগন্ধর কবি মধুসূদন দত্তের কাব্যালোচনায় শশাঙ্কমোহন অপূর্ব নিষ্ঠা, অধ্যবসায় ও কবিসুলভ অন্তর্দৃষ্টির সহায়তায় সমালোচকের পবিত্র দায়িত্বকে উদ্‌যাপিত করতে সক্ষম হয়েছেন বলেই আমি মনে করি। আলোচ্য গ্রন্থে তিনি মধুসূদনকে 'ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শক্ষেত্রে ও দেশ-কাল সম্পর্কের পরিবেশে আনিয়া সংস্থাপন পূর্বক তাঁহার (মধুসূদনের) স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি' করার চেষ্টা করেছেন। অথচ তিনি মধুসূদনের কাব্যের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধেও অবহিত আছেন, এবং যথাস্থানে তার উল্লেখও করে গেছেন। কিন্তু মধুসূদনের সমসাময়িক কালের ন্যায় অতি-আধুনিক কালেও কোন কোন স্বয়ং-সিদ্ধ সমালোচক মধুসূদনের অমর-কাব্যের উপরে নখরাঘাত করে যে অশোভন, অশিষ্ট ও বিদূষকোচিত বালচাপল্যের পরিচয় দিয়েছেন, তার জন্যে 'সহৃদয়' ও রসিকজনের মর্মাহত হবার কারণ নেই, তাঁদের জন্যে প্রস্তুত গ্রন্থ থেকে শশাঙ্কমোহনের একটি উক্তি উদ্ধৃত করলাম: "মধুসূদনকে চালাইবার জন্য রামনারায়ণ পণ্ডিত! এ যেন দৈত্যাকৃতি অতিকায় জীবকে চলাফেরা শেখাইবার জন্য অঙ্গুষ্ঠাকৃতি বামনপুরুষের নিয়োগ!......সেক্সপীয়রের সংশোধন

কর্তা গ্যারিক! তবে, এইরূপ বামন-সংশোধক, বামন-সমালোচক এবঞ্চ বামন-পাঠক ইহা তো অতিকায় কবিগণের নিত্যকালের দুরদৃষ্ট!" (পৃঃ ৫৪-৫৫)।

দীর্ঘকাল শশাঙ্কমোহনের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় 'মধুসূদন' পুস্তকটিও বইয়ের বাজার থেকে অন্তর্হিত হয়েছিল। মধুসূদনের কাব্যের প্রতি জিঘাংসা-বৃত্তিজাত সমালোচনা পাঠ করে বাংলাদেশের পাঠক সমাজ বিভ্রান্ত হতে পারেন, এ সম্ভাবনায় আশঙ্কিত হয়েছি। এবং মধুসূদনের কাব্যের যথার্থ মর্ম অনুধাবন করে পাঠকসমাজকে সেই বিভ্রান্তি থেকে উদ্ধার করবার জন্যেই শশাঙ্কমোহনের-আলোচ্য পুস্তকটির প্রকাশ সময়োচিত বলেই আমি মনে করি। বাংলাকাব্য সাহিত্যে আধুনিক যুগের উদ্বোধনকর্তা মধুসূদনের কাব্য-সাধনার প্রকৃত মূল্য ও তাৎপর্য অনুধাবনে এই পুস্তকটি সবিশেষ সাহায্য করবে বলেই আমি বিশ্বাস করি।

শশাঙ্কমোহনের রচনা-রীতি 'দুরূহ' বলে রসিক সমাজে একটি ধারণা আছে, সে ধারণা একেবারে অমূলক নয়। আলোচ্য গ্রন্থেও বহুস্থানে তার প্রমাণ পাওয়া যাবে। তবে গ্রন্থ-সম্পাদনা কালে আমি শশাঙ্কমোহনের রচনা-রীতি যথাসম্ভব অবিকৃত ও মৌলিক রাখবারই চেষ্টা করেছি, নেহাৎ অশুদ্ধ বানান-গুলি সংশোধন এবং বিশ্ববিদ্যালয় প্রবর্তিত আধুনিক পদ্ধতিতে বানানগুলি সাজান ছাড়া শশাঙ্কমোহনের রচনা-রীতিকে দিঙ্‌নাগাচার্যগণের পরামর্শ ক্রমে আমার 'স্থূল হস্তাবলেপ' দ্বারা কলঙ্কিত করিনি। তবে, শশাঙ্কমোহন-কৃত মধুসূদনের ইংরাজি পত্রাবলীর বঙ্গানুবাদ জটিল হয়ে পড়ায় আমি স্থানবিশেষে (বন্ধনীর মধ্যে) মধুসূদনের মূল ইংরাজি পত্রগুলির অংশবিশেষ উদ্ধার করেছি। পরিশিষ্টে প্রস্তুত-গ্রন্থে ব্যবহৃত মধুসূদনের ইংরাজি পত্রাবলীর প্রয়োজনীয় অংশগুলি কৌতূহলী পাঠকদের জন্য সন্নিবিষ্ট করেছি—ইয়োরোপের অনেকগুলি ভাষার ন্যায় ইংরাজি ভাষাতেও মধুসূদনের দখল ছিল, একথা অনেক পাঠকই শুনেছেন, কিন্তু সেই দখলের পরিমাণ যে কতদূর তা' পত্রাংশগুলি থেকে পাঠকগণ সহজেই ধারণা করতে পারবেন।

আলোচ্য গ্রন্থের কয়েকটি দুরূহ বা অপ্রচলিত সংস্কৃত শব্দের অর্থ পরিশিষ্টে যোজনা করেছি, সহৃদয় পাঠকবর্গ সেগুলি শ্রমস্বীকারপূর্বক দেখে নিলেই বাধিত হবো। বলা বাহুল্য, অর্থ যোজনার ব্যাপারে আমি মূলতঃ জ্ঞানেন্দ্র-মোহন দাসের দুই খণ্ডে সম্পূর্ণ বঙ্গাভিধানের সহায়তা গ্রহণ করেছি। এ ছাড়া শশাঙ্কমোহনের একটি সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং শব্দসূচীও রচনা করেছি। আন্তরিক চেষ্টা সত্ত্বেও কিছু কিছু মুদ্রাকর প্রমাদ রয়ে গেছে, সেগুলি সংশোধন করে পরিশিষ্টে দেওয়া গেল।

পরিশেষে যাঁদের উৎসাহ, সক্রিয় সহযোগিতা ও আন্তরিক শুভেচ্ছা জ্ঞাপনের ফলে আমার মত সামান্য ব্যক্তির পক্ষেও দুরূহ গ্রন্থ-সম্পাদনের কাজ সম্পূর্ণ করা সম্ভবপর হোল তাঁদের নামোল্লেখ না করলে প্রত্যবায়ের ভাগী হওয়ার আশঙ্কা আছে। আমি প্রথমেই আমার পিতৃকল্প অধ্যাপক শ্রদ্ধেয় শ্রীকালীপদ সেন, এম্. এ. মহাশয়ের চরণে আমার কৃতজ্ঞতা ও প্রণাম জ্ঞাপন করলাম তিনি এ-পুস্তকটি প্রকাশের জন্য প্রভূত পরিশ্রম করেছেন এবং পুস্তকটির আদ্যন্ত পাণ্ডুলিপি দেখে দিয়েছেন। বস্তুত গ্রন্থ প্রকাশের সমস্ত কৃতিত্ব তাঁরই, এর দোষত্রুটি আমার। তাছাড়া শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক ডঃ শ্রীসুকুমার সেন, এম্. এ., পি. এইচ্. ডি., ডঃ শ্রীবিনোদবিহারী দত্ত, এম্. এ., পি. এইচ্.ডি., অধ্যাপক ডঃ শ্রীহর-প্রসাদ মিত্র, এম্. এ., ডি. ফিল্., অধ্যক্ষ শ্রীজনার্দন চক্রবর্তী, এম্. এ., অধ্যাপক শ্রীআশুতোষ ভট্টাচার্য, এম্. এ., ডঃ শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পি. এইচ্. ডি., এবং বিভিন্ন কলেজের সহকর্মী ও বাঙ্‌লা সাহিত্যের প্রতিষ্ঠাবান্ অধ্যাপকবন্ধুদের উৎসাহ, প্রবর্তনা ও নির্দেশে আমি ধন্য হয়েছি। তাঁদের সকলের প্রতিই আমার কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই। সুখ্যাত পুস্তক প্রকাশক এ, মুখার্জী অ্যাণ্ড কোং-এর স্বত্বাধিকারী শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায় মহাশয় বইটির মূল্য উপলব্ধি করে প্রকাশের দায়িত্ব নিয়ে শুধু আমার নয়, বাঙ্‌লাদেশের অসংখ্য বাংলাসাহিত্যের অনুরাগী পাঠক ও ছাত্র-ছাত্রীদের ধন্যবাদের পাত্র হলেন, সন্দেহ নেই। স্বর্গত শশাঙ্কমোহনের পত্নী শ্রীমতী মণিকুন্তলা সেন এবং তাঁদের আত্মীয় শ্রদ্ধেয় শ্রীবিপিনবিহারী দাশগুপ্ত মহাশয় আমাকে সর্ববিধ সাহায্য করে ধন্য করেছেন।

গ্রন্থখানির মুদ্রণোপযোগী পাণ্ডুলিপি এবং শব্দ-সূচী তৈরী করার ব্যাপারে আমার স্ত্রী শ্রীমতী প্রীতি মুখোপাধ্যায়, এম্. এ. কাব্যতীর্থ প্রভূত সাহায্য করেছেন।

শেঠ আনন্দরাম জয়পুরিয়া কলেজ
কলিকাতা-৫
২৩শে জানুয়ারী, ১৯৫৯

প্রতাপ মুখোপাধ্যায়

শশাঙ্কমোহন সেন

কবি-অধ্যাপক শশাঙ্কমোহন সেন (গুপ্ত) বাঙ্‌লা সাহিত্য-সমালোচনার ক্ষেত্রে আশ্চর্য প্রতিভার পরিচয় দিয়েছেন। তাঁর বহুমুখী প্রতিভার স্পর্শে বাঙ্‌লা সমালোচনা-সাহিত্য বিশেষ পুষ্ট হয়েছে। ইনি চট্টগ্রামের ধলঘাট নামক স্থানে ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ১লা জুলাই জন্মগ্রহণ করেন। ৺ব্রজমোহন সেনগুপ্ত ইঁহার পিতা এবং ইঁহার মাতার নাম বিশ্বেশ্বরী দেবী। শশাঙ্কমোহন প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে সংস্কৃত অনার্স সহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হ'ন। অতঃপর বি. এল. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে চট্টগ্রামে কিছুদিন ওকালতি করেন। সাহিত্য-সেবায় আশৈশব আসক্তি থাকায় ইনি বঙ্গগৌরব স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের আহ্বানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবপ্রবর্তিত এম্. এ. ক্লাসের বাঙ্‌লা সাহিত্যের অধ্যাপনার কাজে যোগদান করেন। ইনি 'সিন্ধুসঙ্গীত', 'শৈলসঙ্গীত', 'বিমানিকা', 'স্বর্গ মর্ত্ত্যের প্রেমগাথা' 'সাবিত্রী' প্রভৃতি কাব্য-গ্রন্থ রচনা করেন।. ১৯২১ খৃষ্টাব্দে তিনি "গোপালদাস চৌধুরী-অধ্যাপক-রূপে" যে বক্তৃতা করেন, 'মধুসূদন—অন্তর্জীবন ও প্রতিভা' সেই বক্তৃতারই ফল। ইঁহার বঙ্গবাণী' ও 'বাণী মন্দির' দুটি মূল্যবান সমালোচনা গ্রন্থ। উন্মাদ কনিষ্ঠ ভ্রাতা কর্তৃক অসুস্থ অবস্থায় আহত হয়ে ১৯২৮ খৃষ্টাব্দের ১৬ই এপ্রিল শশাঙ্কমোহন দেহত্যাগ করেন। একদিকে কবি ও সমালোচক হিসাবে পরবর্তীকালে বাঙলা-সাহিত্যের ক্ষেত্রে যাঁদের খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হ'য়েছে, আচার্য শশাঙ্কমোহন তাঁদের অনেকেরই পূর্ববর্তী। তাঁর অন্যান্য সমালোচনা গ্রন্থের এবং তাঁর কাব্যগুলির পুনঃপ্রকাশ হ'লে বাংলা সাহিত্যের সমৃদ্ধি বাড়বে।

প্রসঙ্গ-সূচী

পূর্বভাষ

কবির জীবনী-লেখক সাধারণতঃ তাঁহার বহির্জীবনের অবস্থা এবং ঘটনা-বিকাশের দিকেই মুখ্যভাবে দৃষ্টি আবদ্ধ করিতে বাধ্য হ'ন। কিন্তু, প্রকৃত সাহিত্য-চিন্তককে কবির অন্তর্জীবনটিই মুখ্যভাবে চিন্তা করিয়া চলিতে হয়। বৃক্ষ শাখা-প্রশাখা ও শিকড়পত্র বিস্তার করিয়া বহির্জগতের আলোক-বায়ু-রস এবং মৃত্তিকার সঙ্গে গ্রহণবর্জনের সম্বন্ধ স্থাপনে আপন জীবিকা অর্জন করে; কালে কালে নব নব ভাবে শাখাপত্রত্বক্ অর্জন-বর্জনের পথেই অন্তরঙ্গে সসার হইয়া দাঁড়ায় এবং সারাংশটুকুই তাহার বৃক্ষস্বরূপে সংসারে দীর্ঘকালের জন্য রাখিয়া যায়। তেমনি, কবিগণও জীবনের বহির্মুখী প্রণালী হইতে নিজের ভাবাত্মা-রূপী সারাংশটুকু বর্ধিত করেন এবং উহাকেই সাহিত্যক্ষেত্রে নিজের চূড়ান্ত বিত্ত এবং প্রাপ্তিরূপে রাখিয়া যান। সাহিত্যজগতের পক্ষে কবির এই ভাবময়-অন্তর্দেহ এবং বাণীক্ষেত্রে উহার উপায়নটুকুই মুখ্য বিষয়। কবি মধুসূদনের এই ভাবময় সূক্ষ্মশরীরটাই বঙ্গসাহিত্যের অমর পদার্থ; সুতরাং আমরা কবির মর্মকায়াকে ধারণা করার উদ্দেশ্যেই অবহিত হইব। বঙ্গদেশের একটি ক্ষুদ্র গ্রামে [সাগরদাঁড়ি] প্রকটিত হইয়া, সংসারের যাবতীয় সুখ-দুঃখ অবস্থার মধ্য দিয়া যেই 'ব্যক্তি' আপনার সারাংশ বর্ধিত করিয়া চলিয়াছিলেন, তিনি স্বরচিত কাব্যাবলীর মধ্যে স্বকীয় ব্যক্তিত্বকে অনুস্যূত করিয়া বাঙ্গালীর জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। 'শর্মিষ্ঠা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী' পর্যন্ত কাব্যগুলির মধ্যে, উহাদের অন্তর্গত এবং অতীত ভাবেও কবি মধুসূদন দাঁড়াইয়া আছেন—উক্ত 'ব্যক্তি'টাকেই বাঙ্গালীর প্রকৃত দরকার।

ফলতঃ এ-আলোচনার প্রধান লক্ষ্য হইবে—যেমন কবির ব্যক্তিত্বের, তেমন ওই ব্যক্তিত্ব হইতে অনুপ্রাণিত তাঁহার কাব্যসমূহের অভ্যন্তরে দৃষ্টি। গ্রন্থের সমস্ত ভাষা ও ভাব-পরিব্যক্তির চরিত্র মধ্যে, উহার বাহ্যিক ও আন্তরিক আকার এবং চরিত্রের লক্ষ্যীভূত কেন্দ্রটুকুর মধ্যেই যেমন গ্রন্থের, তেমন কবিরও ব্যক্তিত্ব! এস্থলে যেমন গ্রন্থের, তেমন কবির অন্তরাত্মার স্পর্শও অনুভব করা যায়। অতএব আলোচনায় মধুসূদনরূপী 'ব্যক্তি'কে তাঁহার সাংসারিক জীবনের ঘটনাগতি, শিক্ষা

এবং অদৃষ্টনিয়তির বিবর্তফল স্বরূপে দৃষ্টি করিতেই চেষ্টা হইবে। যে-নিয়তি বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালীজাতির অদৃষ্টকেও নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন, মধুস্থদনের সাংসারিক জীবনে এবং কবিজীবনে সেই নিয়তির প্রকৃতি এবং স্বরূপ চিন্তা করিতেই স্থতরাং চেষ্টা হইবে। কবি মধুস্থদন এবং তাঁহার শিল্পকার্যকেও বিশ্বপ্রকৃতির একটা সার্থক কার্যফলরূপে ধারণা করিলেই প্রকৃত সত্যের ধারণা হইতে পারে; এবং উক্ত ফলের সাহায্যে তাঁহার প্রতিভা, কবিত্বসিদ্ধি এবং কবিজীবনের প্রকৃতিও নিরূপিত হইতে পারে।

স্থতরাং, আমাদের মূল প্রণালী হইবে, মধুস্থদনের শিল্পকার্যের 'উত্তম-অধম' বলিয়া রায় প্রকাশ নহে, উহাকে সম্যক্ গ্রহণ। কোন Judgment নহে Interpretation! কোন 'বাঁধা গৎ' বা স্থিরনিশ্চল শাস্ত্রশাসনের তুলাদণ্ডে তুলিয়া উহার 'ভালমন্দ'তার ধারণা এবং পরিমাপ নহে; উহাকে তাঁহার অন্তর্জীবন এবং প্রতিভার একটা সবিশেষ বিবর্তফলরূপেই ধারণা—উহার স্বরূপ ধারণা।

আমরা চিরকাল বলিয়া আসিতেছি, সাহিত্যের ক্ষেত্রে পাঠকের প্রধান দুর্বলতা এই যে, তাহারা জানিতে চায়, সমালোচক বলিবেন 'কে শ্রেষ্ঠকবি'। 'পরের মুখে ঝাল খাইতে' চেষ্টা করিয়া পাঠকগণ এইরূপে সমালোচকের দ্বারা প্রবঞ্চিত হইতে চাহে! সাহিত্যপ্রবেশের গোড়াতেই প্রত্যেক তত্ত্বপ্রয়াসী পাঠককে এইরূপ প্রশ্ন-প্রবৃত্তি হইতে আদৌ সতর্ক হইয়া দাঁড়াইতে হইবে। বুঝিতে হইবে, এ প্রশ্নের প্রকৃত কোন সদুত্তর নাই। এক্ষেত্রে উত্তর মাত্রেই বক্তার স্বকীয় 'রুচি' মাত্র প্রকাশ করিবে বলিয়াই উহার সদুত্তর নাই! এই হতভাগ্য প্রবৃত্তিকে 'যত পারা যায়' কশাঘাত করিয়াই চলিতে হয়। সকল প্রকৃত কবিই নিজ নিজ বিশিষ্টতার ক্ষেত্রে 'শ্রেষ্ঠ'। সেকস্‌পীয়র শ্রেষ্ঠ কবি', একথা মুখস্থ করিয়া কোন বালক যদি ইংরেজী সাহিত্যের মিল্‌টন, ওয়ার্ডসোয়ার্থ, শেলী, কীট্‌স বা ব্রাউনিংকে কোণে ঠেলিয়া রাখে, তদপেক্ষা ভ্রান্তি এবং দুর্ভাগ্যের কথা আর হইতে পারে না। বুঝিতে হইবে, কর্মফলের মোটামুটি ওজনের ক্ষেত্রেই হয়ত সেকস্‌পীয়রকে 'শ্রেষ্ঠকবি' বলিতে পারা যায়—কিন্তু সাহিত্যে সর্বপ্রকার ওজনের বেলাতেই, সংখ্যার বৃহত্ত্ব

অপেক্ষা বরং গুণগত বিশিষ্টতা এবং দুর্লভতাই মহার্ঘ জিনিষ। তাঁহারা যে প্রত্যেকে স্বক্ষেত্রে, যেমন সেকস্‌পীয়র হইতে তেমন পরস্পর হইতেও স্বতন্ত্র এবং বড়! প্রত্যেকেই স্বাতন্ত্র্য-সিদ্ধ-'ব্যক্তি' বলিয়া, একের যাহা বিশিষ্টতা, তাহা অপরের নহে। আমাদের বঙ্গদেশের 'বড়' কবিগণের বিষয়েও একথা প্রযুক্ত হইতে পারে। যে পাঠক মধু-হেম-নবীন-রবীন্দ্রের একজনকে বাদ দিল, সে চিরকালের জন্য ভাব এবং চিন্তার বিশেষ বিশেষ দিকে দরিদ্রই থাকিয়া গেল। তাহার দারিদ্র্য অপনয়ন করিবে কাহারও সাধ্য নাই! 'বড় কবি'মাত্রেই যে কোন-একটা দুর্লভ এবং বিশিষ্ট গুণেই 'বড়'—ইহা সকল সাহিত্যপ্রবেশের গোড়ার কথা। উক্ত বিশিষ্টতার উপলব্ধি এবং উহার সঙ্গে সহানুভূতি সিদ্ধিই যেমন সমালোচকের, তেমন পাঠকের সাধনা! এই আদর্শগতিকে আধুনিক সাহিত্যে সমালোচনার একটা অভিনব প্রণালী প্রচলিত হইতেছে। অতএব উক্ত প্রণালীতে মধুসূদনকে ভারতীয় সাহিত্যের আদর্শক্ষেত্রে এবং দেশ-কাল-সম্পর্কের পরিবেশে আনিয়া সংস্থাপন পূর্বক তাঁহার স্বতন্ত্রতা উপলব্ধি করাই বর্তমান আলোচনার লক্ষ্য হইবে।

কবির এই 'ব্যক্তিত্ব' ধারণার প্রণালী কি? বলিতে হইবে কি, যে উহা অন্তর্দৃষ্টির প্রণালী? সাহিত্য মনুষ্যের 'মানসী সৃষ্টি' বলিয়া, কবির দিক হইতে মানসিক তন্ময়তা ব্যতীত যেমন সাহিত্যের 'সৃষ্টি' হয় না, তেমন মনস্তত্ত্বে সমাহিত বুদ্ধি এবং সহানুভূতি ব্যতীত সাহিত্যের প্রকৃত উপলব্ধি এবং সমালোচনাও হয় না। কবি এবং সমালোচক উভয়ের পক্ষেই অন্তর্দর্শন অপরিহার্য। সমালোচনার ক্ষেত্রে সৃষ্টি-শক্তির কার্যও নিতান্ত সামান্য নহে। মনের দুইটি প্রধান ব্যাপার—সংশ্লেষণে, সমীকরণে এবং একীকরণে সৃষ্টি; বিশ্লেষণে, ব্যবকলনে এবং ব্যাখ্যাপনেই সমালোচনা! দূরদৃষ্টি এবং অদৃষ্ট-বিভাবনী মনঃশক্তির পরিচালনা ব্যতীত প্রকৃত ব্যাখ্যাও দাঁড়ায় না। সুতরাং, বলা বাহুল্য যে, অন্তর্দর্শনের প্রণালীতেই মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও প্রতিভা আলোচিত হইবে এবং উহাকে ভারতীয় ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যের পূর্বাপর আদর্শ-পরিবেশে স্থাপনপূর্বক উহার বিশিষ্টতার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেই চেষ্টা হইবে।

প্রাগুক্তরূপে আমরা, নব্য-বাঙ্গালার আদিকবি মধুসূদনের অন্তর্জীবন ও বহির্জীবনের যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাঁহার প্রতিভার যাহা প্রকৃত বিশেষত্ব, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার কাব্যাদির যাহা প্রকৃত মূল্য, তাঁহার কবি-কার্য মধ্যে বাঙ্গালীর জাতীয় জীবন ও সভ্যতার এবং বঙ্গসাহিত্যের সযত্নরক্ষণীয় ভাণ্ডারে যাহা প্রকৃত অনশ্বর পদার্থ, কোনরূপ অতিশয়োক্তি বিনা তাহাই ধারণা করার চেষ্টা করিব।

বঙ্গের আধুনিক সাহিত্যের ক্ষেত্রে মধুসূদন নানাদিকেই 'আদিকবি', নূতন পথের প্রদর্শক এবং পূজ্যপদবীতে অধিরূঢ় গুরুস্থানীয়। সুতরাং, মধুসূদনকে বুঝিতে পারিলে, পরবর্তী ৬০ বৎসরের বঙ্গসাহিত্যের মূল-প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তিকেও নানাদিকে বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা প্রসঙ্গাধীন স্থানে স্থানে উহার সূত্র নির্দেশমাত্র করিয়া চলিতে পারিব এবং উক্তসূত্রে বঙ্গে 'পাশ্চাত্য-সাহিত্য' আদর্শের আদি প্রবর্তনার ইতিহাসও নানাদিকে নির্দেশিত হইয়া যাইবে।

এরূপ আদর্শে আমরা পূর্বে 'বঙ্গবাণী' গ্রন্থে হেমচন্দ্র ও বঙ্কিমচন্দ্রের প্রতিভার সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিয়াছি ; মধুসূদনকে তদপেক্ষা ঘনিষ্ঠ এবং বিস্তারিতভাবে দৃষ্টি করার সুযোগ পাওয়া গিয়াছে।

এক্ষেত্রে শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু ও নগেন্দ্রনাথ সোম প্রভৃতি লেখকগণের নিকট আমাদের কৃতজ্ঞতা রহিল। ঐ সকল পূর্বসূরী কর্তৃক প্রকাশিত মধুসূদনের জীবনবৃত্তান্ত, বিশেষতঃ কবির নিজের ও তাঁহার বন্ধুবান্ধবগণের চিঠিপত্রই এ-আলোচনায় আমাদের প্রধান সহায় হইবে। এবং যাঁহার বঙ্গসাহিত্য-প্রীতি ও বদান্যতার গতিকে আমরা আলোচনার জন্য এই অপূর্ব অবসর লাভ করিয়াছি, সেই গোপালদাস চৌধুরী মহোদয়ের নামটিও এতৎসম্পর্কে স্মরণীয় হইয়া রহিল।

পরিশেষে, প্রক্রান্ত বিষয়ে বক্তা ও শ্রোতার পরস্পর সহযোগ, সহানুভূতি এবং সহচিত্ততা আমন্ত্রিত করিয়া এতদ্দেশের সেই চিরাগত সংকল্প মন্ত্রটিই পাঠ করিব—

"সহনাববতু, সহ নৌ ভুনক্তু, সহচিত্তং করবাবহৈ"।

মধুসূদন

১

কবি মধুসূদনের জীবন! এক্ষেত্রে আমাদিগকে প্রথমেই বলিতে হয়, কবিগণের জীবন প্রায়ই কোন বাহ্যিক ঘটনার প্রাবল্যে কিংবা মাহাত্ম্যে চিত্ত আকর্ষণ করিবার দাবী করিতে পারে না। যাঁহারা ভাবজগতের অধিবাসী, ভাবই যাঁহাদের জীবনের প্রধান উপজীব্য এবং যাঁহারা ভাবুকতার শক্তি দেখাইয়াই জগৎকে আকৃষ্ট করিতে চাহেন, তাঁহাদের অন্তর্জীবনটির দিকেই মানুষের প্রধান দৃষ্টি! মানুষ উহাই জানিতে চায়। কোন্ কাব্য কবি-জীবনের কোন্ অবস্থায় রচিত হইয়াছে, আত্মজীবনের অভিজ্ঞতা হইতে কবি কাব্যের কোন্ উপকরণটি পাইয়াছেন, তাঁহার সত্যজীবনের সঙ্গে কাব্যটীর কোন কার্য-কারণ সম্বন্ধ আছে কি? তাঁহার কাব্য কিরূপে শূন্যের গর্ভেই উপকরণ সংগ্রহ করিয়া জমাট হইয়া উঠিল, ভাবরসে কিরূপে প্রাণলাভ করিল, কিরূপে সৃষ্টিলাভ করিল? মনুষ্য-সমাজের ইহা চিরকালের কুতূহল। দুঃখের বিষয়, উহা সকল সময় চরিতার্থ হইতে পারে না। কারণ কবিগণ অনেক সময়েই তাঁহাদের সমসাময়িক সংসারে নগণ্য ব্যক্তি; কবি বলিয়া পরিচিত হইবার অথবা সম্মান লাভ করিবার পূর্বে সংসারের লোকের তাঁহাদের দিকে আকৃষ্ট হইবার কোন হেতু অনেক স্থানেই থাকে না! যে জীবনযুদ্ধে নগণ্য, যে সমাজমধ্যে কোনরূপে একটা কোলাহল তুলিবার জন্য শক্তিহীন, কার এমন দায় পড়িয়াছে যে তাহার গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া রাখে! অজ্ঞাত ভবিষ্যতের কাজে আসিবে ভাবিয়া ঐ অজ্ঞাতনামা মনুষ্যের মনোভাব-বিজ্ঞাপক কথাবার্তাগুলি টুকিয়া রাখে! কোনও একদিন মহার্ঘ সত্যের দেশেই আলোকপাত করিবে স্থির করিয়া তাহার চিঠিপত্রগুলিও যত্নপূর্বক রক্ষা করে! সমাজে এইরূপ ঘটনা অনেক স্থানেই সম্ভবপর হয় না। উহার ফলে, জগতের মহাকবিগণের জীবন এবং মনের গতি বিষয়ে আমাদের সত্যজ্ঞান এতই সামান্য! এমন যে সেকস্পীয়র, যিনি 'সর্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ' বলিয়া পৃথিবী আজ মনে করিতেছে, ইংলণ্ডবাসী যাঁহার নাম লইয়া আজ গৌরব করিতেছে—তাঁহার জীবনবৃত্তান্ত একেবারে শূন্য বলিলে

অত্যুক্তি হয় না। 'এলিজাবেথ যুগে'র অনেক বড়-ছোট, অনেক অজ্ঞাতনামা, বিস্মৃতনামা ব্যক্তির ইতিকথায় সমসাময়িক বাণীভাণ্ডার পরিপূর্ণ আছে; কিন্তু সর্বাপেক্ষা বড় যে ব্যক্তিটি ছিলেন, তিনি এত বৃহৎভাবে সকলের সমস্তের সঙ্গে এত মিশিয়া চলিতেছিলেন যে, মানুষ তাঁহার সীমা পরিচিহ্ন করিয়া তাঁহাকে একটা 'ব্যক্তি' বলিয়াই ঠাওরাইতে পারে নাই; তাঁহাকে অভিনিবেশযোগ্য এবং উল্লেখযোগ্য পদার্থ বলিয়াই মনে করিতে পারে নাই। তাঁহার সহযোগিগণ—তাঁহার বন্ধুগণ, তথাকথিত অনুগ্রাহক এবং মুরুব্বিগণ, যাঁহারা এখন তাঁহার নাম সম্পর্কের জোরেই ইতিহাসে নামস্থ হইয়া আছেন, তাঁহারাও এই লোকটাকে এমনভাবে চিনিতে পারেন নাই যে তাঁহার বিষয়ে দুটি কথা লিখিয়া যাওয়া আবশ্যক মনে করেন! সকল প্রাচীন কবির বিষয়েই একথা প্রযুক্ত হইতে পারে। আমাদের কালিদাসের বিষয়েই বা আমরা কি এবং কতটুকু সংবাদ রাখা আবশ্যক মনে করিয়াছি! অথচ কালিদাস ত তৎকালের একজন মহাপরাক্রান্ত নরপতিসভার 'নবরত্নে'র মধ্যে শ্রেষ্ঠ রত্ন ছিলেন! সাহিত্যসেবীর প্রকৃত-জীবনী রচিত হইবার উপযোগী সম্ভাবনাই সমাজে নাই; কেবল আধুনিক কালের গ্যেটে-ই সাহিত্য-জগতের এই অভাব বুঝিয়া স্বয়ং কিয়ৎ পরিমাণে পূরণ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। গ্যেটের উন্নত সামাজিক পদবী—এবং প্রতিষ্ঠা—গতিকেই হউক, কিংবা ভক্তিশীল সদ্বন্ধুর সংঘটনা গতিকেই হউক, গ্যেটের সাহিত্য-জীবনী এবং সাহিত্যিক—মতিগতি বিষয়ে আমরা অনেক সংবাদ পাইতেছি! অন্ততঃ একজন সাহিত্য-সাধকের মানসিক গতিরেখা এবং সাহিত্যকর্মের ধারা আমরা লক্ষ্য করিতে পারিতেছি। গ্যেটের পর হইতেই সাহিত্যজগতে কবিজীবনী রচনা এবং কাব্যবিচার করার এক নব পদ্ধতি প্রবর্তিত হইয়াছে বলিয়াই ধারণা হইতে থাকে! একে ত জগতের স্রষ্টা প্রত্যেক মনুষ্যের অন্তরাত্মাকে একরূপ দুর্ভেদ্য প্রাচীর দিয়াই পরস্পর হইতে দূরবর্তী করিয়া রাখিয়াছেন—মানুষকে পরস্পরের অন্তর্যামী হইবার স্বত্ব ভগবান্ দেন নাই। যাহার সঙ্গে ইহজীবনের জন্য দুশ্ছেদ্য বন্ধনেই বাঁধা পড়িয়াছি, চিরজীবনের সঙ্গী বলিয়াই যাহাকে বুঝিতে এবং পাইতে চাই, খাওয়া-পরা

চলায় এবং সুখ-দুঃখে যে আমার নিত্যবন্ধু তাহার বিষয়েই যে চিরকালের দ্বীপান্তর দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া আছি! এই ঘোর অন্ধকারেই যে চলিতে হইতেছে! ইহা ত ইহজীবনের নির্বাসন দণ্ড! সুতরাং বাহিরের বিষয়ে, সুদূরস্থ কিংবা অনাত্মীয়ের বিষয়ে আর কথা কি? আত্মীয় শব্দটাই ত একটা ভুল! মনুষ্যজীবনের এই নিত্য সত্য অন্ধকারকে স্বীকার করিয়াই চলিতে হয়! তবে, মানুষ একটা আত্মাবান পদার্থ, তাই আত্মার বিষয়ই তাহার প্রধান খাদ্য! এইজন্য ভাব ও চিন্তা তাহার অন্তরের আহার—ভাবুকতায় তাহার আনন্দ; মানুষের অন্তর্জীবনের বিষয় জানিয়াই তাহার পরম তৃপ্তি! মানুষ যতই শিক্ষা এবং উন্নতি লাভ করে, যতই তাহার মন সমর্থ হয়, ততই তাহার আত্মার ক্ষুধা বাড়িয়া যায়, ততই সে বাহিরের আত্মা পদার্থকে বুঝিতে এবং আপনার করিতে চায়! তাই কাব্যপাঠে মানুষের আনন্দ! কবিগণ নিজের অন্তরাত্মাকে কাব্যের মধ্যে পরের ভোগযোগ্য করিয়া প্রকাশ করিতে চেষ্টা করেন; আপনার ভাবনা এবং চিন্তাগুলিকে জগতের খাদ্যরূপে উপস্থিত করিতে পারেন; তাই কাব্য উপাদেয়। কিন্তু কাব্যপাঠের প্রকৃত রস-বোধ বলিয়া যে জিনিষ, উহার সঙ্গে সঙ্গে কবিকে জানিতে পারিলে যেমনটি হয়, তেমন আর কিছুতেই হয় না। কবি সরল, কেননা সরলতা ব্যতীত প্রকৃত কবিতা হয় না। যে কবি সরলভাবে নিজের হৃদয়ের কম্পনগুলি ভাষার মুখে এবং ছন্দের স্পন্দনের মধ্য দিয়া আমার বুকে লাগাইতে পারিলেন না, তাঁহার কবিতা চিরকাল আমার নিকট মড়ার মতই পড়িয়া থাকিবে। যাহার কথা আমার "কাণের ভিতর দিয়া মর্মস্পর্শ" করিল, তাহাকে এই অন্ধকারে একজন সঙ্গীর মত, একজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর মতই পাইয়া বসিলাম! তাহার বিষয়ে, তাহার কাব্যকবিতার উৎপত্তি এবং মর্ম বিষয়ে, তাহার নিজের কথাগুলি শুনিতে এজন্য এতই আনন্দ। উহার দরুণ আধুনিক সাহিত্যজগতে একটা বাড়াবাড়িই জমিয়া বসিয়াছে। কবিগণের সংসার-জীবনের অতি সামান্য চিঠিপত্র, এমন কি বাজারের হিসাব পর্যন্ত মানুষ মহার্ঘবোধে মুদ্রিত করিয়া রাখিয়া দিতেছে। কি জানি, যদি উহাতেও কবির প্রতিভা বুঝিবার সাহায্য হয়; আত্মীয়টিকে আর একটু নিকটভাবে আত্মীয় করা যায়! ফলে, কবির

চিঠিপত্র, কবির সামান্য আলাপ-প্রলাপের বিবৃতি, তাঁহার বিষয়ে বন্ধু-বান্ধবের সামান্যমাত্র স্মৃতি—এসমস্ত অতি যত্নে সংগৃহীত এবং রক্ষিত হইতে চলিয়াছে! এ সমস্ত হইতে যে সকল সময়ে লাভ উদ্বৃত্ত হয়, কবির বিষয়ে আমাদের প্রকৃত জ্ঞান বা ভক্তি বাড়াইয়া দিতে যে সাহায্য পাওয়া যায়, তাহাও নহে। তবু, সত্য! মানুষ সত্য জানিতে চায়! এবং কবি ও কাব্যের বিষয়ে সত্য জানিতে হইলে, কবির নিজের কথা, বন্ধুবান্ধবদিগের সহিত তাহার আলাপ, ব্যবহার ও চিঠিপত্র ব্যতীত মনুষ্যের পক্ষে ঘনিষ্ঠতর প্রমাণ লাভ সম্ভবপর নহে! ঐ সমস্তে, কবি আপনাকে অন্ততঃ যাহা বলিয়া দেখাইতে চাহেন, তাহাই মিলিবে। কবির আপনমুখের কথা হইতেই তাঁহাকে বুঝিবার সাহায্য পাইব। কাব্যের মধ্যে কবি আমাদের সঙ্গে একরূপ প্রকাশ্যভাবেই 'লুকোচুরি' খেলিয়া থাকেন। কোথাও বা ইশারায় আত্মপ্রকাশ করিয়া পরক্ষণেই আড়ালে চলিয়া যান! মানুষের হৃদয় শিশুর মতই এরূপ লুকোচুরি ভালবাসে বলিয়া উহাও কবিতার একটি রস। পাঠকের কুতূহল জাগাইয়া, পাঠককে নিজের তরফ হইতে খুঁজিয়া বাহির করার অধিকারটি দেয় বলিয়াই পাঠক উহাতে আনন্দ পায়। এখন, মনে করুন, এই প্রসঙ্গের শিরোনামার কবি আমাদের সঙ্গে সেইরূপ লুকোচুরি খেলিতেছেন! তাঁহার কাব্যের মধ্যে তিনি 'গা ঢাকা' দিয়া আছেন, তাঁহার কাব্যের যে-মূর্তিগুলি আমাদের সম্মুখে "হাসিয়া-খেলিয়া-নাচিয়া-গাইয়া" চলিয়াছে, উহাদের প্রত্যেকের পশ্চাতেই মাইকেল মধুস্থদন দত্ত লুকাইয়া হাসিতেছেন! উহাদের প্রত্যেকের নড়াচড়া এবং জীবন অভিনয়ের পশ্চাতে কবির উদ্দেশ্য এবং কৌশলের কলকব্জা ও বিপুল সাজসরঞ্জাম আছে। আমরা আপাততঃ তাহার কিছুই দেখিতেছি না; কিন্তু ঐ সমস্ত যে আছে তাহাতে ত কিছুমাত্র সন্দেহ নাই! সুতরাং, মধুস্থদনের 'কাব্যপ্রতিভা' কিংবা 'নাট্যপ্রতিভা' বলিতে ঐরূপ একটা 'পর্দার আড়ালের' পদার্থই বুঝায়। প্রতিভার কার্য-ফল ত আমরা দেখিতেছি। ঐ ফল কেন আমাদের নিকট মিষ্ট লাগিতেছে তাহা বুঝিতে গেলে যেমন একরকম 'প্রতিভা পরিচয়' হয়, তেমন ঐফল কোন্ কৌশলে, কি উপাদানে, কোন্ শক্তির প্রভাবে এমনটি হইল তাহাও

অন্যরূপ 'প্রতিভা পরিচয়'। বলা বাহুল্য, ফলটির বিষয় ইহাতেই সমস্তদিকে শেষ হয় না, উহাকে বিচার করার আরও নানাপ্রকার দিক আছে। যতদিন বাঙ্গালা সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতি বর্তমান আছে, ততদিন দেশে ও কালে নানা রুচির লোক আসিয়া মধুসূদনের দিকে দৃষ্টি করিবে; ওই ফলের রস গ্রহণ করিয়া নূতন নূতন কথা বলিয়া যাইবে! তথাপি কিন্তু, ফলটির সমস্তটা বলার ভিতরেই আসিবে না। কারণ উহা একটা স্বভাবতরুর ফল!

স্বভাবের ফল বলিলে অনেক কথা বলা হয়—এবং বলার বাহিরেও অসীম একটা অবকাশ থাকিয়া যায়! এবং সমস্তটাই ঐ কথাটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত। গোলাপ একটা 'স্বভাবের ফল', 'সূর্যোদয়' একটা স্বভাবের প্রকাশ! বাল্যশিক্ষায় পড়িয়াছিলাম 'রূপসী উষা'! যে—গুণে রূপসী উষা এতকালেও বৃদ্ধা হইলেন না, বা 'গোলাপ ফুল' বিরস হইয়া গেল না, তাহার নাম দিতে পারি 'স্বভাবের গুণ'। ঐ গুণেই মধুসূদনরূপী 'সূর্যোদয়' কখনও পুরানো হইবে না, মধুরূপী 'গোলাপ ফুল' কখনও বিরস হইবে না। চিরকাল মানুষ আসিবে—উহাকে আপন চক্ষে দেখিয়া, আপনার মনে উহাকে গ্রহণ করিয়া মুগ্ধ হইবে; উহাকে দেখার এবং বোঝার কোনরূপ লেখাজোখা এবং অবধি থাকিবে না।

আমরা মধুসূদনকে অদ্যকার প্রসঙ্গে, অদ্যকার অবসরে কোন্ দিক হইতে কি পরিমাণে দেখিতে পারি? তাঁহার প্রতিভাকে বুঝিতে পারি? নিজের চোখেই দেখা উচিত; এবং কবি-দর্শনে কোনরূপ চশমা চোখে করিয়া যাওয়া আদৌ ভাল নহে। প্রত্যেক কবিরই একটা অলিখিত দাবী এই যে, 'তুমি নিজের কোন শাস্ত্র অথবা নিজের কোনরূপ ওজনকাঠির বাহাদুরী লইয়া আমার সমক্ষে আসিও না।' কেননা, উহাতে বঞ্চিত হওয়ারই অধিক সম্ভাবনা। প্রকৃত কবিমাত্রেই তোমার পক্ষে কোন নূতনভাবে, তোমার অজানা এমন কি অনির্বচনীয় কোন গুণেই কবি। কেবল তোমার জানার ভিতরে থাকিলে তিনি কখনও বড় কবি নহেন। হয়ত তোমার আত্মাভিমান এবং বিরূপভাব হইতেই কবির সদর দরজা তোমার বিরুদ্ধে চিরকালের জন্য অর্গলিত থাকিয়া যাইবে! সাহিত্যের ক্ষেত্রে, পাঠকের

দিক হইতে এই অবিচার, এই দুর্ব্যবহার একটা নিয়ত দুর্ঘটনা বলিলে অত্যুক্তি হয় না।

মধুসূদনের নাট্যপ্রতিভা চিন্তা করিবার পূর্বেও আমাদিগকে জানিতে হয় যে, নাট্যপ্রতিভার বিকাশই মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ বিশিষ্টতাজ্ঞাপক পদার্থ নহে। মধুসূদন বাঙ্গলা নাটকের স্রষ্টা—স্রষ্টা বলিতে দেবতার সম্পর্কে যাহা বুঝায়, মানুষের সম্পর্কে তাহা কদাপি বুঝায় না। কালিদাসের যক্ষ তাঁহার প্রিয়তমাকে বিধাতার 'আদ্যা সৃষ্টি' বলিয়া ঘোষণাপূর্বক সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ সৌন্দর্যময়ীর পদবীতে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছেন—"যা তত্র স্যাদ্‌যুবতী বিষয়ে সৃষ্টিরাদ্যেব ধাতুঃ।" কিন্তু মানুষের 'আদ্যাসৃষ্টি' বলিতে সৌন্দর্য কিংবা রসের ক্ষেত্রে শিল্পী-বিশেষের শ্রেষ্ঠ উপার্জন বলিয়া ত কোন মতেই বুঝায় না, বরং প্রথম-সৃষ্টি বলিয়া শিল্পী-হস্তের ন্যূনতা, ক্ষীণতা এবং বৈক্লব্যের লক্ষণগুলিই সংকেতিত হইয়া পড়ে। ওই হিসাবে দৃষ্টি করিয়া, কালিদাসের বিপরীত দিক হইতে বরং বিধাতার কার্যের উপরেই কটাক্ষ করিয়া, কোন অধার্মিক কবি একেবারে দৃষ্টান্ত দ্বারা দেখাইয়াছিলেন, "ভবতি বিজ্ঞতমঃ ক্রমশো জনঃ।" আদ্যাসৃষ্টির অবশ্যম্ভাবী ন্যূনতা দেখানোটাই পাষণ্ডের উদ্দেশ্য ছিল! সুতরাং বঙ্গসাহিত্যের নাটক মধুসূদনের 'সৃষ্টি' বলিতে মনুষ্যভাবে যাহা বুঝায় আমরা তাহাই বুঝিব। কিন্তু, মধুসূদন কবি; তাঁহার প্রত্যেক কথায়, কার্যে, চেষ্টায় এবং চিন্তায় কবি। আমরা দেখিব, জীবনের সহস্র পথে, সুপথে, অপথে কিম্বা বিপথে চলা সত্ত্বেও, এবং ওইরূপে চলার সময়েও মধুসূদনের কবি-বুদ্ধি এবং কবি বলিয়া পরিচিত হইবার আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে ক্ষণকালের জন্যও পরিত্যাগ করে নাই। কম্পাসের কাঁটার ন্যায় মধুসূদনের মন এবং জীবন কখনও তাহাদের ওই উত্তরদিক্‌ ভোলে নাই। সুতরাং, কবি মধুসূদনকে না বুঝিয়া নাটককার মধুসূদনকে বুঝিতে যাওয়াও একটা অসম্ভব অলীক ব্যাপারের মতই দাঁড়াইবে।

মধুসূদন দত্ত নামক ব্যক্তি বহুদিন হইল জীব-রঙ্গ-ভূমি হইতে লীলাসম্বরণ করিয়াছেন। তাঁহার সমাধি-লিপি, অর্থাৎ তিনি মৃত্যুর পর যে-স্বরূপে মনুষ্যের

নিকট পরিচিত থাকিতে চাহিয়াছেন—তাহার একটা বিবৃতি তিনি নিজেই রাখিয়া যান। উহাই তাঁহার অন্তিমশয্যার পরিচয়-স্তম্ভে খোদিত আছে। আমাদিগকে সর্বপ্রথম উহাই দেখিতে হয়। ওই যে মানুষটি মহাশয়ন হইতে বলিতেছেন—

'দাঁড়াও, পথিকবর, জন্ম যদি তব
বঙ্গে! তিষ্ঠ ক্ষণকাল। এ সমাধিস্থলে
(জননীর কোলে শিশু লভয়ে যেমতি
বিরাম) মহীর পদে মহানিদ্রাবৃত
দত্ত কুলোদ্ভব কবি শ্রীমধুস্দন!
যশোরে সাগর-দাঁড়ী কবতক্ষতীরে
জন্মভূমি, জন্মদাতা দত্ত মহামতি
রাজনারায়ণ নামে, জননী জাহ্নবী!'

এই আহ্বান এবং বিবৃতির মধ্যে যে একটা দীর্ঘনিশ্বাস আছে তাহা কেবল সমাধিক্ষেত্রের পরিচিত আবহাওয়া বা জীবন-নাট্যের চূড়ান্ত অবসানের সকরুণ দীর্ঘনিশ্বাস নহে! চারিদিকের বিজাতীয়-শ্মশান,-জনতা এবং বিজাতীয় ভাষার আবহাওয়ার মধ্যে অকস্মাৎ এক ব্যক্তি কেবল বঙ্গভাষায় বাঙ্গালীকে আহ্বান-পূর্বক ক্ষণকালের জন্য দাঁড়াইতে অনুরোধ করিতেছেন। যেন জীবন-যুদ্ধব্যস্ত মনুষ্যের সময়ই বা কত যে তাঁহার জন্য দীর্ঘকাল ব্যয় করিতে পারে! যে কবি একদিন বিশ্বব্যাপিনী ইংরাজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া 'Astound the world' [বিশ্বকে বিস্মিত] করিতে মহাদুরাশায় দম্ভ করিয়াছিলেন, তিনিই আজ জীবনের শিক্ষাক্ষেত্রে কোমল, সংযত এবং সঙ্গত হইয়া, কেবল ক্ষুদ্র বঙ্গদেশের ভ্রাতৃগণকে বাঙ্গালা-ভাষায় আহ্বান করিয়া পরিচয় করিতে চাহিতেছেন! কি বলিয়া? কেবল 'কবি' বলিয়া! শ্রেষ্ঠ কবি, মহাকবি, গীতিকবি, অথবা নাট্যকবিরূপে আপনাকে উপস্থিত করিয়া নহে—কেবল কবিরূপে!

কবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার সমাধিলিপিটি আরও একটু ঘনিষ্ঠভাবে এবং বিস্তারিতভাবে বুঝিয়া লইতে হয়। মধুস্দন বঙ্গের উল্লিখিত প্রদেশে [অবিভক্ত

বঙ্গদেশে] ও গ্রামে [সাগরদাঁড়ি] ১৮২৪ খৃষ্টাব্দের ২৫শে জানুয়ারী [শনিবার] জন্মগ্রহণ করেন; এবং কিঞ্চিদূন ৫০ বৎসর ধরিয়া জীবন-রঙ্গের অভিনেতা ছিলেন। সমাধিলিপিতে তারিখ দেওয়া কবি হয়ত আবশ্যক মনে করেন নাই; তিনি হয়ত নিজেকে কালের সম্পর্ক-বিহীন কবিরূপে অথবা চিরকালের কবিরূপে পরিচিত করিতেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কিন্তু আমাদের পক্ষে, কবি মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয়প্রার্থী আমরা, ওই তারিখটাই যত মূল্যবান্, ততটা বোধ করি তাঁহার জীবনের অন্য কোন ঘটনাই নহে! জন্ম-মৃত্যুর তারিখগুলিই অতীত ও ভবিষ্যতের সন্ধিস্থলে মধুসূদন নামক কবিটিকে অতীতের ফল এবং ভবিষ্যতের বীজরূপে সকল মাহাত্ম্যে বিশেষিত করিয়া দাঁড়াইয়াছে! মধুসূদনের পূর্বপর্যন্ত বঙ্গসাহিত্য কি ছিল, মধুসূদন উহাকে কোন্ নূতন জিনিষ দিয়া গিয়াছেন, তাহা বুঝিবার পক্ষে তারিখের মাহাত্ম্য অমূল্য। ভারতবর্ষ সন-তারিখকে যেন চিরকাল তুচ্ছ করিয়া আসিয়াছে। বুঝি, দেশ-কালাতীত গুণটাকেই একান্তভাবে প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছে, মানুষের জরামরণহীন ধর্মটাকেই দৃষ্টিসমক্ষে প্রবল করিতে চাহিয়াছে। উহাতে একদিকে কি অন্যায় ঘটিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা এখনই বুঝিতে পারিতেছি। গতকল্যকার ভারতবর্ষ যুগ-যুগাতীতের ভারতবর্ষের সহিত নিশ্চিহ্নভাবে মিশিয়া গিয়া একেবারে একটি খিচুড়ীর-পিণ্ড পাকাইয়া বসিয়া আছে! এখন ঐতিহাসিকের যত পরিশ্রম, শত শত পণ্ডিত লোকের জীবনান্তকর পরিশ্রমই কেবল একটি তারিখ বাহির করিতেই ব্যয়িত হইতেছে; তবু নিঃসন্দেহ হওয়া যাইতেছে না! বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তিরোধানের সন-তারিখ লইয়াই কত বিবাদ! অথচ উহা স্থির না করিলে ভারতবর্ষের প্রকৃত পরিচয়ের, উহার ইতিবৃত্ত এবং অন্তরাত্মার প্রকৃতি নির্ণয়ের প্রধান খুঁটিটাই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বঙ্গদেশে মধুসূদনের জন্ম-মৃত্যুর সন-তারিখ এমন একটি ঘটনাকে বেষ্টন করিতেছে, যাহা বঙ্গসাহিত্যের পক্ষে সুতরাং অনেক দিকে বাঙ্গালীজাতির পক্ষেই একটি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ঙ্করী ঘটনা।

মধুসূদনের চরিত্রে উত্তরাধিকার নিরূপণ করিতে গিয়া তাঁহার জীবনীলেখক

[স্বর্গীয় যোগীন্দ্রনাথ বসু] বলিয়াছেন যে পিতা হইতে বিদ্যানুরাগ, সাহিত্যপ্রিয়তা সহৃদয়তা, বুদ্ধিমত্তা, বদান্যতা ও বাক্‌পটুতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ তিনি লাভ করিয়াছিলেন; মাতা হইতে পরদুঃখকাতরতা ও পরম প্রেমপ্রবণতা লাভ করিয়াছিলেন। মধুসূদন-চরিত্রের যাহা যাহা প্রধান দোষ—অসংযম, বিলাসিতা, আত্মশ্লাঘা ও অপরিমিতব্যয়িতা, তৎসমস্তও পৈতৃকসূত্রে পাইয়াছিলেন বলিয়াই নিরূপিত হইয়াছে। আধুনিক জীববিজ্ঞান উত্তরাধিকারতত্ত্বকে একটি নির্মম নিদারুণ সত্যরূপেই উপস্থিত করিতেছে। অবশ্য, উহার বিপরীত মতেরও অভাব নাই! এই বৈজ্ঞানিক আদর্শে মানুষের বংশধর যেমন তাহার ধনসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, তেমন তাহার ধর্মবুদ্ধির এবং পাপবুদ্ধিরও রিক্‌থভোগী হইয়া থাকে! যে পাপী এবং অপরাধীকে নর-সমাজ ঘৃণা করিতেছে, রাজাও যাহাকে নির্দয়ভাবে শাসন করিতেছেন, সে হতভাগ্য কেবল নিজে দায়ী নহে, তাহার পিতৃ-পিতামহও দায়ী! এই ভয়ানক সত্য দুরাচার মনুষ্যের পরিণয়েচ্ছা এবং বংশধর সন্তান-সন্ততির আকাঙ্ক্ষাকে শাসন করা উচিত! উহার ভিতর প্রাচীন সমাজের 'পাপের আদর্শ'টুকু অপরূপ সমর্থনা লাভ করিতেছে! হীব্রুজাতির বাইবেলের 'Original sin' এবং আমাদের 'পাপসম্ভবতা'র আদর্শ এক্ষেত্রে মিলিয়া গিয়াছে। সন্তানের পাপ কেবল পিতৃ-পিতামহে অর্শে, এবং পিতৃ-পিতামহকে অধোগামী করে বলিলে সকল কথা বলা হয় না, ঐ পাপের জন্য তাঁহারাও বহুপরিমাণে দায়ী। তাঁহারা কি ছিলেন তাহা সেকালে সমাজের দৃষ্টি এবং শাসন এড়াইয়া গেলেও একালে আসিয়াই ধরা পড়িল। তাঁহারা প্রত্যক্ষ শাসনের বহির্ভূত হইয়া গেলেও তাঁহাদের বংশধরের ভিতর দিয়াই সমাজের ঘৃণাদণ্ড লাভ করিতেছেন। কেবল অপরাধীর দ্বীপান্তর দণ্ড হইল এমন নহে, সঙ্গে সঙ্গে তাহার পূর্বপুরুষগণও সমাজের প্রীতি-স্মৃতি এবং কৃতজ্ঞতার রাজ্য হইতে ন্যূনাধিক দ্বীপান্তর দণ্ডই লাভ করিলেন! আমি যে সচ্চরিত্র এবং ভাল হইব কেবল আমার সুনাম বা ধর্মরক্ষার্থে নহে—আমার অধস্তন অনন্ত পুরুষের সুখ-শান্তিই আমার দ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে! আমার অধর্ম-প্রকৃতির উত্তরাধিকারী হইয়া আমার প্রিয়তম পুত্রই ফাঁসীকাষ্ঠে ঝুলিতে

পারেন! মনুষ্য-জীবনের কত বড় দায়িত্ব! এই নিদারুণ সত্য সংসারার্থী এবং 'পুন্নাম-নরক' হইতে উদ্ধারার্থী ব্যক্তিমাত্রের চিন্তনীয় হইয়া আছে। আমার সন্তান যে 'পাপোহং পাপকর্ম্মাহং পাপাত্মা পাপসম্ভবঃ' বলিয়া দেবতার দয়া ভিক্ষা করিবে মনুষ্য-জীবনের সত্যগুপ্ত স্খলন এবং পাপতত্ত্বের অতিরিক্ত অন্য কোন পাপার্থ এবং পাপসঙ্কেত যেন ঐ প্রার্থনার মধ্যে না থাকে!

মধুসূদনের কবিত্বশক্তি কোথা হইতে আসিল তাহার সূত্র নির্দেশ করিতে গিয়া জীবনীলেখক বিপন্ন হইয়াছেন! তাঁহার এক পিতৃব্যের নাকি কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি ছিল, উহার উল্লেখ করিয়া কবির পিতামহ প্রপিতামহের মধ্যেও যে উহা গুপ্ত অবস্থায় ছিল, তাহার সঙ্কেত করিয়াছেন। এক্ষেত্রে আমাদের চিন্তিত হইবার কোন কারণ নাই, বিশেষতঃ ভারতবাসীর পক্ষে! মানুষের কতখানিই বা অন্যে দেখিতে পারে! আমি স্বয়ং নিজের মনুষ্যত্ব নামক পদার্থটির কতটুকুই বা দৃষ্টিগত করিয়াছি? জড়বাদী আধুনিক জীববিজ্ঞান মানুষকে একেবারে কাঠ-পাথরের ন্যায় এবং পুঁথির ন্যায় পড়িয়া উঠার দুরাকাঙ্ক্ষা প্রচার করিয়াছে। বিজ্ঞানের এই চেষ্টাকে আমরা নিন্দা করি না। কেননা, উহার ঘোষণা এবং চেষ্টা হইতে বিপুল লাভ দাঁড়াইতেছে। কিন্তু ভারতবর্ষ দেখিয়াছে, জীবের অধিকাংশই অদৃষ্ট। ভারতবর্ষও উত্তরাধিকার-তত্ত্ব মানে বটে, কিন্তু উত্তরাধিকার-বা পরিবেশ-তত্ত্বকে সবজান্তা বলিয়াও স্বীকার করে না। বরং ওই অদৃষ্টকেই, বুঝিবার সুবিধার জন্য, একটি বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব প্রদান করিয়াছে। ভারতীয় দর্শনশাস্ত্র বলিতেছে যে, জীব ওইরূপ 'জন্মান্তরীয়-অদৃষ্ট' বশেই জন্মগ্রহণ করিবার সময় নিজের স্বধর্মীর ক্ষেত্রে বা পিতা-মাতা ও দেশ-কালের সমপরিবেশে আকৃষ্ট হয়; এবং জীবন-পথে ওই অদৃষ্ট এবঞ্চ পুরুষকারের দ্বারাও পরিচালিত হইয়া থাকে। আমরা মনুষ্যকে একদিকে অদৃষ্টের ক্রীড়নক, অন্যদিকে পুরুষকার-শক্তিতে 'স্বয়ং খেলোয়াড়' বলিয়াই ধারণা করি।

বালক মধুসূদনের পরিবেশ বর্ণনা করিতে গিয়া বলিতে হয় তাঁহার জন্মভূমি, 'সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা' বঙ্গভূমির একটি গ্রাম এবং ওই গ্রামের তিনদিক বেষ্টন করিয়া কপোতাক্ষ প্রবাহিত হইতেছে। নিম্নবঙ্গের সমস্ত নদ-নদীর ন্যায় কপোতাক্ষ

বর্ষাকালের 'প্লাবনপীড়নে তীর পরিপ্লাবী প্রবল প্রবাহ', আবার উহাই সুদিনে শান্ত স্নিগ্ধ, 'দুগ্ধ-স্রোতোরূপী তুমি জন্মভূমি স্তনে।' কপোতাক্ষই বালকের চিত্তকে নিজের ভীমকান্ত-মূর্তিতে প্রবল আঘাত করিয়া সর্বপ্রথম প্রকৃতির সৌন্দর্যের দিকে জাগাইয়াছিল বলিয়াই মনে হয়। জাগাইবার জন্য উপযুক্ত শক্তি কেবল উহারই ছিল। 'কপোতাক্ষ, যে তোমার তীরে পাতার কুটিরে বাস করিতে পারে, সেও পরম সুখী।' ইহা কপোতাক্ষকে অতর্কিতে ব্যক্তিত্ব দান করিয়াছে, এবং ওই ব্যক্তিটির অন্তরাত্মার সহিত কবিচিত্তের আন্তরিক সহানুভূতিটুকুই জানাইতেছে। কবির চরিত্রের মধ্যে যে একটি অতি প্রবল প্রবাহশক্তি ছিল, কবির প্রতিভার মধ্যেও যে ভীমকান্ত-গুণ উহাকে বিশেষিত করিয়াছে, তাহার আদিম সমধর্মতা এবং সমভাবের গুরুশিষ্যতার ধারা যেন কপোতাক্ষকেই দেখাইয়া দিতেছে! অন্যদিকে, বঙ্গদেশের গ্রাম প্রকৃতি এবং নাগরিক জীবন-যুদ্ধের কোলাহল দূরে বঙ্গ-সমাজের শান্ত-স্নিগ্ধ গ্রাম্যছবি মধুসূদনের অন্তরাত্মার কম সহানুভূতি লাভ করে নাই। 'এই মধুমাখা স্থানে আসিলে যেমন আনন্দ পাওয়া যায়, পৃথিবীর আর কোনস্থানে গেলে সেরূপ পাওয়া যায় না'; ইহা জন্মভূমির দিকে কেবল মামুলি ধরণের প্যাট্রিয়টিজমের [Patriotism]ভাবুকতা নহে—ইহার মূলেও সহানুভূতি। কবির হৃদয় বৃক্ষলতাদি নিসর্গশোভাময় এবং শান্তজীবন যাত্রাময় সাগরদাঁড়ি গ্রাম নামক ব্যক্তিটির সঙ্গে অন্তরঙ্গভাবে সহানুভূতি করিতেছে! কবি হয়ত পরকালে এই কপোতাক্ষী এবং সাগরদাঁড়ি নামক দুই ব্যক্তিকে একেবারে ভুলিয়া যাইবেন; শৈশবের এই স্বভাব, এই সহমর্মতা এবং বন্ধুতা কথায় এবং কার্যে হয়ত একেবারে অস্বীকার করিবেন—কিন্তু, প্রকৃত প্রস্তাবে এই বন্ধুতা পরিহার করিতে কিম্বা এই শৈশবসুহৃদকে অতিক্রম করিতে তাঁহার সাধ্য নাই! শৈশবের স্বধর্ম অতিক্রম করা মানুষের পক্ষে অসম্ভব বলিতে পারি.। উহারা তাঁহাকে পাইয়া বসিয়াছে! উহারা স্বধর্মের অদৃষ্টরূপেই তাঁহার জীবনে আসিয়াছিল, এবং ভবিষ্যতের অদৃষ্টরূপেই দাঁড়াইয়া গেল। অতঃপর 'খাইতে-বসিতে-চলিতে-ফিরিতে' উহারা জীবনের গভীর এবং অজ্ঞাত তলদেশ হইতে অকস্মাৎ ভাসিয়া উঠিয়াই

উঁকি দিয়া যাইবে—বুঝাইয়া দিবে যে, উহারা নির্বিঘ্নে, তাঁহার অজ্ঞাতে, তাঁহার অন্তঃপুরেই আপন রাজত্বে বসিয়া আছে। তিনি একটু অন্যমনা অথবা শূন্যচিত্ত হইলেই—

'They flash upon the inward eye
Which is the bliss of solitude.'

মধুসূদনের শৈশবের আর একটি বন্ধু ছিল—একটি-ই বলিব। কারণ, সংখ্যায় দুইটি হইলেও উহারা অন্তরাত্মায় এক। রামায়ণ ও মহাভারত—অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ ও কাশীদাসের মহাভারত। বঙ্গদেশে এই দুইটি গ্রন্থের কি আবার বিশেষ করিয়া পরিচয় দিতে হইবে? যে-ব্যক্তি ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়াও এই দুইটি চিরবালক এবং চিরবৃদ্ধ গ্রন্থের সহিত, ভারতবর্ষবাসী এই দুইটি চির-পুরাতন এবং চির-নূতন ব্যক্তির সহিত শৈশবেই ভাবের-বন্ধুতা স্থাপন করিতে পারিল না তাহাকে হতভাগ্য বলিব! ভারতের মানুষের পক্ষে 'আমি কে', 'আমি কোথায় আছি', 'কোথায় চলিয়াছি'—বুঝাইয়া দিতে পারে, শিক্ষাকে একেবারে রক্তের মধ্যে চিরকালের জন্য মিশাইয়া দিতে পারে, এমন নিত্য-মনোরম বন্ধু আর মিলিবে না। ভারতবর্ষের মনুষ্যকে তাহার দেবগুরু-অতিথি, তাহার পিতামাতা, স্ত্রী-পুরুষ ভাই-ভগিনী, আত্মীয়-বন্ধুবান্ধব, সংসার-পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র, তাহার ইহকালের ও পরকালের ধর্ম চিনাইয়া দিতে পারে,—এক কথায় ভারতীয়-সভ্যতায় ও-কর্ষণায় অতর্কিতে ওতপ্রোত করিয়াই তাহাকে ডুবাইয়া রাখিতে পারে, এমন আর কোন্ বন্ধু! মধুসূদনও সৌভাগ্যক্রমে শৈশবেই এই বন্ধুকে চিনিয়াছিলেন। শুনিতে পাই, বালক মধুসূদন দিনরাত্রি রামায়ণের ও মহাভারতের সঙ্গেই মজিয়া থাকিতেন। পরে, স্বসমাজ ও স্বদেশ পরিত্যাগ করিয়া, সুদূর মাদ্রাজে গিয়াও কেবল রামায়ণ ও মহাভারত পাইবার জন্য বন্ধুর নিকটে কত কাকুতি-মিনতি? 'সাহেব-লোকের হাতে মহাভারত'! উত্তর হইয়াছিল,—'রামায়ণ-মহাভারত আমার কেমন ভাল লাগে, না পড়িয়া থাকিতে পারি না।' এই 'কেমন ভাল লাগে'! চিন্তা করুন! শৈশবের বন্ধুতা একবারে রক্তের সহিত মিশিয়া গিয়া, অন্তরাত্মার 'ক্ষুধার

অন্ন এবং তৃষ্ণার জল' হইয়া গিয়াছে কিনা, তাই 'সাহেবটি' সজ্ঞানে স্বীকার না করিলেও তাঁহার 'কেমন ভাল লাগে' !

কবির এই শৈশববন্ধুগুলির কথা এত বিশেষ করিয়া বলিবার কারণ এই যে, তাঁহার জীবনে একটা অভাবনীয় ঘটনাই ঘটিয়াছিল,—জীবনের আদ্যন্ত সূত্রচ্ছেদ, সর্বাভিভাবী-বিপ্লব, ভূমিকম্পের মতই অধঃ-উর্ধ্বে উৎপাতকারী এবং প্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনা ! এই মধুসূদন নামক ব্যক্তিটি তাহার জীবনাদৃষ্ট ও স্বভাবশিক্ষা, তাহার স্বদেশ স্ব-সমাজ এবং প্রকৃত স্বধর্মকে একদিন পরম অহংকারে এবং অবিদ্যার বশে একেবারে ঝাড়িয়া ফেলিতে এবঞ্চ অস্বীকার করিতেও চাহিয়াছিল, পারে নাই।

২

মধুসূদন একটি সম্ভ্রান্ত এবং সঙ্গতিসম্পন্ন কায়স্থ-পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। হিন্দুসমাজে সম্ভ্রম কেবল ধনের উপর নির্ভর করে না ; হিন্দুসভ্যতা অতুলনীয়ভাবে ধন হইতে সম্ভ্রমকে পৃথগন্ন করিয়া, উহাকে আপন মাহাত্ম্যেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। সুতরাং, আবশ্যকপক্ষে ধন-সম্ভ্রম দুইটিই উল্লেখ করিতে হয়।

উহা একটি শাক্ত পরিবার ; এবং এই পরিবার গ্রামে দানশীলতা এবং ঐশ্বর্যপ্রিয়তার জন্যও প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। মধুসূদনের এক পিতৃব্য নাকি 'মহাপূজা' সমাধা করিয়া স্বকীয় বংশকে 'মহাগৌরবের' আসনেই তুলিয়া ধরিয়াছিলেন ! 'মহাপূজা' অর্থাৎ একই সময়ে ১০৮ কালীদেবীর পূজা, 'যাহাতে ১০৮টি মহিষ, ১০৮টি মেষ ও ১০৮টি ছাগ বলি প্রদত্ত হইয়াছিল, এবং ১০৮টি স্বর্ণনির্মিত জবা-পুষ্পে অঞ্জলি অর্পিত হইয়াছিল।' গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিগণ নাকি এখনও এই পূজার বিষয় সগৌরবে কীর্তন করিয়া থাকেন ! পাঠক দেখিবেন, এই উজ্জ্বল কীর্তি-চন্দ্রের পশ্চাদ্ভাগে একটি ঘন, গাঢ় তামসিকতার ছায়া-ই বিরাজ করিতেছে ; এবং হিন্দুসমাজের মন হাজার গৌরব-কীর্তনের সময়েও এই তামসিক ছায়াটির কথা কদাপি বিস্মৃত হয় না। মধুসূদনও পরিবারের এই অপরূপ বিত্ত-

বিলাসিতা এবং বদান্যতার বাতাসেই শিক্ষিত এবং বর্ধিত হইয়াছিলেন। অর্থ-বিলাস মনুষ্যের অশনেবসনে এবং চলাফেরায় যে জাঁকজমক আনয়ন করে, শৈশবশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে প্রবেশলাভ করিয়া উহা মধুসূদন নামক ব্যক্তির রক্তে-মাংসে এবং অস্থি-মজ্জায় বসিয়া গিয়াছিল। তাঁহার দানের মধ্যেও এই বিলাসিতা ছিল। গণনা করিয়া অর্থদান নামক ব্যাপারটি তাঁহার আদৌ ছিল না, 'এক মুষ্টি দুই মুষ্টিতে যাহা হাতে উঠিত তাহাই বিনা চিন্তায় দিয়া ফেলিতেন।' পরকালে নিদারুণ অর্থকৃচ্ছ্রের অবস্থাতেও এই কার্যবিধি সঙ্কুচিত হইতে জানে নাই। এই বালক পরকালে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট কাকুতিমিনতি করিয়া এক হস্তে ভিক্ষাই করিতেছে—অন্যদিকে নিজের সন্তানগণকে ইউরোপে রাখিয়া বহুব্যয়সাধ্য বিদ্যাদান করিবার চেষ্টাতেই আছে। এই দান! ভিক্ষা করিয়াও দান! আপনাকে একেবারে ফতুর করিয়াও দান! মধুসূদনের সাহিত্যিক-জীবন এবং সাহিত্য-কর্মও এই অপরিমিত দান-বিলাসের অন্যদিক বই নহে। রাজসিক যশোলোভ অবশ্যই উহাতে আছে। কিন্তু দান, মরিয়া মরিয়াও—সর্বস্ব খোয়াইয়াও দান—দেশবাসীকে জ্ঞান-এবং আনন্দ-দান। প্রাচীনকালের 'শিবি'-র ন্যায় তিলে তিলে, ধীরে ধীরে, দুর্দশা এবং ক্ষুধা-তৃষ্ণার প্রত্যেক ঠোকরে-ঠোকরে, বঙ্গভাষা এবং বঙ্গ-সাহিত্যের উন্নতি-পিপাসারূপী নির্দয়, নির্মম শ্যেন-পক্ষীকে আপনার দেহের রক্ত-মাংস এবং অস্থি-মজ্জা দান! এইরূপ দানশীলতার মধ্যে অতুলনীয় রাজসিক-শক্তি এবং সহিষ্ণুতার ভিত্তি আছে—উহাও হয়ত বিলাসিতার নামান্তর; কিন্তু মনুষ্যমধ্যে মহার্ঘ এবং লোকোত্তর এই বিলাস! সংসারে যে আপনার জন্মস্বত্বে এবং আপনার শক্তি-মাহাত্ম্যেই লোকোত্তর, মানুষ যাহার সমক্ষে নতশির হওয়াটাই অপরিহার্য বলিয়া মনে করে, যাহার অন্তরাত্মা আপনার ভাণ্ডার অমেয় এবং অফুরন্ত বলিয়াই জানে, মানবত্বের ক্ষেত্রে সেই রাজচক্রবর্তী ব্যতীত এইরূপ দানশীলতা অপরে সম্ভব হয় না। ইহারা সংসার-রাজ্যের ভিখারী কিন্তু অধ্যাত্ম-রাজ্যের রাজচক্রবর্তী। এই বালক একদিন ওই কুলক্রমাগত প্রকৃতি-এবং স্মৃতি-অনুসারে—বলিতে পারেন, ওই বংশ প্রকৃতির ন্যূনাধিক বাধ্য

হইয়াই—আপনার সর্বস্ব উৎসর্গপূর্বক বঙ্গসরস্বতীর মহাপূজা সমাধা করিয়া গিয়াছে!

এই ঐশ্বর্য-বিলাস এবং দান-বিলাসের বংশবায়ু মধ্যে সংযম বলিয়া কোন প্রণালী মধুসূদনের শৈশবশিক্ষায় আসিতে পারে নাই। আমরা জানি, সংযম-ই ভারতীয় শিক্ষা এবং কর্ষণার মূলমন্ত্র! মনুষ্যের আদিম স্বাধীনতার অপর নামই বর্বরতা। এই জান্তব স্বাধীনতাকে পরিবারের শিক্ষা-মন্দিরে, সমাজে, রাষ্ট্রে এবং ধর্মের ক্ষেত্রে নানামুখী শিক্ষার অধীন করিয়া মনুষ্যত্ব বিকশিত করাই ভারতীয়-কর্ষণ এবং শিক্ষা-সভ্যতার মুখ্য উদ্দেশ্য। পরিবার-ক্ষেত্রে মধুসূদনের সংযম শিক্ষার নানাদিকে অনটন ছিল বলিতে হয়। তাঁহার পিতা স্বয়ং একজন অসংযমরত শক্তিমান্ পুরুষ ছিলেন বলিয়াই জানা যায়; সন্তানকেও কোনদিকে শৃঙ্খলাধীন করার দৃষ্টি তাঁহার ছিল না। মধুসূদনের বন্ধু গৌরদাসের [বসাক] 'স্মরণপত্রে' দেখিতে পাই, তিনি [পিতা রাজনারায়ণ] স্বয়ং তাম্রকূট সেবন করিয়া আলবোলার নলটি কিশোর বয়স্ক পুত্রের দিকে উজাইয়া দিতেছেন, এবং মধুসূদনও সাগ্রহে পিত্রাদেশ রক্ষায় নিযুক্ত হইতেছেন! দেশপ্রথিত সদাচারের এইরূপ ব্যতিক্রমে বিস্ময়াবিষ্ট বন্ধুকে মধুসূদন আশ্বস্ত করিতেছেন, "আমার পিতা তোমাদের ঐ সমস্ত খুঁটিনাটি গ্রাহ্য করেন না।" গ্রাহ্য করেন না! বিষয়টি অতি ক্ষুদ্র; কিন্তু ওই ক্ষুদ্রটুকুনির ওজনেই বৃহতের ওজন হইয়া থাকে। উহাতেই বোঝা যায় যে, বিলাতী-সভ্যতার বাহ্যপ্রভাব, উহার বক্তৃতামুখর সাম্যবাদ এবং ইয়ং-বেঙ্গলের কিছুই গ্রাহ্য-না-করার ভাবটি মধুসূদনের পিতৃ-পরিবারেও কিছু কিছু প্রবেশ করিতেছিল। হিন্দুর একান্নবর্তী পরিবারের আদর্শ একান্তভাবে সংযমের উপরেই নির্ভর করে। উহা একটি সংঘ; উহার মধ্যে পরস্পর প্রীতি-মমতা হইতে একটা স্বাধীনতা যেমন আছে, তেমন প্রত্যেকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তির সংযম ও শিষ্টাচারের একটা বন্ধন বা নিয়ন্ত্রণাতেই উহার প্রধান শক্তি! জনক-জননী এবং পুত্র-কন্যা, স্ত্রী-পুরুষ, জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠ, শ্বশুর-শাশুড়ী ও পুত্রবধূ, ভাসুর-ভ্রাতৃবধূ, দেবর-ভাজ প্রভৃতি সম্পর্কের মধ্যে এবং দৈনন্দিন ব্যবহারের মধ্যে একটি প্রীতি-

ভক্তিজনিত স্বাধীনতা এবং শিষ্টাচারের নিয়ন্ত্রণা থাকিলেই হিন্দু-পরিবার দাঁড়াইতে পারে। নচেৎ এই ব্যক্তি-সংঘ, এই রক্ত-সম্পর্কিত এবং দেশবিদেশাগত জন-সমষ্টির সমস্ত বন্ধন এবং সম্মিলন এক মুহূর্তেই চূর্ণবিচূর্ণ হইয়া ধূলিসাৎ হইয়া যায়! বিলাতী 'স্বাধীনতার' আপাতমধুর চেহারায় আত্মবিস্মৃত হইয়া আমরা অতর্কিতে চলাফেরায় অসংযম এবং স্বেচ্ছাচার প্রবর্তন করিয়াই এই সংঘকে ভাঙ্গিতেছি! যদি বিলাতী-নিয়মে কেবল স্বামী-স্ত্রীর জুড়ি লইয়াই এদেশের পরিবার দাঁড়াইয়া যাইত, এবং আমরাও সচেতন-ভাবে উহাকেই লক্ষ্য করিতাম, এবং সন্তান-সন্ততির শিক্ষা ব্যাপারকেও বোর্ডিং (Boarding)-এর হস্তে দিয়া-ই নিষ্কৃতি পাওয়া যাইত, তা'হইলে পরস্পর যথেচ্ছ ব্যবহারে কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। বিলাতী সমাজে আমাদের পারিবারিক শিষ্টাচার-বিধির জন্য কিছুমাত্র অবকাশ নাই। কিন্তু আমরা নিজের অবস্থা এবং বিলাতী-সমাজ ও-পরিবারের সহিত আমাদের পার্থক্য না বুঝিয়াই যে অতর্কিতে আত্মহত্যা করিতেছি!

হিন্দুর 'পরিবার' নামক প্রতিষ্ঠান যে সংযম এবং প্রেম-শিক্ষাকে লক্ষ্য করে, তাহার সমাধান মধুস্থদনের চরিত্রে ঘটিতে পারে নাই! হিন্দুর পরিবারতন্ত্র মনুষ্যের পক্ষে স্নেহ-প্রীতি-শিক্ষার একটি মহাবিদ্যালয় বলিলে অত্যুক্তি হয় না; এই শিক্ষা এবং পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াই তাহাকে জীবনের পরীক্ষা-ক্ষেত্রে, সমাজ এবং রাষ্ট্রের বিশ্বমুখ কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হইতে হয়। পরিবারে অত্যধিক আত্মম্ভরিতা বা আত্মপ্রতিষ্ঠার কোন অবকাশ-ই নাই। মানুষ জান্তব-ধর্মবশে, তাহার স্বভাব-বশেই আত্মম্ভর! এ ক্ষেত্রে তাহার কোন দীক্ষাগুরুর প্রয়োজন নাই; তাহার শরীর-ধাতুই এই দীক্ষা লইয়া উৎপত্তি লাভ করে। Self-preservation বা আত্মরক্ষা আদিম 'প্রাণ-ধর্ম', যেমন জীবে তেমন উদ্ভিজ্জেও উহা আত্মম্ভর-রূপেই প্রকাশ পাইতেছে। পরিবার মনুষ্যকে এই আত্মম্ভরিতা সংযত করিতে শিক্ষা দেয় এবং উহার নামই প্রেম-শিক্ষা। কথাটিকে এস্থলে ভাল করিয়া বুঝিয়া লওয়া উচিত। কারণ, আমাদের দেশে এই বিষয়ে সাহিত্যে, সমাজে এবং ধর্মে এত বুদ্ধি-বিভ্রম পরিদৃষ্ট হইতেছে যে, আমরা নিজের অবস্থা সচেতনভাবে বুঝিয়াছি

বলিয়া ত কোন মতেই মনে হয় না ; পরন্তু, পরকেও নিজের সম্পর্কে আনিয়া যেন ভালরূপে বুঝিতে পারিতেছি না। পারিবারিক এই শিক্ষা কেবল 'পরকে আপনার করা' বলিলে উহার প্রকৃত অর্থ বোধগম্য হয় না। পরের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করা, আপনাকে হারাইয়া ফেলা, অহংমুখতার বিলোপ-পথেই বিশ্বাত্মার সহিত যুক্ত হওয়া! এই আত্মপ্রসার কেবল আপনার অধিকার-বিস্তার বা আত্ম-প্রতিষ্ঠা নহে—আত্মবিলোপ! ক্ষুদ্র-আমিত্বের বিলোপ পথেই ভূমা-আমিত্বকে লাভ! উহার মন্ত্র my will be done নহে, thy will be done. হিন্দু পরিবারে এই শিক্ষার আরম্ভ হয়। মধুসূদন প্রচলিত কথায় অত্যন্ত 'প্রেমিক' ছিলেন। তাঁহার বন্ধুগণ একবাক্যে সাক্ষ্য দিতেছেন—'মধুসূদনের আদ্যন্ত সমস্তই মধু, উঁহার ভিতরে এক বিন্দু তিক্ত ছিল না।' তাঁহার মতন অমায়িক ব্যক্তি দুর্লভ ; তিনি একেবারে 'প্রাণমনে' ভালবাসিতে জানিতেন। কিন্তু, তবু তিনি ভারতীয়-আদর্শের 'প্রেমিক' ছিলেন না। তিনি পরকে আপনার করিতে জানিতেন ; আত্মপ্রসার এবং পরের উপর আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতে পারিতেন। মানুষ তাঁহার গুণে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অধীন হইয়া পড়িত—তাঁহার আপনার হইয়া, তাঁহার 'ভক্ত' হইয়া পড়িত! এই পর্যন্ত। তিনি কখনও পরকে আত্মদান করিতে, আত্মোৎসর্গ বা আত্মলয় করিতে জানিতেন না—পারিতেন না। সূক্ষ্ম-ভাবে দেখিতে গেলে তাঁহার প্রেম আত্মবিলাসের নামান্তর মাত্র! শৈশবে, কৈশোরে, যৌবনে বা প্রৌঢ়াবস্থায় বন্ধু, বান্ধব, জনক, জননী বা পুত্র, কন্যা, প্রণয়িনী, পরিবার-সমাজ-সংসার—তিনি কখনও কাহারও সমক্ষে নিজের 'পান হইতে চূণটুকু খসাইতে' পারেন নাই! মধুসূদন চিরকালই মধুসূদন—তাঁহার আমিত্বটুকু কুত্রাপি কাহারও সমীপে 'এতটুকুন' নত হইতে জানে নাই!

মধুসূদনের এই আত্মপ্রতিষ্ঠা হইতে বঙ্গ-সাহিত্যের যে পরম লাভ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহা আমরা দেখিব। কিন্তু, আমাদিগকে তাঁহার এই প্রতিষ্ঠাটুকুন প্রকৃতভাবে বুঝিয়া লইতে হইবে। উহা সাহিত্যে, সমাজে তাঁহার সকল মাহাত্ম্যের যেমন নিদান হইয়াছে, তেমন জীবন-পথে তাঁহার ভালমন্দ, পাপ ও পুণ্যকর্ম এবং

সুখদুঃখ সমস্তই অচ্ছিন্ন সূত্র-ক্রমে উহা হইতেই প্রসূত হইয়া আসিয়াছে! বঙ্গ-সাহিত্য এখন পর্যন্ত যাহা হইয়াছে তাহার অধিকাংশই যেমন মধুসূদনের ওই আত্মম্ভরিতা এবং গোঁয়ার্তুমীর উপার্জন-ফল, অথবা উহার শিষ্য-প্রশিষ্যতার ধারা বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারি; তেমন, আমাদিগকে ইহাও মনে রাখিতে হইবে যে, মধুসূদনের এই অন্তঃপ্রকৃতি বহুপরিমাণে পাশ্চাত্ত্য-ব্যক্তিবাদ বা individualism বা আত্মপ্রতিষ্ঠা আদর্শের-ই সম্পত্তি! সমাজে, সাহিত্যে—এই তন্ত্র ভারতবর্ষে নানাদিকে নূতন! মধুসূদনের পর হইতে বাঙ্গালার প্রায় সকল বড় কবিই কেবল ওই অহমিকাতন্ত্রের সন্তান-সন্ততিরূপেই আত্মপরিচয় করিতেছেন! এক্ষেত্রে কেবল হেমচন্দ্রকেই বোধ করি বাদ দিতে পারা যায়। বঙ্গ-সাহিত্য এবং বাঙ্গালী জাতির উপস্থিত কল্যাণের পক্ষে হয়ত উহার আবশ্যকতা আছে, নিয়তি-মাতার সেই শুভইচ্ছাটি হয়ত সহজেই বুঝিয়া উঠিতে পারিব। কিন্তু, উহা যে প্রবলভাবেই পাশ্চাত্ত্য শিক্ষা এবং সভ্যতার হৃদয়ঙ্গম পদার্থ, উহা যে একটি Titanic element, ভারতীয় আদর্শে একটি আসুরিক-ভাব, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতেই হইবে। এবং হয়ত আরও কিছুকাল পরে আমাদের সাহিত্যে, সমাজে, ধর্মে উহার শুভাশুভ ফল মূলাইয়া লইবার সময়ও আসিবে।

পাশ্চাত্ত্য-সমাজে প্রেমপূর্বক পরিণয় প্রথা প্রচলিত আছে বলিয়াই ঐ সমাজে যুবক-যুবতীর প্রেম মাত্রকেই ন্যূনাধিক উপার্জনধর্মী হইতে হয়—প্রত্যেককে প্রেম-প্রদর্শন-পূর্বক আকর্ষণ করিয়াই জীবনের সঙ্গী অর্জন করিতে হয়। আমাদের সমাজে পরিণয়ের পরেই প্রেমের অবকাশ ঘটে বলিয়া উহা একটি সাধনা-রূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। বিবাহকে একটি ধর্ম-সংস্কাররূপে পরিণত করিয়া মানুষের পক্ষে পরিবার এবং সমাজ-জীবনকেই একটি ন্যূনাধিক আত্মবিলোপের-সাধনা রূপেই দাঁড় করান হইয়াছে। বৈদিক-যুগ হইতেই, গৃহ্য-সূত্রের যুগ হইতেই ভারতীয়-কর্ষণার এই সূত্র! উহার গতিকে উভয় সমাজের প্রেমবিষয়ক-ধারণা এবং প্রেমের আদর্শ-বিষয়ক সংস্কার নানাদিকে ব্যবহিত হইয়া গিয়াছে। উহার গতিকেই উপার্জনধর্মী প্রেম বা টাইটানিক [Titanic] প্রেমের সুর শোনা

মাত্র এদেশের সহৃদয়মাত্রই অতর্কিতে উদ্বেগ অনুভব করিতে থাকেন। কোন পরিদৃশ্যমান কারণ নাই, তথাপি উদ্বেগ! এরূপ স্থলে একটু তলাইয়া দেখিলেই কারণটি দেখা যায়। একদিন কোন বন্ধু এতদ্দেশের কোন প্রথিতযশা 'প্রেমের কবির' গুণকীর্তন করিতেছিলেন। আমরা একটু অত্যুক্তি করিয়াই বলিলাম, 'তাঁহার মধ্যে কিন্তু 'ভারতীয়-প্রেম' নাই।' 'কি বলিতেছ, এতবড় প্রেমের কবি—যে চিরজীবন প্রেমের কবিতা রচনা করিয়া বাণী-ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া দিল, সে প্রেম জানে না!' আমরা হাসিয়া বঙ্কিমচন্দ্রের একটি কথার পুনরুক্তি করিলাম, 'বাদশাজাদী প্রেম জানে না।' তিনি আমাদিগকে শাসাইয়া গেলেন, 'আচ্ছা, আগামীকল্যই আমি একশত প্রেম-কবিতার দৃষ্টান্ত লইয়া আসিতেছি।' পরদিন নিয়মিত সময়ে আসিয়া তিনি একেবারে শুষ্কমুখে বিমনা হইয়া বসিয়া গেলেন। 'তাই ত, এটি একটি নূতন কথা বটে!' আমরা বুঝিলাম, তিনি খুঁজিয়া খুঁজিয়া ভগ্নোৎসাহ হইয়াছেন; দৃষ্টান্ত একেবারে মিলে নাই তাহা নহে, তবে, আমাদের মতই একটি অত্যুক্তি করিতেছেন। কিন্তু এই অত্যুক্তির পনের আনা সত্য। আসল কথা, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্য প্রেমের গানে ভরপূর হইয়া গেলেও প্রকৃত প্রেমের কথা উহাতে কদাচিৎ মেলে, অধিকাংশই আত্মম্ভর-বিলাস, অহমিকা-বিলাস এবং সৌন্দর্য-বিলাসের উচ্ছ্বাস বই নহে! সমস্তই 'পূজা পাওয়ার ইচ্ছা'—'পূজা করার ভাব বা ইচ্ছা' নাই বলিলেই হয়। অনেকের বলিবার ভঙ্গীটিই এমন যে, উহার নিশ্বাসেই যেন অহমিকার শূলবিদ্ধ করিয়া অন্তরাত্মায় নিদারুণ বেদনা জাগাইতে থাকে। মনুষ্যের অন্তরাত্মার ভয়ানক কুসঙ্গী! ইহার জন্য অবশ্য কোন কবিকে দোষী করা যায় না। বিশেষতঃ, কাব্যে কবির অন্তরাত্মার ছবি সরলভাবে প্রতিফলিত হওয়া, সাহিত্য মাত্রেই জাতীয়-অন্তরাত্মার ছায়াবহ হওয়াটাই বাঞ্ছনীয়। বর্তমান কালে আমাদের যাহা প্রকৃতি, কবির ভাবুক-আত্মার যাহা প্রকৃতি তাহাই হয়ত এইরূপে আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে ব্যাপকভাবে প্রতিফলিত হইতেছে। তবে, পাঠকমাত্রকেই এ সমস্ত পূর্বাপর জ্ঞানসহকারে এবং সতর্কভাবে গ্রহণ করিতে হয়। আদর্শের পূর্বাপর ধারণা করিতে বসিলেও আমাদিগকে প্রাচীন বৈষ্ণব-

কবির কথাটিই মনে রাখিতে হয়—প্রেম এবং কামের পার্থক্য কোথায় ?

"আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি বাঞ্ছা তারে বলি কাম।
কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম॥"

মধুসূদনের শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতা বিকাশের বিচারস্থলে আমরা প্রতিপদে নানা আনুষঙ্গিক প্রসঙ্গের উত্থাপনে ধীরে ধীরে চলিতে বাধ্য হইতেছি। মধুসূদন নব্য-বঙ্গের বড় কবি। এখনও বঙ্গ-সাহিত্যের অন্তর্লোকে তাঁহারই ঔরসজাত টাইটানিক ভাবের রাজত্বই চলিতেছে ; সম্ভবতঃ আরও বহুকাল চলিবে। সুতরাং এই বিস্তারশীল প্রতিভার প্রকৃতি এবং প্রণালী আলোচনা হইতে যদি আমাদের আত্মদর্শনের সুবিধা না হয়, তবে সে আলোচনায় ফল কি ? কেবল ঘটনার বিবৃতিই কবিজীবনীর প্রকৃত আলোচনা নহে। অনেক সাধারণ লোকের জীবনেই মধু-জীবনী অপেক্ষা অনেক বিচিত্র ঘটনা লব্ধ হইতে পারিত।

ভারতবর্ষীয় সংযম অথবা প্রেম-শিক্ষায় মধুসূদনের অনটন দেখা গেলেও, এবং উক্ত অভাবের গতিকে এই শক্তিমান্ পুরুষের সমগ্র জীবন দুঃখময় হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইলেও, অন্ততঃ একদিকে তাঁহার স্বতঃসিদ্ধ এবং অসীম আত্ম-সংযমের দৃষ্টান্তে মনুষ্যমাত্রকে বিস্মিত হইতে হইবে। উহা তাঁহার সারস্বতী-বৃত্তি বা বিদ্যানুরাগ। সকলেই জানেন বিদ্যানুরাগ একটি জড়তা-বিজয়ী মহাভাব। উহার সহিত জড়তার প্রত্যক্ষ সম্পর্ক নাই বলিয়াই উহা মনুষ্যের মনন-জীবন বা মনোজীবন বৃদ্ধি করে, তাহাকে প্রকৃত 'মনুষ্যত্ব' দান করে। সূর্যের যেমন আলোক, আগুনের যেমন দাহিকাশক্তি, তেমন বিদ্যানুরাগও মধু-আত্মার একটি নিত্যগুণরূপে উপক্রান্ত হইয়াছিল। এই মানুষটি আর সমস্তই ভুলিতে পারিত, জীবনের সহস্র অপথে বা বিপথে একেবারে ভোলা হইয়াই মাতিয়া যাইতে পারিত, কিন্তু সরস্বতীর পদ-সূত্রটুকু কখনও ছাড়িতে পারিত না! এস্থলেই মানুষটির 'মহাপুরুষ' লক্ষণ—এস্থলেই মধুসূদন অসাধারণ—এস্থলেই তিনি ভবভূতির 'লোকোত্তর জীব' এবং দেবযোনি! এই দৈবগুণেই তিনি 'অমৃতের পুত্র'—স্বয়ং অমৃত-পিপাসী, এবং বঙ্গ-সাহিত্যে অমৃতের নবগঙ্গা আনয়নরূপ

অমৃতকর্মের ভগীরথ! এই গুণকেই হিন্দু 'জন্মান্তরীয় তপস্যালব্ধ অদৃষ্ট'-রূপে পূজা করিবে। মনে করুন, মধুসূদন নামক গৃহের সমস্ত দ্বার মহাসূর্যের আলোক-বিদ্রোহে চিরকাল রুদ্ধ আছে, কিন্তু উহার খোলা আছে একটি মাত্র জানালা! এমনভাবে খোলা আছে যে, ওই পথেই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের ছবি প্রবেশপূর্বক উহার অন্তরতম মর্ম-প্রকোষ্ঠে পর্যন্ত ভাবের আদান-প্রদান চালাইতে পারিতেছে! আর কি চাই? এ-স্থানেই এই রহস্যময় চরিত্রের সকল মাহাত্ম্যের চাবী পাওয়া গিয়াছে! এক্ষেত্রে তাঁহার ধারণা কি ছিল? 'যাহা একজন মানুষ করিতে পারিয়াছে, তাহা অন্যজন মানুষ নিশ্চয় পারিবে!' রাসবিহারী মুখোপাধ্যায়ের পত্রে দেখিবেন, তাঁহার [মধুসূদনের] মর্ম-মন্ত্র ছিল "শরীরং বা পাতয়েয়ং কার্য্যং বা সাধয়েয়ম্।" আশ্চর্য রহস্যের কথা! যে মধুসূদন সৌখিন পুরুষ, শরীরের শত সহস্র সুখ-সুবিধা সোয়াস্তির দিকে লক্ষ্য করিয়াই বলিতেছে,—'মাসিক অন্ততঃ চারিটি হাজার টাকা না হইলে একজন ভদ্রলোকের কি করিয়া চলে?' তাহারই জীবনের গুপ্তমন্ত্র হইল কিনা 'শরীরং বা পাতয়েয়ম্!' বিপরীতের অপরূপ সমাবেশ! এ স্থানেই কালিদাসের 'অলোকসামান্য এবং অচিন্ত্যহেতুক' মহাত্ম-চরিত্র, ভবভূতির 'বজ্রাদপি কঠোর এবং কুসুমাদপি মৃদু' লোকোত্তর চরিত্র!

এই বিদ্যানুরাগটিই মধুচরিত্রে একটি সর্বনিয়ামক মহাভাবরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে এবং ফলে কবিকে বঙ্গ-সাহিত্যের অমৃতলোকে লইয়া গিয়াছে! উহার মূলতত্ত্ব ছিল, মননপথে বিশ্ব-সংসারকে গ্রহণ! সংসারে, যে দেশে কিম্বা যে ভাষায় মানুষ বৃহতের এবং মহতের সাধনা করিয়া তাহার বিবরণ এবং অনুভবের নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে, মধুসূদন দত্ত তৎসমস্তই নিজের মন দিয়া অধিকার করিয়া লইবে! উহা যে তাহার পৈতৃক সম্পত্তি! সে সমস্ত পৈতৃক বিত্তের সন্ধান লইয়া ভোগ-দখল করিবে! তাহার উত্তরাধিকার স্বত্ব কে অস্বীকার করিতে পারে? এই অধিকার-স্পৃহার মূল-শক্তি কি তাহাও আমরা সঙ্কেত করিয়াছি। মধুসূদন কৃপণ ছিলেন না; কেবল সঞ্চয়, সঞ্চয়ের জন্যই সঞ্চয় করা, যাহা অনেক স্থলেই শুষ্ক

পাণ্ডিত্যের একটি প্রধান লক্ষণ হইয়া দাঁড়ায়, যে কারণে 'জ্ঞানের সঞ্চয়-ধর্মই পণ্ডিত ব্যক্তির একটি প্রবল রিপু হইয়া উঠে, তাহা মধুসূদনের ছিল না। তিনি স্বভাবেই দাতা ছিলেন—মহাদাতা! সমগ্র বঙ্গদেশকে আমার উপার্জনভাগী করিব, আমার উপার্জন-গৌরবে বঙ্গের সরস্বতীকে বিশ্বের পূজনীয় করিয়া বঙ্গ-সাহিত্যকে রাজটীকা পরাইয়া দিব, ইহাই ছিল মধুসূদনের সকল বিদ্যানুরাগের গৌণমুখ্য লক্ষ্য! মেঘনাদবধ কাব্যের প্রারম্ভে কল্পনার আবাহনে কবির প্রার্থনা:—

রচ মধুচক্র, গৌড়জন যাঁহে
আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।

ইহা ক্ষত্রিয়রীতির পাণ্ডিত্য-যজ্ঞ! ইহা জীবনে বিশ্বজিৎ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান! এই অনুষ্ঠানে বিশ্বভুবন জয় করিয়া আনিয়া সর্বস্বই দক্ষিণা করিতে হয়; কেবল অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীর এবং জন্মস্বত্বে রাজচক্রবর্তী ব্যক্তিই এই অনুষ্ঠান সমাধা পূর্বক স্বয়ং ভিখারী সাজিবার স্বত্ব এবং যোগ্যতা রাখে!

মধুসূদন তের বৎসর বয়সে গ্রামের বিদ্যালয় হইতে দেশের রাজধানীর 'মহা বিদ্যালয়' হিন্দু কলেজে প্রবেশ করেন। তাঁহার জীবন-দেবতাই যেন পিতাকে সুমতি দিয়া মধুসূদনকে এইরূপে ক্ষুদ্র গ্রাম্য বালকের সংকীর্ণ শিক্ষাপথ হইতে 'পৃথিবীর অধিবাসী' হইবার প্রশস্ত রাজবর্ত্মে লইয়া আসিলেন! এ সুযোগ আমাদের অনেকের অদৃষ্টেই হয়ত বিধাতা ঘটাইতেছেন, কিন্তু কয়জনে সুযোগের সমস্ত সুফল চয়ন করিতে পারিতেছি? মধু পারিয়াছিল। কবির অন্তরাত্মার খোরাকের জন্য যাহা যাহা দরকার, পরকালে 'নব্য-বঙ্গের মহাকবি'র মূর্তি গঠন করিতে যে সমস্ত উপাদান অপরিহার্য ছিল, মধুসূদন ঠিক সে সমস্তই চুম্বকের মত আকর্ষণপূর্বক বড় হইতে লাগিলেন। হিন্দু কলেজে তৎকালের শিক্ষাগুরু সমস্তও বিধাতা মধু-গঠনের উপযোগী করিয়াই ঘটনা করিয়াছিলেন। একজন প্রধান শিক্ষক ছিলেন প্রসিদ্ধনামা ডিরোজিও, যিনি কবিত্ব শক্তিতে 'ইউরেশীয় বায়রণ' বলিয়াই প্রথিত হন এবং বায়রণের মতই অকালে জীব-লীলা সাঙ্গ করিয়া যান। ডিরোজিও বিশ্বাস করিতেন, মানুষ একটি মনন-শীল মহাশক্তি; সুতরাং মনোদ্বারে

সমগ্র জগৎকে অধিকার করাই হইল মানুষের প্রধান ধর্ম। মনুষ্যের সমস্ত মনোবৃত্তি বিকশিত করিয়া উহাকে বিশ্বের উপযুক্ত গ্রাহক এবং অধিপতি করিয়া তোলাই হইল শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। যুক্তিই হইল মনুষ্যের দৃষ্টি; সুতরাং যুক্তিদ্বারা পরিবার, সমাজ এবং ধর্মের সমস্ত কার্যাকার্য তুলাইয়া-মূলাইয়া এবং যাচাই করিয়া—পরের কথা একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া—স্বাধীনভাবে চলাই হইল মনুষ্যের প্রধান কর্তব্য। এই 'বুদ্ধি'-আদর্শের বশীভূত হইয়া ডিরোজিও তাঁহার শিষ্যদের মধ্যেও স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ উদ্দেশ্য করিতেন, স্বাধীনচিন্তা এবং স্বাধীন আচার-ব্যবহারের পরিপোষণই লক্ষ্য করিতেন। 'মানুষের আত্মপ্রতিষ্ঠা'ই তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল! অপর এক শিক্ষক রিচার্ডসন্। তাঁহার মূলমন্ত্র ছিল 'সৌন্দর্য'। মানুষ এ পর্যন্ত সমাজে সাহিত্যে ধর্মে যাহা যাহা করিয়া আপনার 'মনুষ্যত্ব' প্রতিষ্ঠা করিয়াছে, পশুত্ব অথবা বর্বরতা হইতে সভ্যতায় উদ্বর্তন-পথে মানুষ যাহার সাহায্যে উত্তীর্ণ হইয়া আসিয়াছে, যে দেবতা মনুষ্য নামক জন্তুর দেহকে দেবমন্দিরে পরিণত করিয়াছেন, তাঁহারই নাম হইল 'সৌন্দর্য-বুদ্ধি'। তিনিই মনুষ্য-জীবনের লক্ষ্মী, মনুষ্যের সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্র, ভাস্কর্য ও স্থাপত্য তাঁহারই চরণতলাশ্রিত পঞ্চকমল। উহারা মনুষ্যের আনন্দপুরীর 'পঞ্চপ্রদীপ'! এই পঞ্চপ্রদীপ ধারণেই মানবাত্মা সত্য-শিব-সুন্দরের পুরীতে আরতি করিতেছে! এইরূপ একটি আদর্শই নিঃসন্দেহে রিচার্ডসনের মনে ছিল। কিন্তু তিনি অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করিতেন, থিয়েটারের টিকিটখানি হাতে দিয়া শিষ্যদের বলিতেন, 'আশা করি তুমি আজ থিয়েটারে যাইতেছ'। কি ডিরোজিও কি রিচার্ডসন্, উভয়ের মধ্যেই একটা টাইটানিক প্রচণ্ডতা ছিল। কথায়-কার্যে সংযম কাহাকে বলে তাঁহারা জানিতেন না। গুরুদ্বয়ের এই অসংযত-সংবেগ এবং উদ্দামগতির আদর্শ, এই আসুরিক প্রচণ্ডতার আদর্শ-রস যে নিদাঘের দাহ-তৃষ্ণাতুর ভূমির মতই যুবক-শিষ্যগণ পরম উৎসাহে পান করিতে থাকিবে, তাহাতে বিচিত্রতা কি? উহার ফলেই ভারত-বিশ্রুত 'ইয়ং বেঙ্গল'-এর উৎপত্তি; বঙ্গের সমাজ-ইতিহাসে যাঁহাদের 'চণ্ড-মুণ্ড' দল বলিয়া নামকরণ হইতে পারে। বাঙ্গালীর অধ্যাত্ম-ইতিহাসে তখন একটি Storm

and Stress বা 'ঝড়-তুফানের যুগ'ই মূর্তিমান হইয়াছিল। এই ঝড়তুফান বঙ্গের সাহিত্য-সমাজ-ধর্ম সমস্তকেই একবার প্রবলভাবে নাড়া দিয়া গিয়াছে। উহার জের এখন যাবৎ অন্ততঃ বঙ্গের সাহিত্যক্ষেত্রে চলিতেছে! এই ঝড়তুফানের কথা, যাহা সমসাময়িক ব্যক্তিগণ এবং ন্যূনাধিক 'ভুক্তভোগী'-গণের লেখনী-মুখেই অপরূপ বর্ণনা লাভপূর্বক প্রত্যেক বাঙ্গালীর অবশ্যপাঠ্য হইয়া আছে, তাহা লইয়া আমাদের সময়ক্ষেপ করার প্রয়োজন নাই। মনে রাখিতে হয় যে, মধুসূদনও কতকটা সময়স্রোতে পড়িয়া এবং কতকটা আপন প্রাণের জ্বালাপূর্ণ সহানুভূতির বাধ্য হইয়াই একজন 'চণ্ড-মুণ্ড' হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আমাদিগকে বুঝিতে হয়, কি ডিরোজিও, কি রিচার্ডসন্, ইঁহাদের কেহ যে কোনরূপ দুরভিসন্ধি বা দুর্বৃত্ততার বশে এইরূপ শিক্ষাপ্রণালী অবলম্বন করিয়াছিলেন তাহা নহে; উহা প্রধানতঃ ইংলণ্ডেরই শিক্ষাপ্রণালী। আমাদের দেশের ন্যায় ছাত্র-দমন বা বালক-দলন বলিয়া এক পদার্থ ইংলণ্ডে নাই বলিলেও চলে! সেখানে শিক্ষকগণ ছাত্রদের 'বন্ধু' ব্যতীত আর কিছুই নহেন, এবং বন্ধুতার আসন হইতেই তাঁহাদিগকে শিক্ষকতা নির্বাহ করিতে হয়। আমাদের দেশে যেমন ছাত্রগণ পরিবারের ভবিষ্যৎ জীবিকার আশাস্তম্ভরূপেই শিক্ষালয়ে যায়, এবং স্তম্ভটি কোনদিকে মচ্‌কাইয়া উঠিলে একটা সংসারই ভাঙ্গিয়া পড়ার আশংকা থাকে, ইংলণ্ডে সেরূপ নহে। ঐ দেশের পিতামাতা সন্তান হইতে কোনরূপ ভবিষ্যৎ সাহায্যের আশা রাখা দূরে থাকুক, শিক্ষালয়ে প্রবেশের উপযুক্ত বয়সলাভের পর হইতে সন্তানকে পরিবারতন্ত্র হইতে একরূপ বহিষ্কৃত বলিয়াই ধরিয়া লয়। তাহারা চায়—সন্তান উপযুক্ত হইয়া সংসারে নিজের পায়ে দাঁড়াইতে শিক্ষা করুক, এবং পারে ত স্বয়ং স্বতন্ত্র পরিবারের কর্তা হউক! তাহাকে একদিন একাকী হইয়া, একেবারে অসহায় অবস্থিত হইয়াই ইহসংসারের ঝড় ঝাপ্‌টা সহ্য করিতে হইবে; এই ঝড়েই নিজের নৌকাটি চালাইতে হইবে; সুতরাং তাহার ভাবীজীবনের বিষয়ে সে-ই দায়ী। এই দায়িত্ব-জ্ঞান লাভের জন্য ছাত্রকে ইংলণ্ডের বিদ্যালয়সমূহে একরূপ 'ডোর কাটিয়া'ই ছাড়িয়া দেওয়া হয়, তাহার উপর

শাসনের কিছুমাত্র কড়াকুড়ি নাই। ইংরেজ বালকগণ যেরূপ স্বেচ্ছাপথগামী, যে ভাবে এক অন্যের নাকে ভাঙ্গিয়া দেয়, শিক্ষালয়ের কর্তৃপক্ষগণও যে ভাবে ছাত্রগণের ওই-সমস্ত দোষের দিকে 'চোখ বুজিয়া'ই চলিয়া যান, তাহা বাস্তবিকই আমাদের প্রণিধানের যোগ্য। অকস্‌ফোর্ড এবং কেম্ব্রিজেও ছাত্রদের জন্য নীতি-শাস্ত্র এবং ধর্ম-আচারের একটা বাহ্য আবরণ আছে মাত্র, ওই আব্রু রক্ষা করিয়া ছাত্রেরা যথেচ্ছভাবেই আচরণ করে। আমাদের আদর্শের 'ভাল ছাত্র' যে সেখানে একেবারে নাই, এমন নহে; কিন্তু ব্রহ্মচর্য বলিয়া আদর্শটি অধিকস্থানে কেবল নামমাত্রে পর্যবসিত হইতেই দেখা যাইবে! দুর্বৃত্ততা এবং অনাচারের জন্যই ইয়োরোপের ছাত্রজীবন প্রসিদ্ধিলাভ করিতে পারে। সকল দিকেই উহাদিগকে স্বেচ্ছানুবর্তী এবং প্রচণ্ড হইবার জন্যই যেন স্বাধীনতা দেওয়া হয়! কেবল সমাজ-জীবনে বা বিবাহিত-জীবনে প্রবেশ করিলেই লোক যুবকদের নিকট হইতে সভ্যতা-ভব্যতার প্রত্যাশা করে। এই সমস্তের কারণও যে নাই, তাহা নহে। ঐ জাতির লোক মনে করে, তাহারা পৃথিবীর রাজা; তাহাদের সন্তান-সন্ততিকেও এই পার্থিবরাজত্ব অধিকার করিয়া এবং উহা বজায় রাখিয়াই চলিতে হইবে। এই পৃথিবীর সকল প্রকার ঝড়-ঝাপ্‌টা, বিপদ-আপদ, অত্যাচার-অবিচার এবং অনাচারের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহ এবং সন্ধি করিয়া, হয়ত উপস্থিতমতে স্বয়ং কর্তা এবং কর্ম উভয় ভূমিকাতেই তাহাকে চলিতে হইবে। এ-সংসারে 'যোগ্যতমেরই জয়'! সুতরাং শিক্ষার ক্ষেত্রে তাহাকে কেবল 'গায়ে ফুঁ দিয়া' 'শিকার উপর তুলিয়া' রাখিলেই চলিবে না। তাহাকে একেবারে শিকলকাটা করিয়াই এই শিক্ষানবিশীর মুক্ত-আকাশে ছাড়িয়া দেওয়া চাই! যে উহাতে আত্মরক্ষা করিয়া, উত্তীর্ণ হইয়া ঘরে ফিরিতে পারে, সেই হইল সমাজের প্রকৃত লাভ! যেই ফল ওইরূপে পাকিবার সম্ভাবনা নাই, যেই-টি স্বাধীনতা-বায়ুর ঘাতসহ নহে, সেটি এ-অবস্থাতেই 'ছিঁড়িয়া ঝরিয়া পুড়িয়া পড়িয়া' মরুক, তাহার জন্য পরিবারের বা সমাজের কিছুমাত্র আপশোষ নাই! কেবল ইংরেজ জাতি কেন, সকল ইয়োরোপীয় জাতি-ই এইরূপে স্বাধীনতার আগুনে পোড়াইয়া তাহাদের

সন্তানের শিক্ষা 'বাজাইয়া' লয়। এ-জন্যই হয়ত উহাদের অনেকের 'সাদা গায়ে কাল দাগ' থাকে! কিন্তু ওইরূপ দাগকে তাহারা যেন গ্রাহ্যই করে না! ইহা শিক্ষার আসুরিক পদ্ধতি সন্দেহ নাই। কিন্তু এ-অসুরেরাই ত চিরকাল দেবতাকে ভাগাইয়া পুনঃপুনঃ স্বর্গলোক ভোগ-দখল করার যোগ্যতা অর্জন করিয়া আসিতেছে! ফলতঃ, সভ্যতার ক্ষেত্রে দৈব-এবং অসুর-আদর্শের দ্বন্দ্ব চিরকালের কথা। সংসারের স্বর্গপুরীর অধিকার চিরকাল দেব এবং অসুরের মধ্যে যেন পর্যায়ক্রমে পরিবর্তিত হইয়া আসিতেছে—উপস্থিত যোগ্যতাই ইহার নিয়ামক। তবে, ভারতীয় দৃষ্টি চিরকাল দৈবী-সভ্যতাকেই পরিণামজয়ীরূপে দর্শন করিয়া আসিতেছে।

৩

১৮৪৩ অব্দে, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মধুর হিন্দু কলেজের শিক্ষাজীবন সমাপ্ত হইয়া যায়। এই ধর্মান্তর-গ্রহণ সম্বন্ধে আমাদের কিছুই বলিবার থাকিত না, যদি ধর্মবিশ্বাসের তাড়নাতেই তিনি এ-কার্য করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ মিলিত। মধুসূদনের ইংলণ্ডে যাইবার 'সখ' 'অত্যন্ত' প্রবল ছিল—সখ-ই বা বলিব কেন, উহা তাঁহার চিরজীবনের বাসনা—রক্তগত, প্রাণগত তীব্রতম আকাঙ্ক্ষা! "আমি সর্বশ্রেষ্ঠ কবি হইতাম, যদি কেবল ইংলণ্ডে যাইতে পারিতাম।" ১৫।১৬ বৎসর বয়ঃক্রম হইতেই, কামারের হাপরের ন্যায় এইরূপ এক অদ্ভুত তপ্তনিঃশ্বাস মধুসূদন থাকিয়া থাকিয়া পরিত্যাগ করিতেছিলেন! 'কবি' হওয়ার বাসনা মধু-জীবনের সর্বপ্রধান পরিচালক-শক্তি বলিয়াই স্থির করিতে হয়, বিলাতগমনের আকাঙ্ক্ষা উহার ইন্ধনরূপেই বর্তমান ছিল। আবার, তাঁহার চরিত্রের সর্বাপেক্ষা কোমল অংশ এবং দুর্বলতার ছিদ্রপথও এই বিলাতগমনের আশার মধ্যেই ছিল। আমরা দেখিব, এ-ছিদ্রপথেই সাংসারিক জীব মধুসূদনকে সর্বস্ব খোয়াইতে হইয়াছে! এই পথেই তাঁহার পৈতৃক-ধর্ম গিয়াছে এবং সাংসারিক

সুখ ও অর্থস্বাচ্ছন্দ্যের যাহা কিছু অবলম্বন বা সম্ভাবনা ছিল, তাহাও বিলাতগমন হইতেই ডালেমূলে খোয়াইতে হইয়াছে। মধু-চরিত্রের এই ছিদ্রপথেই নাকি তাঁহার নিদানবন্ধু পাদ্রীপ্রবর বিলাতগমনের সাহায্য-নিশ্চয়তার আশ্বাস-সহযোগে পরিত্রাণের শর নিক্ষেপ করেন! এবং উহাতেই সরলবিশ্বাসী কবির মর্মভেদ করিয়া তাঁহাকে একেবারে জর্ডন নদী পর্যন্ত উড়াইয়া লইয়া যায়! অবশ্য ঐ স্থান হইতে উদ্ধারকারী পরম বন্ধুটির আর কোন খবর নাই।

কবিকে জীবনের এই প্রথম লেনাদেনার হিসাবেই প্রবঞ্চিত হইতে এবং দুনিয়া-দারীর যুদ্ধে প্রথম বাজীতেই পরাজিত হইতে দেখিলে কার না দুঃখ হয়! স্বাধীনতায় তাঁহার হাত পোড়াইল, তিনি কোন মতে আত্মরক্ষা করিতে পারিলেন না! তবে ইহাও তাঁহার শিক্ষার একটি সোপান। যে কবি পরকালে "আশার ছলনা" এবং "মেঘনাদবধের" করুণ সঙ্গীতে বাঙ্গালীকে কাঁদাইয়াছেন, তাঁহার অভিজ্ঞতার প্রথম সোপান! কবিগণকে অনেক সময় এইরূপে নিজের হৃদয়রক্ত দিয়া এবং স্বয়ং কাঁদিয়াই সাহিত্যতন্ত্রের করুণ রাগিণী-আলাপ শিক্ষা করিতে হয়! কবির "আশার ছলনা" নামক কবিতাটির সংকেতিতার্থের আমলও এস্থান হইতে আরম্ভ হইয়াছে বলিয়াই মনে হইবে। ঐ-কবিতার অর্থটুকুই হইল কবিজীবনের প্রধান সিদ্ধি! জীবন-যাত্রী মধুসূদনের প্রধান প্রাপ্তি! কবিজীবনের আদ্যন্ত-মধ্য মথিত করিয়া উঠিয়াছে একটা হৃদয়-মর্মভেদী দীর্ঘনিঃশ্বাস! তাঁহার কবিত্ব-কৃত্যের প্রধান শক্তি যোগাইয়াছে ঐ দীর্ঘনিঃশ্বাস! হায়! এইরূপে 'আশার ছলনা' এবং অভিজ্ঞতার নির্দয়-নির্মম বিদ্যাগৃহে পাঠ অভ্যাস ব্যতীত কি মানুষের প্রকৃত শিক্ষা হয় না! হাত না পোড়াইয়া অগ্নির বিদাহ-শক্তি বুঝিবার জন্য উপায়ান্তর নাই। মনুষ্যের ইহাই 'অদৃষ্ট'! কিন্তু এই বিদ্যালাভের জন্য হতসৌভাগ্য ছাত্রকে যে শিক্ষাপণ দিতে হয়, যে গুরুভার-গুরুদক্ষিণা যোগাইতে হয় উহা কি ভয়ঙ্কর! কি দুর্বহ-দুর্ভর এবং প্রাণান্তকর!

খ্রীষ্টানী স্বীকারের সঙ্গে সঙ্গে খ্রীষ্টধর্মের মহাশিক্ষা মধুসূদনকে পাইয়া বসিল। পরিতাপের বিষয়, তিনি সজ্ঞানে প্রকৃত খ্রীষ্টানের ন্যায় এই শিক্ষাকে বরণ করিতে

জানেন নাই। পণ্ডিতবর বেকন খ্রীষ্টধর্মের সহিত অন্য ধর্মের পার্থক্য দেখাইয়া, একরূপ অহংকারের স্বরেই বড়গলায় ঘোষণা করিয়াছিলেন, "Prosperity is the message of the old Testament, adversity of the new." এই আদর্শে খ্রীষ্টানমাত্রকে তাহার পরিত্রাণ-গুরুর পথেই দুঃখকে বরণ করিয়া লইতে হয়,—গুরুর মতই নিজের ক্রুশখানি নিজের স্কন্ধে লইয়া তাঁহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিতে হয়। দুঃখের ক্রুশটিকে একেবারে হৃদয়ের অন্তরঙ্গ সান্নিধ্যে ঝুলাইয়া রাখিয়াই জীবনের 'ব্রত-উদ্‌যাপন' করিতে হয়। ভারতবর্ষ তিতিক্ষা এবং সন্ন্যাস বলিতে যাহা বুঝিয়াছে, খ্রীষ্টধর্মও অর্থতঃ এবং কার্যতঃ ক্রুশতত্ত্বে তাহাই বুঝাইতেছে! আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন নিজের অন্তরাত্মার প্রবল অদৃষ্টগত রাজসিক ঝোঁক গতিকেই কি হিন্দু কি খ্রীষ্টীয়-ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সহানুভূতি-সিদ্ধি করিতে এবং অধ্যাত্ম-শান্তি লাভ করিতে পারেন নাই।

মধুসূদন যেমন অধ্যাত্মতঃ ত্রিশঙ্কুদশায় ছিলেন, তেমন খ্রীষ্টধর্ম স্বীকারের পর হইতে তাঁহার সাংসারিক ত্রিশঙ্কুদশাও একেবারে পরিস্ফুট হইয়া বেদনা জন্মাইতে লাগিল! তাঁহার পূর্বের বন্ধু-বান্ধবগণ এবং পৈতৃক-সমাজ যেন উক্ত প্রবল-অস্বীকারের আঘাতেই দূরগত হইয়া গেল, অথচ যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া স্বীকার করিয়া লইলেন, তাহারাও মনে-প্রাণে তাঁহাকে আহ্বান এবং গ্রহণ করিল না! হিন্দুর সমাজ-ধর্মে অপর সহস্রদিকে অযোগ্যতা কিংবা দুর্বলতা থাকুক, উহা দূর-দূরান্ততম ব্যক্তিগণের মধ্যেও যেই পরস্পর-সহায়তা এবং কুটুম্বিতার সম্বন্ধ ঘটনা করে, স্নেহপ্রীতিমমতার যে অন্যোন্যাশ্রয় বন্ধন রচনা করে, তাহার সমতুল্য পদার্থ জগতের অন্য কোন সমাজ-সংঘ মধ্যেই মিলিবে না! মধুসূদন সেই 'হারাধন' আর কোথায় পাইবেন? একা! একা! একা! সংসারে যাহারা অন্তরে তিতিক্ষাকে বরণ করিতে পারে নাই, তাহাদের পক্ষে এই একাকী এবং অসহায়ের অবস্থা কি ভয়াবহ ভাবেই ক্লেশকর! হৃদয়-মর্মের কি ঘোর অবসাদক! বিশেষতঃ মধুর ন্যায় প্রেমজীবী কবির পক্ষে!

মধুসূদনের ধর্মান্তর গ্রহণে তাঁহার মাতাপিতার হৃদয় ভাঙ্গিয়া গেলেও, এবং পুত্রটি প্রকাশ্যতঃ তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিলেও পিতামাতা পুত্রকে তত্ত্বতঃ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। এই বিদ্রোহী এবং স্বৈরপথাবলম্বী শিশু যাহাতে সংসারে আপন পায়ের উপর দাঁড়াইতে পারে উহার ব্যবস্থা করিতে তাঁহারা কুণ্ঠিত হইলেন না। পৈতৃক ব্যয়েই মধুসূদনের শিক্ষাজীবন বিশপস কলেজে নূতন করিয়া আরম্ভ হইল; ১৮৪৩ হইতে ১৮৪৭ অব্দ পর্যন্ত এই শিক্ষাজীবন চলিল। সুতরাং বঙ্গদেশের বুকে রাখিয়াও এই শিক্ষা মধুসূদনকে অশনে-বসনে, চলাফেরায়, কথায় এবং কার্যে সম্পূর্ণ বিধর্মী, বি-সমাজী এবং বিদেশী করিয়া তুলিতে লাগিল। কিন্তু মধুর হৃদয়ে, তাহার রক্তের প্রচণ্ডতা-ধর্মের মধ্যে স্থিরতা এবং শান্তি বলিয়া বা শমদম বলিয়া কোন পদার্থ যে ছিল না! তাঁহাকে যে চলিতে হইবে—বল্গাবিহীন অশ্বের মতই আপন অদৃষ্টের তাড়নে ছুটিতে হইবে! 'সাত ঘাটের তের পানী' তাঁহাকে না খাওয়াইলে যে বঙ্গসাহিত্যের অন্তর্যামী-দেবতার উদ্দেশ্য কোন মতেই পূর্ণ হয় না! তাই হতভাগ্য কবিকে আবার ছুটিতে হইল—কেন ছুটিতেছেন, কোথায় কোন্ লক্ষ্যে ছুটিতেছেন, কিছুমাত্র স্পষ্টভাবে তাঁহার নিজেরই জানা নাই, অথচ ছুটিতে হইবে! ছুটিয়া ছুটিয়া অকস্মাৎ একেবারে মাদ্রাজে উপস্থিত!

এস্থলে আমাদের দেখা এবং বলা উচিত যে পূর্বোক্ত প্রচণ্ডতা-তত্ত্বের শিক্ষানবীশ যেমন মধুসূদন, উহার সাধক, পুরোহিত এবং 'বলি'ও তেমন মধুসূদন। তেমনি, আবার বঙ্গদেশের ওই 'ঝড়-তুফান'-যুগের প্রকৃত প্রতিনিধি বলিতে, উহার শুদ্ধ সাঙ্গ দৃষ্টান্ত বলিতেও মধুসূদনকেই বুঝাইতে পারে। সুতরাং এস্থলে, তাঁহার জীবনের মূল বার্তাগুলি এক নিঃশ্বাসেই শেষ না করিলে অধ্যাত্ম-তত্ত্বের অনুগত বিবৃতি হইবে না। মাদ্রাজে যাইয়া ১৮৪৮ হইতে ১৮৫৬ অব্দ পর্যন্ত ৮ বৎসর প্রবাস—প্রবাসেই 'ইংরাজী ভাষায় বড় লেখক এবং বড় কবি' হইবার দুরাশায় কাব্য-রচনা; একজন ইয়োরোপীয় মহিলাকে প্রেম এবং 'প্রেমের নিগড়' পরিধান; অল্পকাল পরেই পুত্রকন্যাসহ

পত্নীর সহিত একেবারে সম্বন্ধবিচ্ছেদ ; হেন্‌রিয়েটা নাম্নী আর এক মহিলার সম্বন্ধ স্বীকার ; এবং অদৃষ্টের তাড়নাতেই আবার বঙ্গদেশে প্রত্যাবর্তন !

এই ঘটনাপ্রবাহের মধ্যে, এই প্রচণ্ড বন্ধন এবং প্রচণ্ড বিচ্ছেদের তুফান-মধ্যে কেবল বঙ্গ-কবি মধুসূদনটির অবিচ্ছিন্ন শিক্ষাসূত্রকেই আমাদের প্রকৃত দরকার ; এই তুফানের মধ্যে তাঁহার জীবন-দেবতার স্থির উদ্দেশ্যটুকুই আমরা লক্ষ্য করিতেছি। বঙ্গভাষার রীতি এবং আবহাওয়ার মধ্যে একটি তুফান আনা চাই ; যেমন বাঙ্গলা সাহিত্যের ছন্দ মধ্যে তেমন উহার অধ্যাত্ম প্রকৃতির মধ্যেও এমন একটা পূর্বাপরসম্বন্ধ-বিচ্ছেদী এবং বিপ্লবময় মহাঝড় ছুটাইয়া দেওয়া চাই যে তাহার আঘাতে যেন বঙ্গদেশের সমাজসভ্যতা এবং ধর্মের অন্তর্লোকে দীর্ঘ-দীর্ঘকাল ধরিয়া ছুটিয়াও হতবল হয় না ! মধুসূদন বাঙ্গালীর অদৃষ্টদেবতার ক্রিয়াযন্ত্র বই নহেন ! সুতরাং এই অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং মস্তিষ্কশক্তিমান্ ব্যক্তির সমস্ত কার্যেই যেন সদসদ্‌বিচারবিহীন তরঙ্গ-ধর্মে, এবং দৈবগ্রস্ত আবেগধর্মেই প্রচণ্ড হইয়া প্রকাশ পাইয়াছে ! একদিকে আত্মশক্তির প্রচণ্ডতা—অন্যদিকে নিজের বাহির হইতে প্রচণ্ডতর শক্তিবিশেষের আবেশগ্রস্ততা !

কবিজীবনের অধ্যাত্মসূত্র কেবল এ স্থানেই শেষ হয় নাই। স্বদেশে ফিরিয়াও কেবল ৪ বৎসর মাত্র—১৮৫৮ হইতে ১৮৬২ অব্দ পর্যন্ত—মধুসূদনের প্রকৃত সাহিত্যজীবন ও বাণীসাধনা ! এই চারিটি বৎসর ! ইহার মধ্যে একটা তুফানের মতই তিনি বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে যুগ-যুগান্তের শিলা-শৃঙ্খল-বদ্ধ নিশ্চল হ্রদের অবস্থা হইতে স্বাধীনতার মুক্ত আকাশে এবং বিশ্ব সম্পর্কের মুক্ত বাতাসে লইয়া আসিয়া গঙ্গাপ্রবাহের মতই বহুমুখে ছুটাইয়া দিয়াছেন ! এক জীবনের আপাতদৃষ্ট ক্ষুদ্র চারিটি বৎসরেই কি এত বড় একটা বৃহৎ ব্যাপারের আরম্ভ এবং পরিণতি বুঝিয়া লইব ? মানবজীবনের দর্শনশাস্ত্র কিন্তু এইরূপ আকস্মিকতা স্বীকার করে না। অতীত জীবনের সমগ্র মধুসূদন দত্ত, সাগরদাঁড়ি গ্রামের জন্মমুহূর্ত হইতে আরম্ভ করিয়া—

কবির 'তিলোত্তমা' সৃষ্টির ন্যায়—জীবনের সকল জ্ঞানকৃত এবং অতর্কিত ঘটনার মধ্য দিয়া হৃদয়ে এবং বুদ্ধিতে, কর্তা অথবা কর্ম স্বরূপে, অধ্যয়নে এবং স্বাধীন পর্যবেক্ষণে যে মধুসূদন শিক্ষালাভ করিয়া আসিতেছিলেন, তিনিই বঙ্গসাহিত্যে আসিয়া এইরূপে পরীক্ষাদানপূর্বক নিজের অমরতা সিদ্ধি করিলেন!

কেবল এ স্থানেই শেষ নহে। কবি মধুসূদনকে—বঙ্গসাহিত্যের শীর্ষদেশে একরূপ সর্বসম্মতভাবেই উন্নীত-এবং অবস্থিত-মধুসূদনকে, নিজের অমরত্বের কৌলীন্যগর্বে রাত্রিদিন স্ফীতবক্ষ-মধুসূদনকে—উহাতেই তৃপ্ত করিতে পারিল না, তাঁহাকে ব্যারিষ্টার হইতে হইবে! "No more Madhu, the কবি, old fellow, but Michael M. S. Dutt, esquire of the Inner temple, Barrister at law! Ha! Ha!! Isn't that grand?" পাঠক! এই উচ্ছ্বাস, এই আপাতকৌতুকের উল্লাসের মধ্যে কি কেবল মধুসূদনের কণ্ঠই শুনিতেছেন? উহার মধ্যে অদৃষ্টদেবতার প্রচণ্ড পরিহাসটাও কি একেবারে বিকট হইয়া উঠে নাই? উহার বাধ্য হইয়াই আবার ছুট!—একেবারে ইংলণ্ডে! তাঁহার নিজের কথায়—

"Far away—far away
From the land he loved so well—
And be hanged for it,"

ইংলণ্ডে ৫ বৎসর—১৮৬২ হইতে ১৮৬৭ অব্দ পর্যন্ত। কায়ক্লেশে, সাহায্য করিবার জন্য প্রতিজ্ঞাকারী চিহ্নিত বন্ধুগণের দুর্ব্যবহারে, অন্নকষ্টে, মনঃকষ্টে, ঋণকষ্টে, একরূপ ভিক্ষায় এবং পরিশেষে বঙ্গ-পূজ্য সেই বিদ্যাসাগরের দয়ায় ব্যারিষ্টারী পাস-পত্র পকেটে করিয়া কলিকাতায় হাজির। উহার ফল কি হইল? সনন্দখানি—ব্যবহারশাস্ত্রের জ্ঞানমাতা সরস্বতীদেবীর স্বহস্তলিখিত সেই অনুরোধ পত্রখানি বিধিমতে চোখের সমক্ষে ধরিলেও লক্ষ্মীমাতা একেবারে বিমুখ! তাহার পর ৬ বৎসর ধরিয়া আবার সেই অন্নকষ্ট, মনঃকষ্ট, ধার-কর্জ,

ভিক্ষা, নিরাশায় নিশ্বাস, রোগশোক, অনুতাপ ও পরিশেষে সস্ত্রীক 'আলিপুর দাতব্য চিকিৎসালয়ে'—

এই শেষের পরিণামটি উল্লেখ না করিলেই ভাল। যাহাতে সমগ্র বাঙ্গালী জাতির 'আঁতে ঘা' লাগে, আমাদের মুখ যাহাতে চিরকলঙ্কের কালিমায় লেপিয়া রাখিয়াছে, এখন বঙ্গোপসাগরের জল ঢালিলেও যাহা ধুইয়া যাইবার সম্ভাবনা নাই, সেই ঘটনাটি বিস্মৃত হইতে পারিলে ভাল হয়, কিন্তু ভোলা তো যায় না! মধুসূদনের এই জীবন-গতি এবং নিয়তির আদ্যন্ত-মধ্যে একটা demon আছে—একটা ডাকিনী-শক্তি আছে। যে demon-এর অস্তিত্বে মহাত্মা সক্রেটিস বিশ্বাস করিতেন—যে তাঁহাকে সকল কর্মে পরিচালিত করিয়া, তাঁহার সকল কার্যের অন্তরালে থাকিয়া পরিশেষে স্বহস্তবৃত বিষপানে তাঁহার নিয়তি ঘটাইয়াছে। দৈবতত্ত্বে বিশ্বাস কর আর না-ই কর, যে নামেই উহার নামকরণ কর, সকল মহাপুরুষের জীবনতত্ত্বে এইরূপ একটি 'ডাকিনী'-শক্তির ক্রিয়া কিছু-না-কিছু প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে! খ্রীষ্ট-মহম্মদ-চৈতন্য, কিংবা সীজার, নেপোলিয়ন, রিসেলিউ—জগতের অধিকাংশ বীরধর্মী-পুরুষের মধ্যে, মনুষ্যজাতির অতীত বা বর্তমান কালের ধর্মবীর-কর্মবীর-ভাববীর-চিন্তাবীর ব্যক্তিমাত্রের জীবনীমধ্যে, এরূপ একটি দুর্বার গতিলক্ষণা এবং আপাততঃ কার্যকারণ-সূত্রের সম্বন্ধ বিরহিতা, অঘটনঘটন-পটীয়সী শক্তির দেবকীলীলাই প্রত্যক্ষ করিবে! মহাপুরুষ মাত্রেই দেবকীপুত্র! এবং এই পুত্রগণ অনেক সময় মাতৃমন্দিরে আপনাকেই মহাবলিরূপে উৎসর্গ করিয়া যান! লোকোত্তরা প্রতিভার এই "শাক্ত আদর্শ" মনুষ্য-উন্নতির ইতিবৃত্তে সমুজ্জ্বল রক্ত অক্ষরে দিগ্‌দিগন্তদীপী জ্যোতিরক্ষরে লিখিত হইয়াছে! মধুর 'জীবনী'-লেখক, আমাদের শ্রদ্ধাভাজন যোগীন্দ্রবাবু মধুসূদনের সকল দুঃখকষ্টের জন্য কেবল তাঁহাকেই 'দায়ী' বুঝাইবার উদ্দেশ্যে যেন অত্যন্ত 'বাড়াবাড়ি' রকমের উদ্বেগ দেখাইয়াছেন। কবিজীবনীর সর্বত্র এতটা মামুলীরকম নীতিশাস্ত্রের দৃষ্টান্ত-বাদ অনুসরণ না করিলেই হৃদ্য হইত মনে করি। উহাতে একেবারে 'নীতি পাঠশালা'র দুর্ভাগ্য বালকগণকে লক্ষ্য করিয়া

গ্রন্থখানি রচিত হইয়াছে০ বলিয়া ধারণা জন্মিতে থাকে। জীবনী-লেখককে একেবারে আধুনিক স্কুল মাষ্টারের প্রচণ্ড উচ্চ সিংহাসনে উপবিষ্ট দেখিয়া পাঠকের মন অতর্কিতে ক্ষুণ্ণ হইতে থাকে। মধুসূদনের জীবন-তলে যে একটা অপরিহার্য নিয়তির ডাকিনীশক্তি ছিল, উহার দিকে পাঠকের দৃষ্টি আবিল হইয়া যায়! মধুসূদনের শেষ নিয়তির মধ্যে—দাতব্য চিকিৎসালয়ে মৃত্যুটির মধ্যে কি ওই অদৃষ্ট শক্তির পরিস্ফুট লীলাটিই মুখ্য হইয়া উঠে নাই? কার্যকারণক্ষেত্রে ওইরূপ মৃত্যুর কোন সম্ভাবিত অজুহাত আছে কি? মধুসূদন দরিদ্র ছিলেন, কিন্তু দরিদ্র হইলেই তো সমাজে দাতব্য চিকিৎসালয়ে মরণদণ্ড লাভ করিতে হয় না—অন্ততঃ ভারতবর্ষের সমাজে! ঐরূপ যোগ্যতা তো মধুসূদনের ছিল না! মধুসূদন সম্ভ্রান্ত বংশের সন্তান—স্বয়ং কলিকাতা হাইকোর্টের ব্যারিষ্টার—M. S. Dutt Esqr.! Learned Profession সমূহের শীর্ষবিভাগে বঙ্গদেশের একজন বিখ্যাত পণ্ডিত-ব্যক্তি; তৎকালেই বঙ্গদেশের সকল শিক্ষিতজনের মাননীয় এবং হৃদয়ঙ্গম শ্রেষ্ঠ-কবি। এমন এক ব্যক্তি, যাঁহার নাম বঙ্গসাহিত্যে নিঃসন্দেহে অমর নাম-মুদ্রায় জাগিয়া থাকিবে, যাঁহার নামের সম্পর্কে আনিয়া কোনরূপে নিজের নামটি জুড়িয়া দিতে পারিলে ইতিহাসে 'অমর' হইতে পারা যাইবে! এখনও যে-সম্পর্কে আসিয়া সেকালের অনেক বিস্মৃতিযোগ্য নগণ্য ব্যক্তিই যেমন বাঁচিয়া যাইতেছেন, সেইরূপ একজন ব্যক্তি! তাঁহার কোন বন্ধুই তো এ বিষয়ে অচেতন ছিলেন না! বঙ্গদেশের রাজধানীর তদানীন্তন গণমান্য ব্যক্তিগণ—উকিল, আম্‌লা, ডাক্তার, ব্যারিষ্টার, জমিদার, রাজা-মহারাজা প্রভৃতি মধুসূদনের বন্ধু, গ্রাহক অথবা অনুগ্রাহক! এ ব্যক্তিটির মরণ নিশ্চিত জানিয়া, নিজের বাড়ীতে দুইটা দিন রাখিয়া, তাঁহাকে মরিবার জন্য সাড়ে তিনহাত জায়গা ও একটি উপাধান দিতে তাঁহাদের কত টাকা অপব্যয় হইত! মধুসূদনের সেই বাল্য-বন্ধু, ক্লাস-বন্ধু এবং ধর্ম-বন্ধু ডাক্তারটির কথা ধরিতেছি না—যিনি এরূপ অবস্থাতেও মধুসূদন হইতে একটিবারের

দর্শনীও কড়ায়-গণ্ডায় কোন দিকে ছাড়িতে পারেন নাই, মধুসূদন যেজন্য মর্মস্পৃক্ অভিযোগ জানাইতেন—তাঁহার নাম মুখে আনিব না। চিরবিস্মৃতির অন্ধকার শয়ন হইতে তাঁহার সম্ভ্রান্ত নামটিকে এবং দর্শনীপুষ্ট দেহপিণ্ডকে জাগাইয়া তুলিয়া আমরা 'ঐতিহাসিক অমরতা'-দানরূপ অবিচার করিতে চাই না। কিন্তু অন্যরূপেও তো চিকিৎসার চেহারা বজায় রাখিতে পারা যাইত। তবু, ঐ কথাটি সেকালের এত সমস্ত সহৃদয় ব্যক্তির মাথায় এবং হৃদয়ে ক্ষণকালের জন্যও যোগাইল না কেন? এ ঘটনার মধ্যে কি মধুসূদনের এবং বঙ্গসাহিত্যের নিয়তি-দেবতার অপরিহার্য ইচ্ছা এবং শক্তি দেখা যাইতেছে না! বঙ্গসাহিত্যের প্রমিথিয়সের ওইরূপ নিয়তি করিয়া, বঙ্গবাণীর এবং বঙ্গের বাণী-পুত্রগণের হৃদয়মধ্যে একটা চিরস্থায়ী এবং দুরুৎ-পাটনীয় স্মৃতিশেল আমূল নিখাত করা কি সেই ডাকিনীর ইচ্ছা ছিল না? যাহা নিশিদিন ধিকি ধিকি জ্বলিবে অথচ যাহার বিরুদ্ধে কোনরূপ চিকিৎসার হাত থাকিবে না! এখন আর আমরা চিরপূজ্য প্রিয় কবির চিরস্থায়ী স্মৃতি স্থাপন করিয়া বা প্রস্তরমূর্তি স্থাপন করিতে পারিয়াই বা কি করিব? উহাতে কি অদৃষ্টের পরিহাসটি দ্বিগুণ অরুন্তুদ হইয়া উঠিবে না? বাণী-মাতার সেই নিদারুণ পরিহাস কে এড়াইবে?—Madhu, "you wanted bread, but they gave you stones!"

যাহা হউক, কবি-সম্পর্কিত কোন সমকালীন ব্যক্তির উপর কোনরূপ ন্যূনতার অভিযোগ আনয়ন কিংবা সঙ্কেত করাও আমাদের উদ্দেশ্য নহে। আমরা দেখিতে চাই, মধুজীবনের অন্তরালের সেই প্রচণ্ড নিয়তিশক্তি! যাহা একদিকে নিদারুণ নির্দয়া হইয়াই মধুসূদনকে গড়িয়া তুলিয়াছে—মানুষটিতে আগুন ধরাইয়া দিয়া, তাহাকে চিরজীবন জ্বালাইয়া পোড়াইয়া বঙ্গসাহিত্যের আলোক-স্তম্ভরূপে স্থির করিয়া দিয়াছে! এই জ্বালাপোড়া না হইলে তো মধু বঙ্গসাহিত্যের প্রমিথিউস্ হইতে পারিতেন না—মধুর অনন্যসাধারণ মাহাত্ম্যও উজ্জ্বল হইতে পারিত না! আমরা মহামান্য ব্যারিষ্টার বা ধনাঢ্য

মধুসূদন দত্তকে পাইতাম—সে তো অগণ্য সংখ্যায় পাইয়াছি ও পাইতেছি—কিন্তু অমরকবি মধুকে পাইতাম না! ইহাই অপরিহার্যভাবে নির্দয়-নিদারুণ অথচ অপরিসীম অমৃতের নিয়তি! উহাতে এই কবির অমৃত-অংশকে কত উজ্জ্বল করিয়াছে! তাঁহার বন্ধুগণের একবাক্য সাক্ষ্য এই যে, এত অন্তর্দাহ, সংসারের এত জ্বালা-যন্ত্রণা সত্ত্বেও মধু "চিরকাল মধু ছিলেন", উহাতে তাঁহার মুখের সেই স্নিগ্ধ-মধুর হাসি—সেই চিরানন্দময় দীপ্তি অপহরণ করিতে তো পারেই নাই, পরন্তু চিরকাল তাঁহাকে বাণীপূজার মন্দিরেই জীবনের আনন্দকে অন্বেষণ করার জন্য উত্তেজিত রাখিয়াছে! মাদ্রাজ প্রবাসের সময়েও মধুসূদনের আর্থিক অবস্থা ভয়াবহ ছিল—উহাতেই কবিকে মাসিকে, সাপ্তাহিকে, কলম-পেশায় জীবিকা অন্বেষণ করিতে বাধ্য করিয়াছিল। মাদ্রাজ হইতেই মধুসূদনের প্রথম রচনা 'Captive Ladie' নামক ইংরাজী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। [প্রথম প্রকাশ—এপ্রিল, ১৮৪৯]। প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে উহা যেরূপ সাধুবাদের ঝটিকা লইয়া আসে তাহাতেই কবি বলিয়া উঠিয়াছিলেন, "Heigh Ho! my stars are brightening!" কিন্তু 'বাহবা' বহুত আসিল বটে, 'প্যালা' আসিল না! উহাতেই নিরাশ হইয়া কবি কিছু পরে বলিয়াছিলেন, "I had not thriven so ell win the world as I had expected." হায়! এই 'হায়'! ইহাই তো মধুজীবনের আদ্যন্তমধ্যের নিত্য-প্রকৃতি এবং সর্বত্র স্ফুট হাহাকার! কিন্তু এই হাহাকার যে বাঙ্গালীর উন্নতির জন্য অপরিহার্য ছিল! এত দুরবস্থাতে থাকিয়াও মধুসূদন ভিতরে-ভিতরে কি করিতেছিলেন, দেখুন! গৌরদাসের [নিকট কবির] পত্রে আছে, "তুমি কি মনে কর এখানে অযথা সময়ক্ষেপ করিতেছি? আমার জীবন এখন বিদ্যালয়ের বালক অপেক্ষাও অধিক কার্যে ব্যস্ত। আমার কার্য-প্রণালী এই—সকাল ৬টা হইতে ৮টা পর্যন্ত হীব্রু; ৮টা হইতে ১২টা পর্যন্ত স্কুলের কার্য; ১২টা হইতে ২টা পর্যন্ত গ্রীক; ২টা হইতে ৫টা পর্যন্ত তেলেগু এবং সংস্কৃত; ৫টা হইতে ৭টা পর্যন্ত ল্যাটিন; এবং ৭টার পর হইতে ১০টা পর্যন্ত ইংরাজী। ইহার পরও কি তুমি বলিবে যে, আমি আমার মাতৃভাষাকে

অলঙ্কৃত করিবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি না?" এই মাতৃভাষা! একজন দেশবহিষ্কৃত দরিদ্র স্কুল-মাষ্টার, যাহার অদ্যকার খাবারটাই জোটে না—সে হাজার মাইল দূরে বসিয়াও 'বঙ্গভাষার ও বাঙ্গালীর উন্নতিসাধনের' কথাই ভাবিতেছে! কোন্ মহা-ডাকিনী তাহাকে এই নিদারুণ আত্মহত্যায় ডাকিতেছে? ডাকিনী তো ক্ষণকালের জন্যও বলিতেছে না, "রেখে দাও তোমার 'মাতৃভাষা এবং স্বদেশের উন্নতি'! মনুষ্য-জীবন তো জলবিম্ব বই নহে, খাও-দাও—মজা কর!" কেবল কি এক অপরিণত-মস্তিষ্ক এবং স্বপ্নবিলাসী যুবক পুরুষের এই গোঁয়ার্তুমি। অনেক ঠেকিয়া-শিখিয়া এবং তখনো ক্ষুধার জ্বালায় মরিয়া-পুড়িয়াও এই মনুষ্যটি প্রৌঢ় এবং অভিজ্ঞতার বয়সে, বিদ্যাসাগরের নিকট জীবিকা ভিক্ষা করিতে করিতেই বা কি বলিতেছে দেখুন,—"আমার মাতৃভাষার উন্নতির জন্য আমি এখানেও [ফ্রান্সের ভার্সাই-এ] লাগিয়া আছি; বিদেশী-সাহিত্যের সমৃদ্ধি আমি মাতৃভাষার ভিতরে, আমার শিক্ষিত ভ্রাতৃগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে চাই; আমি এখানে আলস্যে দিন কাটাইতেছি না। ফরাসী ও ইতালীয় ভাষাকে আমি একরূপ মুষ্টির মধ্যেই আনিয়াছি—সম্প্রতি জার্মান ভাষাকে ধরিয়াছি! ইহার পর স্পেনের কিংবা পর্তুগালের সাহিত্য-প্রবেশে আর বাধা থাকিবে না।" এসকল কি কথা! একেবারে অ-সাংসারিক এবং পাগলের কথা নহে কি? নিজের পেটে নাই ভাত—বঙ্গদেশের জন্য কেন উহার এত মাথাব্যথা!

বলিতে চাই, এরূপ একজন পাগল না জন্মাইলে কোন দেশের কোন দিকেই প্রকৃত উন্নতি ঘটিতে পারে না। কোন দিকে কোনও সমাজে নূতন কিছু করিতে, দেশবাসীর মনকে কোন অজানা পথে ঘুরাইয়া দিতে, এরূপ গোঁয়ার্তুমি এবং পাগলামি না হইলে তো চলেই না! পরন্তু, তাহাকে পল্লীবাল-দলের শ্রীহস্ত হইতে ইটপাটকেল খাইয়াই রাস্তা চলিতে হইবে! যে সকল শক্তিশালী লোক, অন্য সহস্র দিকে যোগ্যতা সত্ত্বেও আলস্যে অথবা ভীরুতায় তাহা পারিল না, সুখ-সোয়াস্তিকেই বড় ধরিয়া অথবা সমকালীয় 'বুদ্ধিমান্' ব্যক্তিগণের করতালি এবং বাহবাকেই সার মানিয়া চলিয়া গেল, তাহারা "আজও গেল—কালও গেল"!

ক্ষমতাশালী মধুসূদন যে তাহা পারেন নাই, জীবনের সকল অস্থিরতার অভ্যন্তরে ঐ সুস্থির এবং ঐ অদম্য পাগলামির মধ্যে-ই তাঁহার প্রকৃত মাহাত্ম্য এবং অমরতার বীজ নিহিত আছে। অমৃতপাগল ভোলানাথের এইরূপ পাগল চেলা হইতে না পারিলে, কাহারও প্রতি সে-পাগলের দয়া হয় না! কেহ অমৃতপানের যোগ্য হইতে বা শিবলোকে স্থান লাভ করিতেও পারে না! মধুসূদনের মধ্যে যে প্রমথ-শক্তি ছিল, তাহার সমক্ষেই নতশির হইতে হয়!

'Visions of the Past' নামক কাব্যের ভূমিকায় উহার "সহস্র দোষত্রুটি" স্বীকারপূর্বক মধুসূদন বলিতেছেন, "এই কাব্য আমার জীবনের এমন অবস্থায় রচিত, অভাব ও দারিদ্র্যের এবং উহাদের অনুসরণকারী দুঃখকষ্টের এমন কদাকার এবং নিদারুণ সত্য-উৎপাতের মধ্যে রচিত যে, সে-অবস্থায় মানসিক শক্তি না থাকিলে কবিতার বিষয়বস্তুর দিকে চিত্ত স্থির করিতেই পারা যায় না। বাণীর প্রত্যাদেশ লাভ করা তো দূরের কথা!" 'ক্যাপ্‌টিভ লেডী'-কাব্যের উৎসর্গপত্রও এরূপ পরিশোচনায় পরিপূর্ণ। অথচ তাঁহার সকল কাব্য-কবিতা-নাটক জীবনের ঐরূপ অবিকল এবং অবিচ্ছেদী দুঃখ-অবস্থার মধ্যেই তো লিখিত হইয়াছে! মনকে দুরবস্থার নিষ্পেষণ এবং আঘাতের দিকে 'বজ্রাদপি কঠোর' করিয়া, উহাকে ভাব-জীবন এবং ভাবের গ্রাহকতার দিকে আবার 'কুসুমাদপি মৃদু' করিতে হইয়াছে! চিত্তস্থিরতার বিষয়ে অসাধারণ যোগশক্তি তাঁহার না থাকিলে ঐ সমস্ত কাব্যের জন্ম-ই হইতে পারিত না। যাহার উপরে প্রতিভা-ডাকিনীর 'ডাক' আসে, যেন তাহার সহতা শক্তি বুঝিয়াই আসে! তাহাকে তিনি দুঃখের-সমুদ্রজলে ডুবাইয়া, নিরাশার আগুনে পোড়াইয়া, জীবনের শতসহস্র সুপথে-অপথে ঘুরাইয়াই যেন 'অমৃতের অধিকারী' করিয়া লন! "তোমরা আমার জীবনী লিখিও, আমি বড় কবি হইব", "আমি কবিত্ব-শক্তিতে জগৎকে স্তম্ভিত করিব!" হিন্দু কলেজের নিম্নক্লাসের এক ছাত্রের মুখে এ সমস্ত উক্তি, বালকের শূন্যগর্ভ বাহ্বাস্ফোটরূপেই তাহার সঙ্গিগণের সমক্ষে প্রতীয়মান হইয়াছিল! উত্তরকালের ঘটনা-আলোকে দেখিতেছি, উহা তো আর কিছু নহে—ঐ মহাডাকিনীরই চীৎকার! ডাকিনী

বালককে 'পাইয়া বসিয়াছে'। সাংসারিক সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের ক্ষেত্রে সে ঐদিন হইতেই মৃত! তাহাকে পাগলের মত না ছুটিয়া আর উপায় নাই! জগতে কেহ তাহার সুখ-সোয়াস্তি-দাতা কিংবা রক্ষাকর্তাও নাই!

এই পর্যন্ত আমরা যাহা বলিয়া আসিলাম, তাহা বিশেষভাবেই 'কবি' মধুসূদনের সম্পর্কে—কবির অদৃষ্ট ও জন্মস্বত্ব, এবং তাঁহার জীবন-পরিবেশ ও শিক্ষার ভিত্তি বুঝিবার উদ্দেশ্যেই এ আলোচনা করা হইল। জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যন্ত কবির এই শিক্ষা! মনুষ্যের জীবনমাত্রেই একদিকে শিক্ষা অন্যদিকে পরীক্ষা—উভয় ব্যাপার সমানেই চলে! তবে কবির পক্ষে এই পরীক্ষা দুইবার হয়—সাহিত্যের ক্ষেত্রে আসিয়া কৃতকর্মতার হিসাব-পরীক্ষাতেও তাঁহাকে দাঁড়াইতে হয়! মধুসূদন জীবন-পরীক্ষায় আপাততঃ 'ফেল করিয়া' গিয়াছেন বলিয়াই সংসারের লোক মনে করিবে। জীবনীলেখকও 'রায় প্রকাশ' করিয়াছেন—মধুসূদন অসংযতচিত্ততার দরুণই সাংসারিক হিসাবে ফেল করিয়া গেলেন। মধুসূদন অপেক্ষা সহস্রগুণে অসংযতচিত্ত, এমন কি একেবারে জঘন্যচরিত্র শত শত লোক সমাজের শীর্ষস্থানে বসিয়া অর্থোপার্জনে, সাংসারিক সুখসুবিধা-সোয়াস্তিতে সম্মানে উত্তীর্ণ হইয়া যাইতেছেন! আর সমসাময়িক কালের শ্রেষ্ঠ পণ্ডিতব্যক্তির উদরান্নও জোটে নাই! সংসারের 'নীতিশাস্ত্রের' দিক হইতে যিনি যেমন-ইচ্ছা ইহার বিচার করুন, আমরা বলিতে চাই মানুষের দৃষ্টি কত দূরই বা চলে! যে যাহা-ইচ্ছা বলুক, আমরা প্রত্যক্ষ দেখিতেছি, মধুর জীবন-পরীক্ষার ফলটি সমগ্র বিশ্বের জীবন-দেবতা যিনি তিনিই যেন সংসারে সম্পূর্ণ বিভিন্নরূপে প্রকাশ এবং প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। যে ব্যক্তি ফলতঃ একেবারে 'অমরতা'রূপ পুরস্কার পাইয়াছে, বাঙ্গালীর হৃদয়রাজ্যে অনভিষিক্ত রাজত্বপদ পাইয়াছে, সে আমাদের এই আঠার-ইঞ্চি-হাত মাপের নীতিশাস্ত্রের বিচারাসন হইতে দ্বীপান্তর-দণ্ডেই দণ্ডিত। কে বলিবে, মানুষটির সমস্তটা হয়ত আমাদের মাপজোকের বেলায় ধরা দেয় নাই! আর, আমাদের এই বামন হস্তের গজকাঠি চালাইয়া সকল মনুষ্যের ধর্মদেহ মাপজোক করিতে কিংবা একেবারে দণ্ডবিধির বিচার ফয়সল করিতে নাই বা গেলাম! কে বলিবে,

হয়ত অধ্যাত্মক্ষেত্রে এমন একটা মাপকাঠি আছে যাহার সমক্ষে—"the last shall become the first, and the first shall become the last!" অন্ততঃ মধুসূদন ও শেলী-ভার্লেন-মার্লো-বায়রণ প্রভৃতি বহুসংখ্যক কবিগণের দৃষ্টান্তে তো উহার আভাস মিলিতেছে। প্রত্যক্ষের অন্তরালে, জীবন-অধ্যাত্মপুরীতে পরিব্যাপ্ত শমদম এবং গভীর অন্তর্যোগ ব্যতীত কি কোন মহাকাব্য রচিত হইতে পারে?

সাগরদাঁড়ির দত্ত-পরিবার একদিকে বঙ্গদেশের গৌরব এবং কৃতজ্ঞতার পাত্র হইয়া আছে। উহা অপরূপ অদৃষ্টক্ষেত্র হইয়া মধুসূদনের জীবাত্মাকে আকর্ষণ করিতে পারিয়াছিল, এবং বিকাশের উপযোগী শিক্ষা এবং উদ্দীপনা ঘটনা পূর্বক উহাকে বঙ্গদেশে প্রেরণ করিয়াছিল। উহা বঙ্গবাণীর নব-উদ্বোধনে, বাঙ্গালীর জাতীয়তা-যজ্ঞে এবং সাহিত্য-মহাপূজার উৎসবে এক নবতন্ত্রের পুরোহিত প্রদান করিতে পারিয়াছিল। এই পুরোহিত বঙ্গদেশে দাঁড়াইয়াই পৃথিবীর অধিবাসী হইয়াছে। কেবল 'পুরোহিত' বলিলে কথাটি হয়তো সকল দিকে ঠিক হয় না—মহাবলি! জাতীয় জীবন এবং সর্ব উন্নতির মাতৃকারূপিণী মহাবাণীর শাক্তমন্দিরে মধুসূদন-রূপী পুরোহিত আপনাকেই যথোপযুক্ত 'মহাবলি'রূপে উৎসর্গ করিয়া নবসঞ্জীবিত বঙ্গসাহিত্যের জন্য আদিম সুধাসিদ্ধি অর্জন করিয়া গিয়াছেন।

৪

প্রতিভা আগুন। যে তেজঃ বাহিরে—বিদাহক, বিস্ফোরক এবং আলোক, তাহাই অন্তর্দিকে জ্ঞান-চেতনা ও আনন্দের গতি এবং দীপ্তি। যে আগুন হইতে বিশ্বের সৃষ্টি, স্থিতি, সৌন্দর্য এবং ঐশ্বর্য, সে আগুন হইতেই আবার বিশ্বের ধ্বংস সমাপিত হইতে পারে। যেই দীপ্তি বিশ্বপ্রকাশক আলোকরূপে, জগৎ-প্রসবিতার বরেণ্য তেজোরূপে গায়ত্রীর লক্ষ্য, ধ্যেয়, এবং নমস্য হইয়াছে, উহাই আবার সবিতৃলোকে প্রতিমুহূর্তে মহাপ্রলয়শক্তিতে উত্তালতালভাবে আস্ফালিত

হইয়া কোটি কোটি যোজন লেহিয়া লইতেছে। যে পদার্থ মনীষারূপে মানুষের 'মনুষ্যত্বকে' গঠন এবং ধারণ করে, পরিবার, সমাজ ও জাতির মহাকল্যাণময়ী ধর্ম-নীতিরূপে প্রকাশ পায়, মহাপূজ্যা সে মুষীরূপে মানুষকে স্নেহ-প্রীতি-মমতা-তিতিক্ষা এবং আত্মোৎসর্গের পথে দেবত্বে এবং অমৃতত্বে তুলিয়া ধরে, তাহাই মনের স্থিতি-বন্ধনী প্রজ্ঞা এবং সংযমের ধৃতি হইতে বিদ্রোহী এবং বিচ্যুত হইয়া রিপুরূপে পরিণত হয়। দম্ভ, অহংকার ও স্বৈরাচার, হিংসা, দ্বেষ ও স্বার্থপরতা, যুদ্ধ-বিগ্রহ-অরাজকতা এবং ধ্বংসের দিকেই মনুষ্যকে লইয়া যায়। হয় বিশ্ববিজয়দর্পী আলেকজান্দার বা নেপোলিয়ন, না হয় সর্বত্যাগী যীশুখ্রীষ্ট এবং বুদ্ধ। হয় রত্নাকর না হয় বাল্মীকি। উভয়তঃ প্রতিভা—প্রতিভার আগুন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের ইংরাজী সাহিত্যে এইরূপ একটা আগুন লাগিয়াছিল। ফরাসী বিপ্লবের সর্বধ্বংসী হোমকুণ্ড হইতে প্রচণ্ডতার স্ফুলিঙ্গ এবং লেলিহান শিখা আসিয়া ইংলণ্ডের সাহিত্যে ধরিয়া গেল। ইংলণ্ডে একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরক পদার্থ ছিল, যাহার নাম বায়রণ! বায়রণে এই আগুন একদিকে ভাবুকতার মহাশক্তি এবং দীপ্তিরূপে, অন্যদিকে সমাজবিদ্রোহী এবং স্থিতিনীতিদ্বেষী অহংকারের মহামারী-রূপেই প্রকট হইয়াছিল। একই ক্ষেত্রে জড়তা এবং আত্মতামুখী মহাশক্তির এইরূপ যুগপৎ লীলা ইতিহাসে কচিৎ দেখা গিয়াছে। সহৃদয়তা এবং অশিষ্টতার এইরূপ সম্মিলন, এত বড় মহত্ত্বের সঙ্গে সঙ্গে এতদূর অনাচার! প্রতিভার ডাকিনীশক্তির জ্বলন্ত অগ্নিমূর্তি। উহা যেমন সাহিত্যরাজ্যে—মনুষ্যের ভাবুকতারাজ্যে বায়রণকে মহাশক্তির প্রিয়পুত্ররূপে উন্নমিত করিয়াছে, তেমন জীবনক্ষেত্রে তাঁহাকে একরূপ আত্মহত্যাতেই লইয়া গিয়াছে। বায়রণ নামক মনুষ্যটি যেন আপনার বলবতী বাসনা এবং বিদ্রোহ-বহ্নির নিদারুণ উৎপাতে একেবারে ছিন্নমস্তার ন্যায় আত্মহত্যা করিয়া আত্মরক্তই পান করিয়াছে।

বায়রণী-আগুন দেখিতে দেখিতে সমগ্র ইয়োরোপে এবং ইয়োরোপ-সম্পর্কিত সাহিত্যমাত্রের মধ্যেই ছড়াইয়া পড়ে। যে জাতির মধ্যেই প্রতিভার বিস্ফোরক

পদার্থ তাহা আভাসমাত্রই বায়রণী-আগুনে ধক্ ধক্ করিয়া জ্বলিয়া উঠে। সকল ইউরোপীয় জাতির সাহিত্যমধ্যে এই আগুনের গতি এবং বিস্তৃতির ইতিহাস একে একে অনুসরণ করা যায়। সকলের মধ্যেই আগুন যেমন একদিকে নবজীবনের উত্তেজনা এবং রুদ্রতা জাগাইয়া তোলে, তেমন অন্যদিকে অভাবনীয় মত্ততাও আনয়ন করে।

সাহিত্যের ক্ষেত্রে এই আগুনের প্রধান লক্ষণ ছিল, ভাবোন্মত্ততা, অহমিকা, অহংমুখতা, দম্ভ, আত্মপ্রতিষ্ঠা এবং আসুরিক প্রচণ্ডতা। সুতরাং প্রতিভামাত্রের মূলতত্ত্বে যে গতি, দীপ্তি এবং বিস্ফারিণী-শক্তি থাকে, উহা কত সহজে, পূর্বপ্রসিদ্ধি এবং দৃষ্টান্ত উত্তেজনার সামান্য ইশারাতেই বায়রণী-আগুনে জ্বলিয়া উঠিতে পারে! বঙ্গদেশের প্রতিভাশিশু মধুসূদনকেও অতিপ্রবল সমধর্ম এবং সহানুভূতি-সূত্রে এই আগুন ধরিয়া গিয়াছিল; এবং তাঁহার পর আরো সহজতর নৈকট্যসূত্রেই নবীনচন্দ্রে এবং কিশোরবয়স্ক রবীন্দ্রনাথের মধ্যেও উহা কোন কোন দিকে সংক্রামিত হইতে পারিয়াছে।

এই বাঙ্গালী-শিশুর গ্রাহিকাশক্তি, গ্রাস করিবার এবং হজম করিবার শক্তিও অসাধারণ ছিল। এই শিশু অতি সহজে ইংরাজী ভাষাকে গিলিয়া বসিল। ভাষার মূলশক্তি ধ্বনি এবং অর্থকে এমনভাবে আপনার করিয়া বসিল যে, উভয়কে লইয়া অবলীলাক্রমে 'দাণ্ডাগুলি' খেলিতে লাগিল। মধুর হিন্দু কলেজের ছাত্র-জীবন ইংরাজী সাহিত্যের প্রসারিত ময়দানে এইরূপ প্রতিভাশিশুর দাণ্ডাগুলি খেলাতেই অতিবাহিত। কিন্তু এ খেলাতেই তো বালকের অস্থি-মজ্জা-মাংসপেশী দৃঢ়তানিষ্ঠ এবং বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছিল; ইংরাজী সাহিত্যের মুক্ত বায়ুতে তাহার ফুসফুস এবং হৃৎপিণ্ড ভবিষ্যৎ পালোয়ানের উপযোগী ক্রিয়াশক্তি এবং প্রসার লাভ করিতেছিল। সহতীর্থ অপর দশ বালকের সঙ্গে মিলিয়ামিশিয়া চলাফেরা করিতে থাকিলেও তাহার নিজের অকালপক্ক অস্মিতা সময় সময় প্রচণ্ড চীৎকারে আত্ম-প্রকাশ করিতেছিল। ভবিষ্যৎ কবির এ সমস্ত খেলার সংবাদ বিস্তারিতভাবে উদ্ধৃত করার জন্য এ প্রসঙ্গে স্থান নাই; কিন্তু একটি দৃষ্টান্ত না তুলিয়া পারি না।

উহাতেই বুঝা যাইবে, বায়রণী-মাদকতা বালককে কি পরিমাণে পাইয়া বসে। উহাতে আরও দেখা যাইবে, এ একটি অসুর বালক। তাহার দম্ভও একেবারে শূন্যগর্ভ নহে; তাহার মধ্যে প্রকাণ্ডতার ধারণাশক্তি এবং প্রকাশের শক্তিও অসাধারণ মাত্রাতেই আসিয়া গিয়াছে। সে নিজকে—যেমন মহাকায় এবং 'অসুর-বলেই বলী' অনুভব করিতেছে, চারিদিকের অপর সকলকেও তেমনি 'বামন' বলিয়াই একটা সুস্থির ধারণা যেন তাহার মধ্যে জন্মিয়া আছে। মধুসূদনের এ বয়সের একটি কবিতা "শনিগ্রহে এক সন্ধ্যা" পাঠ করুন। উহার ভূমিকাটিও বিস্ময়জনক। বালকটির কত দম্ভ—কি বিজাতীয় অহংকার!

অহংকারী বালক রবীন্দ্রনাথ

'অনন্ত এ আকাশের কোলে
টলমল মেঘের মাঝার'

তাঁহার 'কবিতার ঘর' বাঁধিয়াছিলেন; কিন্তু মধুসূদন একেবারে শনিগ্রহে! "আমি জগৎকে একটা নতুন-কিছু শিখাইতে চাই—দেখ আমি অমিত্রচ্ছন্দেই এক 'সনেট' আমদানী করিলাম। উহার দৃশ্য শনিগ্রহে; কেননা, পার্থিব পদার্থ-মাত্রকেই আমি ঘৃণা করি। এই সনেট dedicated to a pigmy"—ইহা কবিতাটির খেলাচ্ছলে লিখিত ভূমিকা। বালক শনিগ্রহে বসিয়া এক সন্ধ্যায় এককালে ছয়টি চন্দ্র-উদয়ের নিসর্গদৃশ্য উপভোগ করিতেছে। তাহার এই অপূর্ব খেলার 'গুটিকা'ও সময় সময় সুদূর ইংলণ্ডের মাসিক পত্রিকার প্রকোষ্ঠে পর্যন্ত ছুটিয়া যাইতেছে। একটি তো একেবারে রাজকবি ওয়ার্ডসোয়ার্থের পদতল পর্যন্ত ছুঁইয়া পড়িল। ধানুকী অর্জুন নাকি সায়করূপেই তাঁহার গুরু দ্রোণাচার্যের পদতলে প্রণাম নিবেদনপূর্বক আত্মপরিচয় করিয়াছিলেন; এই ভক্ত বীরবালকও ইংলণ্ডের কবিসিংহাসনতলে প্রণতিশর নিক্ষেপ করিয়াই আত্মপরিচয় করিতে চাহিয়াছে।

এই খেলা! এইরূপে ইংরেজীভাষায় কবিতা লিখিয়া বিশ্ব-পরিদৃশ্য হইবার

দুরাশা মধুস্থদনের ৩২ বৎসর বয়ঃক্রম পর্যন্তই ন্যূনাধিক চলিয়াছিল। "বাঙ্গলা ভাষা ভুলিয়া যাওয়াই ভাল" হিন্দু কলেজে পড়ার সময় যে বালক এই কথা বলিয়া সঙ্গিগণকে ক্ষেপাইত, সে যুবক হইয়াও ১৮৫৭ খ্রীঃ পর্যন্ত ঐ কথাই বলিয়াছে; কাজেও দেখাইয়াছে। মাদ্রাজের ৮ বৎসরব্যাপী প্রবাসে তাহার মাতৃভাষার মুষ্টিটাই শিথিল হইয়া গিয়াছিল। "I am fast losing my Bengali"— এ সময়েরই অনুশোচনা। পিতার নিকট মাতৃভাষায় চিঠি লিখিতে নিজকে অসমর্থ বুঝিয়া বন্ধুকে মধ্যবর্তী হইবার জন্য অনুরোধ!

মাদ্রাজে থাকিতেই যুগপৎ Visions of the past এবং Captive Ladie প্রকাশপূর্বক একেবারে ইংরেজী সাহিত্যের কবিত্বদুর্গ আক্রমণ করা গেল। উহাতে প্রতিপত্তি যথেষ্ট হইল সত্য; এথিনীয়ম পত্রে প্রশংসাও বাহির হইল— "এ গ্রন্থে এমন অনেক স্থান আছে যাহা বায়রণ অথবা স্কট নিজের বলিয়া স্বীকার করিতে লজ্জিত হইতেন না।" প্রশংসার একবর্ণও অতিরঞ্জিত নহে; কিন্তু তথাপি! বৈমাত্র ভাষায় কাব্য লিখিয়া—যে-ভাষায় চসার হইতে আরম্ভ করিয়া ন্যূনাধিক বিংশতিসংখ্যক শক্তিশালী কবি বাণীপূজা করিয়াছেন সেই ভাষায়,— ভারতবাসীর পক্ষে সুস্থির কবি-যশের অর্জন! মধুস্থদন ক্রমে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিলেন। এ সময়ে বঙ্গসাহিত্য-হিতৈষী বেথুন সাহেবের সেই সাধুবাদপূর্ণ অথচ সৎপরামর্শে সমুজ্জল পত্রখানিতে অনেক কাজ হইল। বেথুনের পত্রটি বিদেশী ভাষায় "কবি-যশঃপ্রার্থী" লেখকমাত্রের সমক্ষে মন্ত্র-পটরূপে দেদীপ্যমান থাকা উচিত। উহার সারমর্ম এই যে, "এ ক্ষেত্রে খুব শক্তিশালী ব্যক্তির রচনা হইলেও উহা বিদেশীর চক্ষে কেবল একটা 'কৌতূহলের পদার্থ'-রূপেই আদর লাভ করিতে পারে; বিদেশী লেখকের পক্ষে ভিন্নজাতির হৃদয় দখল করা একেবারেই অসম্ভব। ঐ শক্তি স্বদেশের সাহিত্য-ক্ষেত্রে নিয়োজিত হইলেই বরং যোগ্য পুরস্কার প্রাপ্ত হওয়া যায়।"

ক্রমে মধুস্থদনের চোখ ফুটিল। কবির পক্ষে এই পথে 'চোখফোটা'-রূপ ব্যাপারটি অনেক সময় খুব বেদনাদায়ক সন্দেহ নাই; উহা নূতন জন্মগ্রহণের মতই

আতিকর এবং গ্লানিকর। কিন্তু মধুসূদন উহা সহিয়া লইলেন। ইংরাজীতে কবি হওয়ার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া অজ্ঞাত-ভবিষ্যতে মাতৃভাষার সেবাকে লক্ষ্য করিয়াই যেন চিত্তনৌকা বোঝাই করিতে লাগিলেন। তাঁহার সে সময়ের দৈনিক কার্যক্রমটিই আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করিয়াছি। ইংরাজীভাষার মুক্তবায়ুতে এই যে ব্যায়াম, এই যে উদ্যোগপর্বের গুপ্তসাধনা, উহাতে তাঁহার মনে যে সবলতা এবং হৃদয়ে যে পূর্ণতা আনিল, বাক্যশক্তিতে যে সামর্থ্য আসিল, ভাবুকতায় যে পাক ধরিল তাহাই একদিন যেন হঠাৎ বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে মহীরাবণের ন্যায় ভূমিষ্ঠ হইয়া সকলের 'তাক লাগাইয়া' দিয়াছে। বিদেশীক্ষেত্রের রসপানে বর্ধিততনু এই মহাবৃক্ষ বঙ্গদেশের দিকে ঝুঁকিয়াই সমস্ত ফলসম্ভার ঢালিয়া দিয়াছে।

মধুসূদনের জীবনে একটা বড় ঘটনা—বঙ্গসাহিত্যের পক্ষেই একটা ফলিতার্থ-ময় ঘটনা, তাঁহার পরম দয়াবান্ পিতার মৃত্যু—পৈতৃক ধর্মভ্রষ্ট মধুসূদনকে 'পরিত্যক্ত সন্তান' না করিয়াই মৃত্যু। তাঁহাকে মধুসূদনের শত্রুগণ উইল করিতে পীড়াপীড়ি করিলে তিনি [রাজনারায়ণ, মধুসূদনের পিতা] নাকি বলিয়াছিলেন, "যাহার জিনিষ সে আসিয়া বুঝিয়া লউক।" অনন্তক্ষমাশীল পিতৃহৃদয়ের এই ক্ষুদ্র কথাটির মধ্যেই যেমন বঙ্গ-সরস্বতীর তেমন মধুসূদনের অদৃষ্টদেবীর শুভঙ্করী ইচ্ছাই প্রচ্ছন্ন ছিল। উহাতেই দেশত্যাগী মধুসূদনকে পৈতৃক বিষয় বুঝিয়া লইবার জন্য মাতৃভূমিতে টানিয়াছে; বাকীটুকুনও অদৃষ্টদেবতা অভাবনীয় ভাবেই ঘটাইয়াছেন।

মনুষ্যের জীবন কতকগুলি ঘটনার সূত্রবন্ধন বই নহে, প্রত্যেক ঘটনারই অর্থ আছে—কোথাও বা এই অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে, কোথাও বা ঢাকা থাকিয়া যায়। জীবনের সকল ঘটনাই পরিস্ফুট অর্থবত্তা লাভ করে এমন জীবন অত্যন্ত কম। মধুজীবনের একটি সার্থক ঘটনা পূর্বোক্তরূপে পিতার মৃত্যু ও তাঁহার স্বদেশে আগমন। তেমন, আর একটি ঘটনা, কলিকাতায় 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' স্থাপন ও তাঁহার বন্ধু গৌরদাসের সহিত উহার সম্বন্ধ। এ সমস্ত ঘটনার সূত্রবন্ধন সমাধা করিয়াই মধুর অদৃষ্টদেবতা তাঁহার জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছেন।

ভারতে 'জাতীয় থিয়েটার' বলিয়া একটি প্রতিষ্ঠান প্রাচীনতম কাল হইতেই ছিল ; এবং উহার পরিচালনভার 'নট' বলিয়া একটি স্বতন্ত্র ব্যবসায়ী জাতির উপরেই ন্যস্ত ছিল। মুসলমানধর্ম নাট্যামোদের বিরোধী ; এই কারণে আরবদেশে কিংবা পারস্যে নাটক বলিয়া কোন সাহিত্যের সৃষ্টি ও পরিপুষ্টি হইতে পারে নাই। অধিকন্তু, হিন্দুজাতির মধ্যে যে নাট্য আবহমানকাল হইতে বর্তমান ছিল তাহাও সহায়তার অভাবেই ম্রিয়মাণ হইয়া যায়। ইংরেজের আমল হইতেই এদেশে নাটক এবং অভিনয় পুনর্বার উজ্জীবিত হইয়াছে। বঙ্গে প্রথম নাট্যশালা ইতিহাসপ্রসিদ্ধ "সাঁসোচী থিয়েটার"—ইংরেজরাই স্থাপন করেন। উহার দৃষ্টান্তে উৎসাহিত হইয়া বাঙ্গালীদের মধ্যেও স্কুলকলেজে অথবা ধনিগণের বাটীতে অভিনয়-আমোদের দিকে একটা ঝোঁক প্রকাশ পাইতে থাকে। বাঙ্গালীর নাট্যশালার এই নবজীবন ও পরিপুষ্টির ইতিহাস কৌতূহলী পাঠকগণ অন্যত্র পাইতে পারেন। বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই মাত্র চিন্তা করা আবশ্যক যে, মধুসূদনের অবতরণিকার পূর্বে বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত 'নাটক' বলিয়া কোন পদার্থ ছিল না ; এবং 'থিয়েটার' বলিয়া একটা প্রতিষ্ঠানও ১৮৫৭ সালের পূর্বে বঙ্গসমাজে দানা বাঁধিতে কিংবা দাঁড়াইতে পারে নাই। তৎপূর্বে যাত্রা, হাফআখড়াই প্রভৃতি অভিনয়-সংশ্লিষ্ট এবং সঙ্গীতপ্রধান 'অপেরা'র ন্যায় ব্যাপারই চলিতেছিল। ঐ অব্দে রাজা ঈশ্বরচন্দ্র ও প্রতাপচন্দ্র সিংহ এবং মহারাজ যতীন্দ্র-মোহন ঠাকুর প্রভৃতির চেষ্টাযত্নেই 'বেলগাছিয়া থিয়েটার' স্থাপিত হয় ; এবং উহাতে সর্বপ্রথমে 'রত্নাবলী' নাটকের বাঙলা অনুবাদই অভিনীত হইয়াছিল। উক্ত অভিনয়ঘটনার সহিতই আমাদের সম্পর্ক। বিদেশী শ্রোতৃবর্গের বোধসাহায্যে 'রত্নাবলী'র ইংরাজী অনুবাদ করার জন্য মধুসূদনের ডাক পড়িল। গৌরদাসের পরিচয়সূত্রেই পুলিশ কোর্টের সামান্য আমলা মধুসূদন দত্ত উক্ত অনুবাদ করার ভার পাইয়াছিলেন ; অনুবাদকর্মে হাতসাফাই দেখাইয়া ঐ সমস্ত 'রাজারাজড়া'র দৃষ্টি এবং শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াই কবি প্রথমতঃ জীবনের কর্মক্ষেত্রে দাঁড়াইতে পারিয়াছিলেন !

সামান্য ঘটনা হইতেই মধুজীবনের প্রকৃত কর্মসূত্রের আরম্ভ; বঙ্গীয় নাটক এবং বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিরও সূত্রপাত।

অনুবাদ করিতে গিয়াই "কবি মধুসূদনের" সুপ্ত চৈতন্য জাগরণ লাভ করিল। যিনি ইতিপূর্বে বঙ্গভাষায় একটি পংক্তিও রচনা করেন নাই, এবং ইংরাজীতেও কদাপি নাট্যপ্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রবেশ করেন নাই, তাঁহার মর্মসুপ্ত এবং সহজাত সাহিত্যবুদ্ধিই রামনারায়ণ তর্করত্নের 'রত্নাবলী'র প্রতিবাদে বিদ্রোহী হইয়া অবজ্ঞাভরে ডাকিয়া উঠিতে লাগিল—"ইহা কিছুই তো হয় নাই! এই সামান্য পদার্থের অভিনয়ের জন্য রাজারা এত অর্থব্যয় করিতেছেন!" তখনো নাট্যকলার ক্ষেত্রে কিংবা বঙ্গভাষার ক্ষেত্রেও এক পংক্তি লিখিয়া যে-কবি নিজের হাত দেখাইতে অথবা শক্তি পরীক্ষা করিতে পারে নাই, তাহারই এ প্রকার অসন্তুষ্টি! পাঠক, এক্ষেত্রে প্রত্যেক প্রতিভাশালী কবি বা সাহিত্যসেবীর সাধারণ মর্মতত্ত্ব লক্ষ্য করিতে পারিবেন—ইহা প্রতিভার আজন্মনিদ্রিতা রাজকন্যার জাগরণ! মধুসূদনের অন্তর্দেবতা সহজাত-জ্ঞানে অতর্কিতেই ডাকিয়া উঠিল "এ তো কিছুই হয় নাই—আমি ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল করিতে পারি।" এইরূপ স্বভাব-সুপ্ত বিবেক-বুদ্ধিই যেমন নিজের তেমন অন্যেরও অজানা ক্ষেত্রে—নব-আবিষ্কারের অপূর্ব এবং অচিন্তনীয় গতি-পথে কবিগণকে পরিচালিত করে। ফল-চয়নের পূর্বেই এরূপ ভবিষ্য-অনুভূতি এবং অগ্রগামিনী প্রজ্ঞা! উহা না থাকিলে মানুষ কখনও 'বড় কবি' হইতে পারে না। এস্থলেই প্রতিভা-পরিচয়!

কৃতিত্ব-ফল প্রদর্শনের পূর্বেই বলিয়া ফেলা "আমি ইহা অপেক্ষা অনেক ভাল করিতে পারি"—উহাতে মনুষ্যের উপহাস উদ্রেক না করিয়া পারে না। মধুসূদনের অন্তরঙ্গ বন্ধুটিও তাঁহার ঐ সাহসিকতায় হাস্যসম্বরণ করিতে পারেন নাই। "আচ্ছা দেখা যাবে" এই বলিয়া মধু কি করিলেন? গৌরদাস বলিতেছেন, "কথোপকথনের পরদিনই মধু এসিয়াটিক সোসাইটীর পুস্তকালয় হইতে কতকগুলি চলিতবাঙ্গলা পুস্তক ও সংস্কৃত নাটক সংগ্রহ করিয়া আনিলেন এবং মনেপ্রাণে ঐ সমস্ত পাঠ করিতে লাগিলেন।" বাঙ্গলা পুস্তক—কেন না, বাঙ্গলা ভাষাটি তো নূতন

করিয়া শিখিয়া লইতে হইবে। সংস্কৃত নাটক—কেন না, এই ভারতবর্ষে পূর্বে যে নাট্যকলা স্ফূর্তি লাভ করিয়াছিল, যে-প্রকৃতির অভিনয় প্রচলিত ছিল, তাহার জ্ঞান লাভ করিয়া এবং ভারতবর্ষের পুরাতন অন্তরাত্মার সহিত পরিচয় করিয়াই তো আধুনিক কালের নূতন গতি স্থির করিতে হইবে। যুগপৎ একহস্তে শিক্ষাগ্রহণ, অন্য হস্তে পরীক্ষাদান। আপনার অন্তশ্চৈতন্যের শক্তিতে অভাবনীয় আস্থা এবং উহার অচিন্তনীয় প্রেরণা না থাকিলেও কি কোন মানুষ মধুসূদনের অবস্থায় একরূপ 'বাজী রাখিয়া'ই কাজ করিতে বসে। কয়েকদিনের মধ্যেই বাঙ্গলার প্রথম নাটক, এবং মধুকবির প্রথম বাঙ্গলা রচনা 'শর্মিষ্ঠা'র সৃষ্টি হইয়া গেল।

ইহার পূর্বে বাঙ্গলা ভাষায় এবং বাঙ্গলা সাহিত্যে কি ছিল, তাহার সম্যক্ বোধ না হইলে মধুসূদনের শক্তি-পরিচয় সম্পূর্ণ হইবে না। বর্তমান প্রসঙ্গে উহা পুরাপুরি দেখাইতে আমরা অপারক; বিশেষতঃ, ঐ জ্ঞানটি বঙ্গসাহিত্যের প্রত্যেক জ্ঞানার্থী এবং প্রকৃত কৌতূহলী ব্যক্তিকেই নিজের পক্ষে স্বতন্ত্রভাবে উপার্জন করিতে হয়। এক্ষেত্রে সাহিত্যসেবীর পক্ষে স্বাধীন অনুধাবন এবং নিজের দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ ব্যাপারটিই সর্বাপেক্ষা অধিক ফলপ্রদ এবং উপকারী। আমরা কেবল এইমাত্র সঙ্কেত করিতে পারি যে, মধুসূদনের পূর্বে বাঙ্গলায় গীতিকবিতা এবং ছন্দসাহিত্য কোন কোন দিকে পরম উন্নতি লাভ করিয়াছিল। বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস ও গোবিন্দদাস প্রভৃতি বৈষ্ণব কবিগণের মধ্যে প্রেমের সুগভীর ধারণা প্রকটিত ছিল। এই প্রেম মনুষ্যচরিত্রে আসিয়া দিব্যানুরাগী ভাবুকতায় এবং দিব্যোন্মাদে পরিমূর্ত হইলে মনুষ্যের হৃদয় হইতে যে শ্রদ্ধা-ভক্তির উচ্ছ্বাস এবং আনন্দধারা প্রবাহিত হয় তাহার অকৃত্রিম প্রমাণ চৈতন্যমঙ্গল, চৈতন্য-ভাগবৎ প্রভৃতি 'চরিত-লেখক' কবিগণের মধ্যে ছিল; দেশের প্রাত্যহিক জীবনের দিকে সৌন্দর্য-দৃষ্টি এবং সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখিতে জানিলে কবির হৃদয়ে অপরূপভাবে যে আনন্দ-উচ্ছ্বাস ছুটে উহাকে দেশীয় বীণাতন্ত্রের ঝঙ্কৃতরাগিণীতেই পরিমূর্ত করিয়া কবিকঙ্কণ ছিলেন। স্ত্রী-পুরুষের মিলনকে সারঙ্গীর সুরে অতুলনীয় ধ্বনিশিল্পে পরিস্ফুট করিয়া কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগের রাজকবি ভারতচন্দ্রও ছিলেন। আর,

শাণিত তীক্ষ্ণ বাক্যের ছুরিতে সমস্ত 'ভালমন্দ'কে টুক্‌রা-টুক্‌রা করিয়া কর্মব্যস্ত জননিবহের জন্য মুখরোচক চাট্‌নী দিয়াছিলেন 'ইংরেজাধিকৃত এবং বিজাতীয় সভ্যতায় আক্রান্ত' বাঙ্গালীর রক্ষা-বুদ্ধির মূর্তিমান্ 'কবিওয়ালা' ঈশ্বর গুপ্ত। ইহাদের মধ্যে কেবল শেষোক্ত তিনজন ব্যতীত অপর কাহারও সহিত মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় থাকার সবিশেষ প্রমাণ পাইতেছি না। কবির বৈষ্ণবধর্মী রচনার মধ্যেও প্রকৃত বৈষ্ণবী-ভাবুকতার বিশেষ পরিচয় কোনদিকে উল্বন হইতেছে না। কবি বিশ্বসাহিত্যের সৌন্দর্যকুসুমের লুব্ধ মধুকর ছিলেন; 'চতুর্দশপদী'র মৌচাক মধ্যে নিজের মধুমত্ততার প্রমাণ এবং গুণগুঞ্জনও রাখিয়া গিয়াছেন। উহাতে বাঙ্গালার কবি জয়দেবের গুণকীর্তন আছে, কিন্তু চণ্ডীদাস-বিদ্যাপতির নামমাত্রও মিলিতেছে না। তবে, মধুসূদনের প্রকৃত পরিচয় ছিল প্রাচীন বঙ্গের দুইজন মহাপুরুষের সঙ্গে—কৃত্তিবাস ও কাশীদাস। ভারতবর্ষের অতীত যুগযুগান্ত হইতে প্রত্যাগত আর্যকর্ষণার গঙ্গাধারা বঙ্গের ঘরে ঘরে বিলাইয়া দিয়াছে সেই রামায়ণ ও মহাভারত। এদেশের প্রাচীন সাহিত্যের অপর সমস্তই যেন বীণাতন্ত্রী-সাধ্য কালোয়াতী-সুর, কেবল এ দুইটি গ্রন্থের অন্তরাত্মার মধ্যেই পুরাতনী আর্যপ্রতিভার সমুদ্রকল্লোল ধৃত আছে। বঙ্গের সাধারণ জনমন অতর্কিতে এই সমুদ্র পরিচয় এবং সমুদ্রের বাতাসেই স্বাস্থ্যসিদ্ধি করিয়া চলিতেছে। মধুসূদনের হৃদয় শিশুকাল হইতেই একরূপ অতর্কিতে,—'কেমন যেন ভাল লাগার' ভাবেই, এই ভারত-সমুদ্র বায়ুর সমস্ত সুফলের দায়ভাগী হইয়া আসিতেছিল। এখন কর্মক্ষেত্রে, উহা হইতেই তাঁহার কবিজীবনের প্রধান লভ্য উদ্বর্তিত হইয়া আসিল।

গদ্যের ক্ষেত্রে, বঙ্গসাহিত্যে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে লেখ্য এবং ব্যবহারিক গদ্য চলিয়া আসিলেও ঊনবিংশ শতাব্দীর নূতন বর্ষারম্ভে, ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের প্রতিষ্ঠা হইতেই 'কৃষ্ণচন্দ্র রচিত,' 'প্রবোধ রত্নাকর,' 'তোতার কাহিনী' প্রভৃতির পণ্ডিতি গদ্যই শিক্ষণীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। তদ্ভিন্ন একদিকে 'আলালের ঘরের দুলাল' ও 'হুতোম প্যাঁচার নকসা,' অন্যদিকে রাজেন্দ্রলালের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' বিদ্যাসাগরের 'শকুন্তলা' এবং কালীপ্রসন্ন সিংহ কৃত 'মহাভারতের আদিপর্ব'

গদ্যের ক্ষেত্রে মধুস্থদনের পথপ্রদর্শন করিতেছিল। আর নাটকের ক্ষেত্রে ছিল পূর্বকথিত সেই প্রাচীন আদর্শের 'রত্নাবলী' ও 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'। এই সমস্ত পূর্বভিত্তির সমতল হইতেই বঙ্গীয় নাট্য-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থ 'শর্মিষ্ঠা' মাথা তুলিয়া দাঁড়াইল।

প্রথম কলম ধরিতেই কবির অন্তর্দৃষ্টি দেখিল—হিমালয় পর্বত। শিখরের উপর শিখরসংঘ উচ্চাভিলাষী হইয়া ঊর্ধ্বলোকে মাথা তুলিয়াছে—তাহার উপরে ইন্দ্রপুরী—অমরাবতী! বঙ্গ সাহিত্যে প্রথম কলম ধরিতেই, মনোদৃষ্টি খুলিতেই কবির এই প্রথম দেখা এবং প্রথম কথা! বিলকুল স্থিরতার এবং সমতলতার মধ্য হইতে ঐ ঊর্ধ্বে উৎপতনশীল প্রচণ্ডতার ছবিই কবির সহানুভূতি আকর্ষণ করিল। এইরূপে মানুষটি কি বঙ্গের সাহিত্য-সমতল হইতে নিজের উচ্ছ্রিতশির কবি-আত্মার এবং কবি-প্রতিভার মূর্তিটাই দেখিয়াছিল?

শর্মিষ্ঠার অঙ্কের পর অঙ্ক দেখিতে দেখিতে মূর্তিলাভ করিতেছিল। 'মাইকেল সাহেব' বাঙ্গলায় নাটক লিখিতেছে! শত্রুর টিটকারী ও বন্ধুবর্গের দুশ্চিন্তা এবং কৌতূহল যুগপৎ অসহ্য হইয়া উঠিল। বন্ধুগণ মধুর কার্য পরিদর্শনের জন্য, প্রকৃত প্রস্তাবে রচনাকার্যে তাঁহার জ্যেষ্ঠ সহযোগী হইবার জন্যই 'কুলীন কুল সর্বস্ব'-এর রচয়িতা রামনারায়ণ পণ্ডিত—ওরফে "নাটুকে নারাণ"-কে নিযুক্ত করিলেন। মধুস্থদন প্রথমতঃ সম্মত হইলেন—"আচ্ছা তাই হোক, উনি আমার ব্যাকরণ ভুল হইতেছে কিনা দেখিয়া দিবেন।" ব্যাকরণ ভুল অর্থাৎ কিনা, বাঙ্গালীর ভাষা এবং বাঙ্গালীর সাহিত্যে মহর্ষি পাণিনির উদ্বেগজনক ভুল! মধুস্থদন ভাবিলেন যখন বঙ্গভাষার অর্ধাংশই আর্য শব্দ, তখন ঐরূপ কোন ভুল পরিহার করিতে চেষ্টা করাই উচিত। কিন্তু অব্যবহিত পরেই মধুস্থদনের সকল ভুল একেবারে ভাঙ্গিয়া গেল। পণ্ডিত যে তাঁহার প্রত্যেক কথাই একেবারে ঋষিসম্মত 'কর্তা-কর্মক্রিয়া'র শুচিনির্মল বিধিনিয়মের পবিত্র গোময়ে লিপ্ত করিয়া কাঠির ন্যায় সোজা করিতে চায়! মধুস্থদনের পত্রে প্রকাশ, তাঁহার প্রিয় 'দৈত্যরাজবালা'কে একেবারে নিরপেক্ষ-নিদারুণ এবং অলঙ্কার-বিশুদ্ধ গদ্য-উক্তি না করাইয়া 'নাটুকে নারাণ'

কোন মতেই ছাড়েন না। বাক্যকে উহার সমস্ত 'কোণ কাণ' ছাঁটিয়া একেবারে সোজ করিতে না পারিলে নাকি 'সামাজিকগণের বোধ-সৌকর্য' হইবে না! 'দুত্তোর' বলিয়া মধুস্থদন প্রবীণ সহযোগীকে বিদায় করিলেন। বলিতে হইবে, এ দুষ্কার্যের ফলেই হয়তো মধুস্থদনের এবং তাঁহার পরবর্তী সকল বঙ্গকবির কাব্য কবিতা মাত্রেই নিদারুণ 'চ্যুতসংস্কৃতি,' 'নিহতার্থতা,' 'বিধেয়াবিমর্ষ' প্রভৃতি জবরদস্ত দোষসমূহে চিরকালের জন্যই দুষ্ট হইয়া রহিল! ঐ ব্রাহ্মণের অভিশাপ তখন হইতে বঙ্গভাষা এবং সাহিত্যকে পদে পদে এবং উত্তরোত্তর 'অসংস্কৃত' এবং 'অসাধু' করিয়াই চলিয়াছে। মধুস্থদন বন্ধুকে লিখিলেন, "আর এ বালাই যেন আমার না হয়। আমাকে চলিতে হইলে নিজের পায়ের উপরে ভর করিয়াই চলিতে হইবে।" "মনে রাখিও, তোমার সাহিত্যদর্পণের বিশ্বনাথকে না ভুলিতে পারিলে বাঙ্গলার নাটকের উদ্‌গতি নাই।" প্রথম কথাটির মধ্যে যেমন কবিমাত্রের হৃদয়ঙ্গমভাবে কাব্য-নির্মিতির প্রধান শাস্ত্রটাই ধরা দিয়াছে, দ্বিতীয় কথাটির মধ্যেও তেমনি বাংলা নাটকের গম্যপথ তাহার ঐ 'নাটের গুরুর' অঙ্গুলিতেই প্রদর্শিত হইতেছে। মধুস্থদনের পরবর্তী বাংলা নাট্যকারমাত্রেই বিশ্বনাথ-লিখিত নাট্যশাস্ত্রের 'পাতি' বিস্মৃত হইয়াই চলিতেছেন। নাটক-রচনার বিধি-বিষয় লইয়া লিখিত মধুস্থদনের পত্রগুলি অনেক স্থানেই সচেতন বুদ্ধি এবং অভ্রান্ত-দৃষ্টি নাট্যশিল্পীর পরিচয় দিতেছে। এ সকল ইংরাজী পত্র বাঙ্গালী লেখক এবং পাঠকের হিতার্থে অনুবাদিত হওয়া উচিত। "আমি রামনারায়ণকে দিয়া কেবল আমার লেখায় কোন ব্যাকরণ ভুল থাকিলে ঐ সমস্ত সংশোধন করিতেই চাহিয়াছিলাম। আমার 'কথাকে কথা' বদলাইয়া ফেলিতে চাই নাই—নিশ্চয়ই চাই নাই। তুমি জান, মানুষের রচনারীতির মধ্যে তাহার মনপ্রাণের প্রতিবিম্বটাই পড়ে। তোমাকে বলিতে কি, উক্ত মহোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই অধমের কোন দিকেই কিছুমাত্র মিল্‌তি নাই। তবে আমি তাঁহার কয়েকটি সংশোধন গ্রহণ করিব।"

এই 'মিল্‌তি' এবং সমকক্ষতা! মধুস্থদনকে চালাইবার জন্য রামনারায়ণ

পণ্ডিত! এ যেন দৈত্যাকৃতি অতিকায় জীবকে চলাফেরা শেখাইবার জন্য অঙ্গুষ্ঠাকৃতি বামনপুরুষের নিয়োগ! তাঁহাকে 'হাত ধরা' দিতে, তাঁহার গ্রাহ্য হইতেই প্রাণ শেষ! সেক্সপীয়রের সংশোধনকর্তা গ্যারিক! তবে, এইরূপ বামন-সংশোধক, বামন-সমালোচক এবঞ্চ বামন-পাঠক ইহা তো অতিকায় কবিগণের নিত্যকালের দুরদৃষ্ট!

উপরিউক্ত কথা কয়টির মধ্যে মধুসূদন নিজের সাহিত্যসৃষ্টির একটা গুপ্ত রহস্যও প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছেন। কবিগণের ভাষার মধ্যে তাঁহাদের বুকের নিশ্বাস এবং প্রাণের গন্ধ ওতপ্রোতভাবে বর্তমান থাকে। এজন্য রচনাকালে কলমের প্রথম টানেই যাহা বাহির হইয়া আসে, অনেক কবি 'দোষেগুণে উহাই সই' বলিয়া মানিয়া লইতে চেষ্টা করেন। কবিগণ ভাবের যে আবেশে আবিষ্ট হইয়া ভাষার হস্তে আত্মসমর্পণ করেন, সেই অমৃত-মুহূর্ত দ্বিতীয়বার আসে না—ভাষার অনির্বচনীয় মন্ত্র-শক্তির মধ্যে অতর্কিতে উহারই ছাপ পড়িয়া যায়। মন্ত্রের উপরে সংশোধন চালাইতে গেলে, যে-গুণে উহা মন্ত্র তাহাই খণ্ডিত হইবার সম্ভাবনা ঘটে। এজন্য কবি, বিশেষতঃ 'ভাবুকতা'-প্রধান কবিমাত্রেই নিজের ভাবাবিষ্ট অবস্থার প্রথমপ্রাপ্তির উপরে নিজেরাও হস্তক্ষেপ করিতে সহজে রাজী হন না। ভাবুকপ্রকৃতির কবিমাত্রের পক্ষে এজন্য আদৌ ভাষা এবং অলঙ্কারের বিশুদ্ধিবুদ্ধিকে সাধ্যমতে পরিমার্জিত করিয়াই রচনাকর্মে হস্তক্ষেপ করা কর্তব্য হইয়া দাঁড়ায়; বিশুদ্ধিবিষয়েও নিজের অভ্যাসসিদ্ধি এবং বিবেকের নির্বিকল্প অবস্থা লাভ করিতে চেষ্টা করাই উচিত হয়। অন্যথা, পরকালে এমন কি রচনাসময়েই কোনরূপ বহিঃশাসনকে আমল দিতে গেলে, উহার নির্মম "স্থূল হস্তের অবলেপ" হইতে ভাষা ও ভাবের সকল যোগসূত্র এবং সংযোগী-শক্তি একেবারে ছিন্নভিন্ন হইয়া যাইতে পারে। মধুসূদন জানিতেন, তাঁহার কাব্যের প্রধান ক্ষমতা-রহস্য—ভাবাবেশের সহযোগী তাঁহার ঐ ভাষার ঐ অনির্বচনীয় মন্ত্রশক্তি। সুতরাং তাঁহার আশঙ্কা ছিল যে রচনার পরে অন্য কাহাকেও উহাতে সংশোধনাস্ত্র চালাইতে

দিলেই তাঁহার কবিতার গুপ্ত এবং সূক্ষ্ম 'প্রাণের ধারা'টিই কাটিয়া যাইবে! 'কুলীন-কুল-সর্বস্ব'-এর রচয়িতাও কেবলমাত্র শুষ্ক পণ্ডিত অথবা একজন 'যে সে লেখক' তো ছিলেন না! বঙ্গীয় নাটকের জন্ম-পত্রিকায় তাঁহার অবিসংবাদিত স্থান আছে। তবু, তাঁহার হস্তেই কবি মধুসূদনকে 'পরিত্রাহি' ডাকিতে হইয়াছে। মেঘদূত-কাব্যের উৎপতনশালিনী এবং অলকা-বিহারিণী কাব্য-প্রতিভাকেও দিঙ্‌নাগ-গণের স্থূলহস্তের 'পরামর্শ' ভয়ে ভাবিত হইতে বাধ্য করিয়াছিল।

'শর্মিষ্ঠা' রচিত হইল এবং মহাসমারোহে বেলগাছিয়া থিয়েটারে উহার অভিনয়ও হইয়া গেল। সেকালের সংবাদপত্রে উক্ত অভিনয়ের এবং রচয়িতা মধুসূদনের প্রশংসাও আর ধরে না। নব্যতন্ত্রে শিক্ষিত ব্যক্তিমাত্রেই বুঝিলেন, বঙ্গসাহিত্যে কবিত্বে, ভাবে এবং ভাষায় উহা একটা সম্পূর্ণ নূতন জিনিষ। উহা একটা নবযুগের আরম্ভ।

মধুসূদন সুরু হইতে এত সচেতনভাবে এই নব্যযুগের বিদ্রোহ-সুর আনয়ন করিলেন যে, যেন 'যুদ্ধং দেহি'-গোছের একটা আহ্বান শর্মিষ্ঠার প্রস্তাবনাতেই জুড়িয়া দিলেন। বলা বাহুল্য, উহা সংস্কৃত নাট্য-নিয়মের অনুযায়ী কোন প্রস্তাবন নহে এবং উহাই হয়তো বঙ্গভাষায় কবির প্রথম সচেতন কবিতা।

"শুন গো ভারত ভূমি, কত নিদ্রা যাবে তুমি?
আর নিদ্রা উচিত না হয়!
উঠ, ত্যজ ঘুম ঘোর— হইল হইল ভোর;
দিনকর প্রাচীতে উদয়।
কোথায় বাল্মীকি, ব্যাস, কোথা তব কালিদাস,
কোথা ভবভূতি মহোদয়?
অলীক কুনাট্য রঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে
নিরখিয়া প্রাণে নাহি সয়।
সুধারসে অনাদরে, বিষবারি পান করে,
তাহে হয় তনু মন ক্ষয়।
মধু কহে, জাগো মাগো, বিভু-স্থানে এই মাগো
সুরসে প্রবৃত্ত হ'ক তনয় নিচয়।"

অন্য দিকে, প্রাচীন-তন্ত্রের পণ্ডিতগণও বলিতে লাগিলেন, "সংস্কৃত রীতি অনুসারে ইহা তো নাটকই হয় নাই। সংশোধন করিতে হইলে একটি পংক্তিও আস্ত থাকে না।" হাসিটিটিকারীরও অভাব রহিল না।

আমাদিগকে বুঝিতে হইবে, শর্মিষ্ঠায় কেবল প্রয়োগ-রীতির দিক হইতেই সংস্কৃত অলংকারশাস্ত্রের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ। এই নাটকে 'প্রস্তাবনা' নাই, এক একটি অঙ্ককে বিভিন্ন গর্ভাঙ্কে বিভক্ত করা গিয়াছে; সুতরাং অঙ্কবিশেষে স্থান-কালের ঐক্য একেবারে নাই। সেক্সপীয়র যেমন অরিষ্টোটল-নির্দিষ্ট গ্রীক নাট্যশাস্ত্রের 'স্থান-কালের-ঐক্য-আদর্শ'কে ইংরেজী নাটকে ধ্বংস করিয়াছিলেন, মধুসূদনও প্রাচীন আলংকারিকের 'অঙ্ক'-আদর্শকে বাঙ্গালার নাটকে ধ্বংস করিলেন। ইহা প্রাচীনতন্ত্রের পণ্ডিতগণের মনে বড়ই লাগিল। মধু লিখিয়াছিলেন, "এই নাটকে আমি তোমার প্রাচীন পণ্ডিতসংঘকে একেবারে স্তম্ভিত করিয়া দিব। তবে, বলিয়া রাখি, বেশী আশঙ্কারও কারণ নাই।" "মনে রাখিও আমি এই নাটক এমন সমস্ত লোকের জন্যই লিখিয়াছি, যাহারা আমার ভাবেই ভাবুক; যাহারা ন্যূনাধিক পাশ্চাত্ত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এবং পাশ্চাত্ত্য নিয়মেই চিন্তা করে। প্রাচীন সংস্কৃত-আদর্শের দাস্যশীল অনুসরণ হইতে আমাদের চিন্তাশক্তির চরণেই যে শৃঙ্খল পড়িয়াছে, উহাকে সর্বপ্রথমে দূর করাই আমার উদ্দেশ্য।"

উদ্দেশ্য যাহাই প্রকাশ করুন, আমাদিগকে বলিতে হয় যে, বাহ্যিক রীতির ক্ষেত্র ব্যতীত "শর্মিষ্ঠা" নাটকে সংস্কৃত নাট্য-আদর্শের বিশেষ কোন বড় বিদ্রোহ নাই। উহার মধ্যে পাশ্চাত্ত্য শিক্ষার একটা সাদাসিধা সাধারণ আবহাওয়া আছে, এইমাত্র। মধুসূদন সামাজিকতার তরফে এমন কোন অনাচার প্রদর্শন করেন নাই, যাহা কালিদাস, শূদ্রক, ভাস বা শ্রীহর্ষের পক্ষে অসম্ভব ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' প্রাচীন 'রত্নাবলী'র আদর্শেই একটা সাচ্চা 'রোমান্টিক' নাটক। আসল কথা, মধুসূদন তাঁহার পৃষ্ঠপোষক রাজাদের বাধ্য ছিলেন; এবং অভিনয়যোগ্য নাটক লিখিতেছিলেন বলিয়া যেমন সেকালের সম্ভাবিত দর্শকগণের তেমন অভিনেতৃ-

গণের মন যোগাইতেও বাধ্য ছিলেন। এত সমস্ত সত্ত্বেও 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মধুসূদন যে শিল্প-শক্তির পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই অপরূপ—তিনি প্রাচীন আর্য-নাটকের ভাবগন্ধে এবং ভারতীয় সামাজিক আদর্শের গঙ্গা-স্রোতে যেন নিজের শিল্পি-আত্মাকে একেবারে স্নানপূত করিয়াই তুলিয়াছেন। চিরকাল বিলাতী রীতিনীতি এবং বিলাতী-ভাবের খোরাকে মন পুষ্ট করিয়া আসিয়াও তিনি একেবারে ষষ্ঠশতাব্দীর ভারতীয় কবির মনোবুদ্ধি, লিপিচাতুর্য এবং ভাবুকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। সংস্কৃত নাটকের ভাব এবং ভাষার চিদাত্মায় তন্ময় হইতে না জানিলে, অসাধারণ সহানুভূতি-শক্তি না থাকিলে এ-কালের কবির পক্ষে, বিশেষতঃ বিলাতী-ভাবাপন্ন খ্রীষ্টান কবির পক্ষে উক্ত ব্যাপার একেবারেই অসম্ভব ছিল। 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে মধুসূদন শ্রীহর্ষেরই আত্মজ বলিলে অতিরিক্ত হয় না; রত্নাবলী ইংরেজীতে অনুবাদ করিতে যাইয়াই মধুকবির অন্তরাত্মায় শ্রীহর্ষের ভাব-সংযোগ এবং আত্মপরিচয় ঘটিয়াছিল। উহা হইতে উপনয়ন লাভ করিয়াই তিনি 'শর্মিষ্ঠা'র প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিলেন। সাহিত্যসেবীর পক্ষে কোন নবভাবের উপনয়ন লাভ করিতে হইলে অনুবাদ রীতি যে কত উপকারী হইতে পারে, মধু-জীবনের এই ঘটনাটি তাহার প্রধান দৃষ্টান্তস্থল হইয়া আছে।

এই অনুবাদ ব্যাপারে মধুসূদন-সম্পর্কে সর্বাপেক্ষা বড় এবং জ্ঞাতব্য কথাই হইতেছে, তাঁহার শিক্ষানবিশী এবং সংস্কৃত কবি হইতে বাক্যরীতির উপার্জন। যে লক্ষণ জগতের সাহিত্যেই সংস্কৃত কবিগণকে বিশেষিত করিয়াছে সেই প্রধান লক্ষণটীই হইতেছে তাঁহাদের বাক্যরীতি। তাঁহারা ভাবকে অপরূপ স্ফুট-মূর্তি প্রদান করিতে পারেন। তাঁহারা ভাবকে শব্দের বর্ণনাশক্তির মধ্যে এমন প্রোজ্জ্বল এবং প্রমূর্ত ভাবে ধরিতে পারেন যে, এ ক্ষেত্রে বিশ্বসাহিত্যে তাঁহাদের তুলনা নাই। মধুসূদন বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাদেরই দীক্ষা-শিষ্য। মধুসূদন এবং ভারতচন্দ্র ব্যতীত বঙ্গের পূর্বাপর কোন কবি ভাষার সেই ধ্বনি-গৌরবে, এবং ভাবকে তন্মধ্যে দৃঢ়মুষ্টিতে অধিকার করার শক্তিতে সংস্কৃত কবিগণের

নিকটস্থ হইতে পারেন নাই। আর্যশব্দের অভিধাশক্তিকে বঙ্গের অপর কোন কবিই মধুসূদন অপেক্ষা সমর্থতরভাবে কিংবা এমনতর প্রাণ-মন সহযোগে অধ্যয়ন এবং আত্মস্থ করিতেও পারেন নাই। মধুকবির সংস্কৃত ব্যাকরণের বিদ্যা খুব পরিপক্ব ছিল না—তিনি নিজেই বলিয়াছিলেন, "আমি রাজেন্দ্রলালের ন্যায় বজ্রকণ্ঠ বৈয়াকরণ নহি।" না থাকিলেই বা কি হইবে ? তিনি যে একজন born linguist, অসাধারণ বাক্য-শিল্পী। কবি নিজের জন্মগত অদৃষ্টেই যে কোন ভাষার অন্তরাত্মায় প্রবেশ করিবার জন্য অনন্যসাধারণ শক্তি রাখিতেন। ঐ গুণে মধুসূদন বঙ্গভাষার আর্য-প্রকৃতিকে এমনভাবে আয়ত্ত করিয়াছিলেন যে, এ পর্যন্ত কোন বাঙ্গালী তাঁহাকে অতিক্রম করা দূরে থাকুক, তাঁহার নিকটবর্তী হইতেও পারেন নাই। এই গুণে তিনি সংস্কৃত নাটকের অন্তরাত্মার মধ্যেও অনন্য-সামান্য ভাবেই প্রবেশ লাভ করিতে পারিয়াছিলেন।

'শর্মিষ্ঠা' মহাভারতের যযাতি উপাখ্যান অবলম্বনেই রচিত। শর্মিষ্ঠা কর্তৃক দেবযানীকে কূপে নিক্ষেপ, যযাতি হইতে দেবযানীর উদ্ধার, শুক্রাচার্যের ক্রোধ-উপশমের জন্য দৈত্যরাজ কর্তৃক শর্মিষ্ঠাকে দেবযানীর দাস্যে নিয়োগ, যযাতির সহিত দেবযানীর বিবাহ, শর্মিষ্ঠার সহিত যযাতির গুপ্তপ্রেম, উহা প্রকাশ পাইলে দেবযানীর ক্রোধ, শুক্রাচার্য কর্তৃক যযাতির অভিশাপ, ও যযাতির জরাপ্রাপ্তি, শর্মিষ্ঠার সন্তান কর্তৃক পিতার জরাগ্রহণ—এ সকল বৃত্তান্ত মধুসূদন অকুণ্ঠিত প্রকারেই মহাভারত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। তবে, কবি শুক্রাচার্যকে শমগুণান্বিত করিয়াছেন—চঞ্চল-চিত্তা এবং অভিমানিনী দেবযানীর প্রতাপ অতিক্রম করিতে না পারিয়াই যেন শুক্রাচার্যকে, শর্মিষ্ঠার দাস্য এবং যযাতির জরা প্রভৃতি ঘটাইয়া এ নাটকের ঘটনা পরিচালিত করিতে হইয়াছে। শর্মিষ্ঠা সরলা, নিজের অপরাধ বুঝিয়া অনুতপ্তা, সহিষ্ণুতা-ময়ী এবং ধৈর্যময়ী শর্মিষ্ঠাই এ নাটকের প্রধান চরিত্র। দেবযানী কোপন-স্বভাবা, পতিপ্রেম-বঞ্চিতা অভিমানিনী—কিন্তু স্বামীর নিদারুণ অন্যায়ের প্রতিশোধ লওয়ার অব্যবহিত পরেই অনুতপ্তা হইয়া আমাদের সহানুভূতি

আকর্ষণ করিতেছেন। শর্মিষ্ঠা অপেক্ষাও বরঞ্চ দেবযানীর চরিত্র-ধারণাতেই মধুসূদন ভারতীয় নারীচরিত্র-জ্ঞানের ক্ষেত্রে সূক্ষ্ম শিল্পি-দৃষ্টি প্রদর্শন করিয়াছেন। যেমন যেস্থলে, বয়স্থা দেবযানী যযাতির প্রতি অনুরক্তা—ব্যাপারটি তাহার সখী শুক্রাচার্যকে জানাইতে চায়। কিন্তু দেবযানী লজ্জাভয়ে সেকথা কোন মতেই পিতাকে বলিতে দিবে না। কন্যার পক্ষে এই স্বতন্ত্রতার অবস্থা ভারতীয় সমাজের 'কন্যা' দেবযানীর মনোনেত্রে পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়া যমের মতই ভয়ঙ্কর দেখাইতেছিল। আবার যযাতিও প্রেমের বিলাসে এবং আবিষ্টতায় একরূপ সর্ববিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছেন, কিন্তু যেই রাজধর্মের ডাক পড়িল—প্রজার ধন দস্যুরা অপহরণ করিতেছে, অমনি নিজের সমস্ত ভুলিয়া সমস্ত স্বার্থ-বিলাস ঝাড়িয়া ফেলিয়া ধনুর্বাণ-হস্তেই ছুটিয়া চলিলেন। ইহা ভারতীয় বর্ণাশ্রমতন্ত্রে ক্ষাত্র-আদর্শের মর্মকথা—বিশেষ ভাবে সংস্কৃত নাটকেরই মর্মকথা। যা' হোক নব্যতন্ত্রের খ্রীষ্টানকবি কিরূপে যযাতির ঐ দ্বিচারিণী প্রীতি এবং উহার আঘাত প্রতিঘাতকে সহানুভূতি-যোগে দৃষ্টিপূর্বক নাটকের উপজীব্যরূপে গ্রহণ করিলেন—কৃতিত্ব দেখাইতে পারিলেন, তাহাই আশ্চর্যের বিষয়। রত্নাবলী অনুবাদ করিতে গিয়াই যে তিনি এই দৃষ্টি-স্থান লাভ করিয়াছিলেন, তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। সমগ্র নাটকটির মধ্যে প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের বিশেষতঃ বর্ণাশ্রম-আদর্শের 'ব্রাহ্মণ্য'-আবহাওয়া প্রবাহিত হইতেছে। খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও, কবির হৃদয় যে অভ্যন্তরে 'হিন্দু' ছিল, উহা তাহারই নিদর্শন। বরং খ্রীষ্টানীর গতিকেই তিনি যেন হিন্দু অপেক্ষাও দূরতর দৃষ্টি-স্থান হইতে প্রাচীন ভারতের মর্মদেশে বিস্তারিত দৃষ্টিপাত করিতে পারিয়াছিলেন। উভয়ের 'তুলনায় পার্থক্য' এবং বিশেষত্বও বুঝিয়া উঠিতে পারিয়াছিলেন। স্বামী একব্রত্য-আদর্শের ব্যভিচারী হইলেও ভারতীয় নারী কি পরিমাণে তাহার শাস্তি বিধান করিতে পারে, এবং কতদূর পর্যন্ত প্রতিশোধ লইতে পারে? পরিশেষে দয়াই তাহাকে নির্জিত করে। স্বামীকে একেবারে পরিত্যাগ করিবার জন্যও তাহার ক্ষমতা অথবা হৃদয় নাই; পরিশেষে সহিষ্ণুতা অবলম্বন-পূর্বক নিজের অদৃষ্টকে মানিয়া লওয়াই তাহার পক্ষে

অপরিহার্য হইয়া যায়। ভারতীয় দাম্পত্য-আদর্শের একটি উপসিদ্ধান্ত এইরূপে যেমন মালবিকাগ্নিমিত্রে, যেমন রত্নাবলীতে, তেমন শকুন্তলাতেও আত্মপরিচয় করিতেছে; পত্নীকে অত্যধিক self-assertion করিতে দেয় নাই। খণ্ডিতা পত্নীকে বরঞ্চ তাহার দুরদৃষ্ট মানিয়া লইতেই শিক্ষা দিয়াছে। নব্যতন্ত্রী এবং খ্রীষ্টান মধুসূদন উহার সঙ্গেই সহানুভূতি করিলেন। বলা বাহুল্য, ইবসেন প্রভৃতির বিপরীতে ইয়োরোপে অনেক আধুনিক নাটকেও এখন এইরূপ নিবৃত্তির সুরই ফুটিয়া উঠিতেছে। গৃহরাজ্যের প্রেম-তন্ত্রে অত্যধিক আত্মপ্রতিষ্ঠার আদর্শ যেন বিদ্রোহধর্মী এবং আত্মহত্যাপ্রবণ বলিয়া ইয়োরোপীয় সমাজের নেত্রেও ব্যাপকভাবে পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে।

তবু, বলিতে হয় যে, শর্মিষ্ঠা নাটকের শিল্প-সিদ্ধি চিরকালীয় সাহিত্য-আদর্শের দৃষ্টিতে অনেক দিকে দুর্বল বলিয়াই প্রতিভাত হইবে। মধুসূদন যে সুযোগ পাইয়াছিলেন, মহাভারতের যযাতি উপাখ্যানটির মধ্যেই নাটকীয় কৃতিত্ব-প্রকাশের যে বিস্তারিত অবকাশ আছে, সকল দিকে উহার সদ্ব্যবহার করিতে তিনি পারেন নাই। প্রধান কারণ, 'শর্মিষ্ঠা' প্রায় সকল দিকেই বঙ্গসাহিত্যে 'প্রথমা সৃষ্টি'। মধুসূদনকে যেমন তাড়াতাড়িতে নাটকের শিল্প-কাঠামো গড়িতে হইয়াছে, তেমন চরিত্র-চিত্রণের আদর্শকে, ভাষা ও ভাবুকতার আদর্শকেও সৃষ্টি করিয়াই বঙ্গদেশবাসীকে দেখাইতে হইয়াছে। শিল্পী নিজের সৃষ্টিকার্যে নিজের চূড়ান্ত শক্তিতে ধ্যানস্থ এবং সমুদ্যমী হইবার জন্য সময় ও সুবিধাও পান নাই।

তবে, নানাদিকে সংস্কৃত নাটকের প্রয়োগ-আদর্শই কবির সম্মুখে খোলা আছে, সংস্কৃত নাটকের গুণ এবং দোষ উভয়েই 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে পুরামাত্রায় প্রকাশিত। সংস্কৃত নাটকের ন্যায় বাহুল্যময় প্রকৃতি-বর্ণনা, প্রাচীন নিয়মের অলঙ্কারময় বাক্যবিন্যাস, সংস্কৃত নাটকের ন্যায় স্বগত-উক্তিতে পাত্রগণের আত্ম-পরিচয় এবং অদৃশ্য ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ প্রভৃতি প্রয়োগ-রীতি মধুসূদনকে ভারতের প্রসিদ্ধ প্রাচীন নাট্যকারগণের শিষ্যরূপেই প্রদর্শন করিতেছে।

মধুসূদন কবি ; কেবল অভিনয়োপযোগী নাট্যকার নহেন—যে অভিনেয়-তার ক্ষেত্রে পরকালের কবিত্ব-লেশবিহীন লেখকগণও হয়ত কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। মধুসূদন বাঙ্গালীর জন্য একটা সাহিত্য—নাটকীয়-সাহিত্যই রচনা করিতে অবহিত হইয়াছিলেন। তাঁহার কবিত্বই এক্ষেত্রে শর্মিষ্ঠার বল এবং দুর্বলতা। আধুনিককালের দৃষ্টিতে সর্বপ্রধান দুর্বলতাই উহার ভাষারীতি। মধুসূদন সুন্দর কথা ব্যতীত, ভাবযুষ্ট এবং অলংকারযুক্ত বাক্য ব্যতীত একটি চরণও লিখিতে পারেন নাই। কাব্যের ক্ষেত্রে তাঁহার যাহা প্রধান গুণ ছিল, অমিত্রচ্ছন্দে হইলে এই নাটকটিকে যেমন একটা দিব্য-সুন্দর নাট্যকাব্যরূপে পরিণত করিতে পারিতেন, বঙ্গরঙ্গে অভিনেয়-নাটকের ক্ষেত্রে আসিয়া উহাই তাঁহার 'প্রধান দোষ'রূপে দাঁড়াইয়া যাইতেছে। আবার, বঙ্গভাষার গদ্য তখনও একটা কাঠামো এবং স্থির মূর্তিলাভ করিতে পারে নাই—এখনো প্রকৃত প্রস্তাবে করিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঐ অপরিণত বুদ্ধি এবং অল্পবয়স্কা গদ্য-বাণী লইয়াই মধুসূদনকে একটা সংসার গড়িতে হইয়াছিল। উহার পদগতি এবং বহিরাকৃতিটাই তখন যাবৎ পূর্ণশ্রী লাভ করে নাই ; সুতরাং উহার পক্ষে প্রসাধন এবং অলংকার-মাত্রেই মহাভার হইয়া 'শর্মিষ্ঠা'য় পদে পদে চলাফেরার হানি জন্মাইতেছে।

বলিতে হইবে মধুসূদনের কবিত্বই যেমন 'শর্মিষ্ঠা' নাটকের, তেমন তাঁহার সকল নাটকের ন্যূনাধিক দোষ হইয়া গিয়াছে। বঙ্গের নাট্যকলা যেমন অসমর্থ অভিনেতৃগণের তেমন অযোগ্য দর্শকগণের দাসী বই নহেন ; দাসীর পায়ে 'সোনার মল' মানাইবে কেন ? এখনও, এই ৬০ বৎসর পরেও বঙ্গের কোন কৃতী সন্তান নাট্যবাণীর এই দাসীপনা একেবারে ঘুচাইতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না। বর্তমানে বরং নানাদিকে এই দাসত্ব আরও বাড়িয়া গিয়াছে। অর্থদাসত্ব বলিয়া একটা তৃতীয় এবং প্রবলতর বন্ধনরজ্জু বঙ্গের নাট্যসরস্বতীকে একেবারে কাহিল করিয়া তুলিয়াছে। আমাদের থিয়েটারে কবিত্বের স্থান নাই। অথচ উহাই তো

মধুস্দনের নাটকের প্রধান দোষ—They have the fatal gift of beauty. উহাদের মধ্যে কবিত্বময়তা এবং সৌন্দর্যরূপী অভিসম্পাত আছে।

'শর্মিষ্ঠা'র অব্যবহিত পরেই পদ্মাবতী নাটক। 'শর্মিষ্ঠা'র আশাতিরিক্ত প্রতিষ্ঠায় উৎসাহিত হইয়া মধুস্দন গৌরদাসকে লিখিতেছেন—"আমি রক্তের আস্বাদ পাইয়াছি, আর একটিতে লাগিয়া গিয়াছি।" তিনি শর্মিষ্ঠাকে সাপত্ন্যের প্রতিকূল অবস্থায় ফেলিয়া এবং দুঃখের নিকষে ঘর্ষণ করিয়া চিত্তাকর্ষক করিয়া তোলেন; এখন পদ্মাবতীকেও সেইরূপ প্রতিকূল অবস্থায় এবং দুঃখের অভিঘাতের মধ্যে ফেলিলেন। পদ্মাবতী সরলা, সর্বজীবে সদ্ভাবশীলা রাজকন্যা, কিন্তু অদৃষ্টবশে দেবতা এবং সংসার উভয়েই তাহার প্রতিকূল। মধুস্দন এই প্রথম গ্রীক অদৃষ্টবাদকে ভারতীয় সাহিত্যের ক্ষেত্রে অবতারিত করিলেন। শক্তিহীন সামান্য মানবের সামান্য অপরাধকে দণ্ডিত করিবার জন্য দেবতার সিংহাসন টলিয়াছে। একদিকে দেবরাজ-পত্নী শচী ও যক্ষরাজ-পত্নী মুরজা, অন্যদিকে মনুষ্যের সংসাররাজ্যের সেই একচ্ছত্রী দেবতা-পুরুষ মদনের পত্নী রতি। সেই দেবদ্বন্দ্বের যাঁতায় পড়িয়া দুর্বল নরনারীর সর্বনাশ! মনুষ্যজীবনের নিয়তিকে ঐরূপে দৈবী-মূর্তি প্রদান পূর্বক তাহার ভালমন্দকে একটা দেবদ্বন্দ্বের ফল বলিয়া যে ব্যাখ্যা করিতে পারা যায় না তাহা নহে; মধুস্দন এইরূপে নিজের জীবনের দুর্দশা এবং দুরদৃষ্টকেও রমা এবং বাণীর দ্বন্দ্বফল বলিয়াই ধারণা করিয়াছেন। কিন্তু ভারতের অদৃষ্টবাদে ঐরূপ দেবদ্বন্দ্বের আদর্শ মোটেই উজ্জ্বল নহে। ভারতের 'অদৃষ্ট'-দেবতা মনুষ্যের কর্মফলের বিধাতা বই নহেন। এই কারণে, যে স্থলে জীবনের কর্ম হইতে জীবনের সকল ফল বুঝিতে পারা যায় না, পৌরাণিকগণ সে-স্থলে জন্মান্তরীয় কর্মফলের সঙ্কেত করিয়াই মনুষ্য-জীবন বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। এখন, দেবীত্রয়ের মধ্যে বিবাদ হইল, কে সর্বাপেক্ষা সুন্দরী! তিনজনেই 'ঘুষ' লইয়া নাট্য-নায়ক ইন্দ্রনীলের সমক্ষে উপস্থিত। ইন্দ্রনীল কতকটা মনুষ্যধর্মবশেই—কোন মনুষ্য রতিকেই সর্বাপেক্ষা সুন্দরী মনে না করে—উহার নিষ্পত্তি

করিলেন। উহাতেই অপরা দেবীদ্বয় "তুমি সৌন্দর্য-লোভে পড়িয়া এই যে অবিচার করিলে উহার প্রতিফল তোমাকে ভোগ করিতেই হইবে" বলিয়া শাসাইয়া গেলেন। "তোমাকে সর্বাপেক্ষা সুন্দরীর স্বামী করিব"—ইহাই ছিল রতির প্রলোভন। ইন্দ্রনীলের বিচার-নিষ্পত্তি হইতেই তাঁহার উপর রতির প্রসাদ এবং শচী ও মুরজা দেবীর কোপবজ্র পতিত হইল। ইন্দ্রনীল রাজা হইলেন, ইহাই হইল দেব-কোপের প্রকাশ্য অজুহাত; কিন্তু অনপরাধিনী পদ্মাবতী! তিনি রতির প্রসাদে ইন্দ্রনীলকে স্বামীরূপে পাইয়াও দেব-কোপে বিচ্ছিন্না হইয়া পড়িলেন; স্বামী-স্ত্রী উভয়েই রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া শচী-নিযুক্ত কলিরাজ হইতে নির্যাতন ভোগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু, পদ্মাবতীর এই অদৃষ্টকে কবি আবার পৌরাণিক আদর্শে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। পদ্মাবতী শাপভ্রষ্ট দেবকন্যা—মুরজারই কন্যা; অভিশপ্তা কর্মের ফল-ভোগের জন্যই নাকি ভূতলে, মাতার অজ্ঞাত-সারেই জন্মগ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বলা বাহুল্য, ইন্দ্রনীলের ঐ প্রলোভন-দৃশ্য হোমরেরই অনুকরণ। কবি 'গ্রীক অদৃষ্টবাদে'র সহিত 'ভারতীয় অদৃষ্টবাদ' মিলিত করিয়া এই নাটক রচনা করিলেন। কাশীরাম দাসের শ্রীবৎস চিন্তার উপাখ্যান; 'মহাভারতের' 'নলোপাখ্যান', বিশেষতঃ 'মনসামঙ্গল' প্রভৃতির সহিত পরিচিত বঙ্গসমাজের সমক্ষে ইহা কোথাও বিরূপ বোধ হয় নাই। তবে এই নাটক ট্রাজিডী নহে; পরিশেষে ভবানীর অনুগ্রহেই দেবরোষ পরাবৃত্ত হইয়াছে এবং ইন্দ্রনীল পদ্মাবতী পুনর্মিলিত হইয়াছেন। পদ্মাবতী-নাটকে কবি যে কলা-শক্তি এবং গঠন-নৈপুণ্যের পরিচয় দিয়াছেন, বলিতে হইবে, তাহার তুলনা কবির অন্য কোন নাটকে নাই।

কবি অগ্রগামী অজুহাতরূপে লিখিয়াছিলেন, "আমার এই নাটকে কিছু না কিছু বিদেশী আবহাওয়া থাকিবেই। কিন্তু ভাষা যদি বিশুদ্ধ হয়, ভাব যদি অব্যর্থ এবং প্রাঞ্জল হয়, উহার ঘটনাচক্র যদি চিত্তাকর্ষক হয়, চরিত্রাঙ্কন যদি সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া থাকে তাহা হইলে উহার মধ্যে বিদেশী আবহাওয়া থাকিলেই বা কি আসে যায়? মূরের কবিতায় প্রাচ্যভাবের আধিক্য বলিয়া,

বায়রণের কবিতায় এসিয়ার বাতাস আছে বলিয়া, কিংবা কার্লাইলের লেখায় জর্মনী-ভঙ্গী আছে বলিয়া কি কেহ উহাদের অশ্রদ্ধা করে ?"

এইরূপ নাটকের প্রধান দোষ এই যে, উহাতে মনুষ্য-চরিত্র আপন মাহাত্ম্যে বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ইচ্ছাকৃতির স্বাতন্ত্র্যেই মনুষ্য-চরিত্রের প্রধান মাহাত্ম্য—অথচ, এইরূপ নাটকে মানুষের এই স্বাতন্ত্র্যই থাকে না। ধৈর্য, সহিষ্ণুতা এবং ঐ জাতীয় গুণেই কেবল ঈদৃশ দৈবী-পরীক্ষায় আত্মপ্রমাণ করিতে পারে। উহাতে পুরুষের চরিত্র একেবারে বিশেষত্ব-বর্জিত হইয়া যায়, কেবল স্ত্রী চরিত্রই যৎকিঞ্চিৎ চিত্তাকর্ষক হইতে পারে। এই নাটকের মধ্যেও তাই পদ্মাবতীর চরিত্রই আমাদের সহানুভূতি লাভ করিতে পারিতেছে—ইন্দ্রনীল একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গিয়াছেন।

পদ্মাবতী নাটক পড়িতে আরম্ভ করিলেই মনে হইতে থাকিবে, যে ব্যক্তি ইহা রচনা করিতেছেন তিনি কবি—গদ্যে লিখিতে থাকিলেও অসাধারণ কবি। ইঁহার কবিত্ব-শক্তি, বাক্যের বর্ণনা-শক্তি, ঘটনার সৃষ্টিশক্তি এবং হৃদয়ের সহানুভূতি অসাধারণ। বঙ্গভাষার সেই অবস্থায় একেবারে শূন্য হইতে যে ব্যক্তি এরূপ একটা নাটক সৃষ্টি করিতে পারে, তাহার ক্ষমতা একদিকে যুবক সেক্সপীয়রের মতই অসামান্য। বর্ণ-বৈচিত্র্যের প্রাচুর্যময় বাক্য-শক্তি কবির সর্বপ্রধান গুণ। শব্দের দিকে, শাব্দিক কবিত্বের দিকে, খণ্ডপদের সৌন্দর্যের দিকে ইঁহার চিত্ত অবহিত আছে। চরিত্রসমূহকে সংশয়ে অথবা সমস্যায় ফেলিয়া উহা হইতে ভাবের গভীর অভিঘাত সৃষ্টি করার দিকে নাট্যকারের দৃষ্টি সবিশেষ সতর্ক নহে। কবির ভাষার গতি অন্তর্মুখী নহে সত্য, কিন্তু কবি যে অদ্বিতীয় বাক্য-শিল্পী, তাহাতে অনুমাত্র সন্দেহ হয় না—এই গদ্যরচনা দেখিয়াই নিঃসন্দেহ হইতে পারা যায়। কবির গদ্য পূর্বাপেক্ষা অব্যাহতভাবে চলিয়াছে। সময় সময় হয়তো ভাষার মধ্যে ভাবুকতার চাকচিক্যময় উচ্ছ্বাস সৃষ্টি করিয়া, এবং কেবল গল্পটাকে অগ্রসর করিয়া দিয়াই নিবৃত্ত হইতেছে। কেবলই মনে হয় কবি যদি ব্যাপারটিকে ছন্দের মধ্যে ধারণা করিতেন, ইহা যদি সেক্সপীয়রীয় আদর্শের একটা গদ্য-পদ্যময়

নাটক হইত! তাহা হইলেই কবি স্বস্থল প্রাপ্ত হইতেন; ইহা বঙ্গসাহিত্যের একটা শ্রেষ্ঠ নাট্যকাব্যরূপেই দাঁড়াইয়া যাইত। কবির সমসাময়িক চিঠিগুলি আমাদের এই ধারণাই সমর্থন করিবে: "যদি কেবল পাখা খুলিতে পারিতাম, যদি কেবল অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে পারিতাম!" কখনও যেন চীৎকার করিয়াই বলিতেছেন, "অমিত্রচ্ছন্দ ধরিতে না পারিলে বাঙ্গলা নাটকের কদাপি উন্নতি নাই"। "তোমরা সেক্সপীয়রের নাট্য আদর্শে আমার এই নাটক বিচার করিও না। সেক্সপীয়রের ভাষা, সামাজিক ভিত্তি কিংবা রঙ্গালয়ের অবস্থা লাভ করিতে এখনো বাঙ্গলা নাটকের অনেক বিলম্ব আছে।" আবদ্ধপক্ষ ঈগল পক্ষীর ন্যায়, নিজের দোষ-গুণ বিষয়ে পূর্ণ-চৈতন্যবান্ শিল্পী যাতনায় যেন হাঁপাইতে হাঁপাইতে এইরূপে অপরাধভঞ্জনের চেষ্টাই করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, এখনো অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গ-রঙ্গালয়ে অবতীর্ণ হয় নাই বলিলেই হয়। দুই একজন কবি অস্থিরভাবে চেষ্টামাত্র করিয়াই হাল ছাড়িয়া দিয়াছেন। বাঙ্গলা নাটক এখনো সরস্বতীপুরীর বহির্দ্বারেই যেন দাঁড়াইয়া আছে—সাহিত্যের সনাতনগৃহে প্রবেশ করার দাবীটুকু করিতেও সাহস করিতেছে না। সাময়িক পত্রাদির ন্যায় কেবল সামাজিকগণের সাময়িক মনোরঞ্জন উদ্দেশ্য করিয়া, কেবল অশিক্ষিত অভিনেতৃগণের মাপ-তালে এবং সাধারণ দর্শকগণের করতালির সহিত 'সঙ্গৎ' বাঁধিয়া চলাই সার করিয়াছে।

তবুও মধুসূদন তো ছাড়িবার পাত্র ছিলেন না। পদ্মাবতী নাটকেই কতিপয় স্থলে অমিত্রচ্ছন্দ অবতারিত করিয়াছেন। এ সমস্তই বোধ করি বঙ্গভাষায় প্রথম অমিত্রচ্ছন্দের নমুনা। উহাতেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক মহারাজা যতীন্দ্রমোহন কি লিখিয়াছেন দেখুন—"আমি বাঙ্গলা নাটকে অমিত্রচ্ছন্দ চাই, কিন্তু উহা ধীরে ধীরে অবতারিত করিতে চাই। প্রথমতঃ, এই কাজ খুব সাবধানে এবং সতর্কতার সহিত করা আবশ্যক—মানুষ যাহাতে ভাগিয়া না যায়। উহাতে বরং আমাদের উদ্দেশ্যটাই বহু বৎসরের জন্য পণ্ড হইয়া যাইবে।" দেখিলেন! অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তনই একটা বিদ্রোহের কথা—তন্মধ্যে উহা আবার নাটকে! শ্রোতৃবর্গ কবিকে একেবারে 'দশইঞ্চি' ছুঁড়িত। ফরাসী ভাষার 'সাধুতা' অমান্য করিয়া, উহার বিরুদ্ধে

বিদ্রোহ জানাইয়াই নাকি ভিক্টর হুগো 'হারনেনী' নাটকে একটা 'অসাধু' শব্দ ব্যবহার করেন—উহার দরুণ প্যারী নগরীর এক থিয়েটারে দুইটি যোদ্ধপক্ষের মধ্যে একেবারে একটি দাঙ্গা হয়।

৫

১৮৫৯ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গের শেষ কবিওয়ালা শ্রেণীর কবি ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের মৃত্যু হয়; ঐ সনেই মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভব' 'বিবিধার্থ-সংগ্রহে' প্রকাশিত হইতে থাকে। 'তিলোত্তমাসম্ভব' নব্য বঙ্গসাহিত্যের প্রথম কাব্য। কেবল কালের হিসাবে নহে, কেবল ভাষারীতি এবং ছন্দের হিসাবে নহে, উহা কাব্যের অন্তরাত্মা এবং পরিব্যক্তির ক্ষেত্রেও বঙ্গে আদ্যাসৃষ্টি! নিখুঁত সৌন্দর্যতত্ত্বের ঋক্-সঙ্গীতময় মহাকাব্য। সৃষ্টির আদিম যে সৌন্দর্যমূর্তি, যে সৌন্দর্য সবেমাত্র অনন্ততত্ত্ব হইতে স্ফুটমূর্তি লাভ করিয়াছে, যে সৌন্দর্য সবেমাত্র বিশ্বকর্মার হৃদয় এবং তাঁহার দৈবী-সৃষ্টিশালা হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া বিমোহিনীর মূর্তিতে বিশ্বের বিস্মিত নয়ন সম্মুখে আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, যে সৌন্দর্যমূর্তি তখনো কাহারও কন্যা অথবা বধূরূপে সম্বন্ধ লাভ করে নাই—সে সম্বন্ধ কখনও লাভ করে নাই—কবি তাহারই মহিমাগীতি গান করিয়াছেন। যাহা সাহিত্যে সকল আদিরসের আদিতম রস, কবি তাহারই পরিস্ফুট নগ্নমূর্তি একাব্যে ধ্যান করিয়াছেন। তাই একদিকে এ কাব্যে কোন সুস্পষ্ট 'মনুষ্যরস' বা 'human interest' নাই; উহা কেবল সৌন্দর্যের উদ্দেশ্যে সৌন্দর্য উপাসনা. An art for art's sake! নব্য সাহিত্যের ব্রাহ্মমুহূর্তে, উহার নব যৌবনের বসন্ত-প্রভাতে যে পিকবর সৌন্দর্যের এই আদিম উষামূর্তির উদাত্ত মহিমা উন্মত্ত-পঞ্চমে গান করিয়া গেল—বঙ্গবাসী যুগযুগান্তের নিদ্রা হইতে মাথা তুলিয়া যে গানে যুগপৎ মুগ্ধ, ত্রস্ত এবং আড়ষ্ট হইয়া গেল, তাহার পশ্চাতে শক্তিমাতার অপরিসীম দয়াপক্ষপাত এবং মুক্তহস্তের অনুগ্রহ ব্যতীত আর কি থাকিতে পারে? যে ব্যক্তি দীনদরিদ্র, ভিখারী—ধনী ব্যক্তি এবং রাজারাজড়ার দ্বারে-উদরান্নের জন্যই কাঙ্গাল, জগন্মাতা তাহার কপালেই এইরূপে অক্ষর-লোকের

দীপ্ত উজ্জ্বল টীকা দান করিয়া—মহারাজ চক্রবর্তীর ললাট-টীকা পরাইয়া দিয়াই যেন অন্তরালে হাসিতে লাগিলেন। ইহাই হইল নবসাহিত্যে মধুসূদনের এবং তাঁহার 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র স্থান।

এই প্রথম কবিতা উহার আরম্ভের ধবলগিরির মতই প্রচণ্ড-উজ্জ্বল এবং অভ্রভেদী শুভ্রতার মাহাত্ম্যে, দৃঢ়-রুক্ষ, উচ্চাবচ-বন্ধুর এবং সংঘাত-কঠিন গৌরবেই নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের শিরোদেশে দাঁড়াইয়া আছে। উহা হইতে নব-নবতামুখী ভাব-গঙ্গার ধারা-প্রবাহ ছুটিয়া আসিয়াই পরকালে বঙ্গদেশের মহাকাব্য, কাব্য, খণ্ডকাব্য এবং গীতিকবিতার ভাণ্ডার পূর্ণ করিতেছে।

উহাতে একদিকে যেমন প্রাচীন বঙ্গদেশের ভাবরাজ্যে এবং ছন্দের রাজ্যে বিদ্রোহ আছে, তেমন অন্যদিকে উহার ভিত্তিমূল বৃহৎ-ভারতের নিত্যকালীয় অন্তরাত্মার মধ্যেই স্থির আছে। উহা একদিকে বঙ্গভাষাকে তাহার বিস্মৃত 'আর্যমাতা'র সম্বন্ধ-সূত্রে সচেতন রাখিতেছে, অন্যদিকে মহামানবের নিত্য-কালীয় ভাবুকতার আকাশেই মাথা তুলিয়া মানব-কৌলীন্যের ক্ষেত্রেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিতেছে। স্থিরধীর আদর্শের দৃষ্টিতে উহার হয়তো অনেক দোষ আছে—কিন্তু সমস্তই শক্তির দোষ, প্রচণ্ডতা এবং প্রাচুর্যের দোষ—দারিদ্র্য-দোষ নহে।

উহার ছন্দের মধ্যে যে বিদ্রোহ—তাহা নাকি একরূপ বাজী রাখিয়াই বিদ্রোহ। মহারাজা যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "বঙ্গভাষায় অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন অসম্ভব—বঙ্গভাষার প্রবণতা উহার বিরোধী। ফরাসী ভাষার ন্যায় উহা কেবল কোমলে-মধুরেই চলিতে পারে, কেবল 'রিণিঝিনি নূপুর' চরণে চলিবার জন্যই উহার শক্তি।" মধুসূদন বলিলেন, "অসম্ভব কথা নাই মম অভিধানে। বঙ্গভাষা মহিমাময়ী সংস্কৃতভাষার আত্মজা; সংস্কৃত ভাষার 'লঘুগুরু' ভেদ বুঝিয়া উঠিতে পারিলে বঙ্গভাষা যে-কোন তালেই চলিতে পারিবে।" যতীন্দ্রমোহন বলিলেন, "না"। এই 'না'কে পথে আনিবার জন্যই, চিরকালের 'বদ্ধগোঁয়ার' কবি একেবারে 'তিলোত্তমাসম্ভব' আমদানী করিয়া ফেলিলেন। বাজীতে মধুসূদনের জিৎ হইল—যতীন্দ্রমোহন নিজের ব্যয়ে উহা প্রকাশ করার ভার লইলেন।

যতীন্দ্রমোহনের এই 'নিজের ব্যয়ে প্রকাশ'! উহার মধ্যেই কবি-জীবনের আসল রসটুকু নিহিত আছে। 'কাব্যটি তো বাজারে বিকাইবে না—অথচ ঐ পরিমাণ অর্থের অপব্যয় করিতেও কবির সামর্থ্য নাই। সুতরাং প্রকাশটাই বাঙ্গলার নবকবির পক্ষে পরম লাভ ছিল।

প্রকাশের ফল অবিলম্বেই ফলিতে লাগিল। একদিকে কবির পৃষ্ঠপোষক যতীন্দ্রমোহন প্রভৃতি কয়েকজন হাতের অঙ্গুলিগণনীয় ব্যক্তি—অন্যদিকে বিশাল বঙ্গসমাজের অপরিমেয় হাসিঠাট্টা-টিট্‌কারী, ঢিল-ইঁটপাটকেল, গুপ্ত এবং প্রকাশ্য নানাবিধ অস্ত্র-সন্ধান। মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিলেন, 'আমি জন্মযোদ্ধা, যুদ্ধ করিতেই আমার আনন্দ। আমার স্বদেশের সাহিত্য উন্নত করিতে পারিলে, আমি তাহার পরিবর্তে সমগ্র রুশিয়ার সাম্রাজ্য-মুকুটও চাহি না। তোমরা যে কয়েকজনে বল যে তিলোত্তমাসম্ভব একটা জিনিষ হইয়াছে, তাহাতেই আমার আশুতৃপ্তি। আমি জানি, ভবিষ্যৎ বংশ আমাকে বঙ্গভাষার উদ্ধারকর্তা এবং বঙ্গের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি বলিয়াই পূজা করিবে!" এই ভবিষ্যৎ-বুদ্ধি, এবং আপনার অমৃতকর্মে স্থির প্রতীতি! ইহাই তো অনাহারী কবিগণের একমাত্র খোরাক—তাহাদের বাহুতে শক্তি, হৃদয়ে ভক্তি। তাহাদের সকল কলকারখানার ইন্ধন! এইরূপ একজন উন্মত্ত এবং 'গোঁয়ার-গোবিন্দ' না হইলে কে মরিয়া-মরিয়াও বঙ্গভাষার উদ্ধার করিতে যাইত!

'তিলোত্তমাসম্ভবে'র পাণ্ডুলিপি উপহার পাইয়া মহারাজা যতীন্দ্রমোহন যে গৌরববুদ্ধির সহিত উহা স্বীকার করিয়াছিলেন, আপনাকে উক্ত কাব্যের রচনা-সংশ্লিষ্ট এবং ভবিষ্যৎ-বংশের শ্লাঘার সামগ্রীবোধে যে দৃপ্তি অনুভব করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল, রাজনারায়ণ এবং দ্বারকানাথ বিদ্যাভূষণ যেমন 'বড়গলায়' উহার সমালোচনা করিয়াছিলেন,—তাঁহারা এবং মধুর অপর দুই-চারিটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যতীত সেই যুদ্ধে তাঁহার পশ্চাতে দাঁড়াইবার জন্য আর কোন সঙ্গীই ছিল না। সাধারণ সামাজিকের কথা বলিতে গেলে,—বালক মধুসূদনের পূর্বভাষায়—তিলোত্তমাসম্ভব was dedicated to a Pigmy!

এখন তিলোত্তমাসম্ভব আপন মাহাত্ম্যেই বঙ্গ-সাহিত্যের চিরস্থায়ী রত্নভাণ্ডারে আদি আসন লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। বঙ্গের সাহিত্য-রসিক মাত্রই উহার অতুলনীয় বিশেষত্ব অবগত আছেন। উহার বস্তু-সমালোচনা করাও এখন নিষ্প্রয়োজন। সেই প্রাচীন কাহিনী—সুন্দ-উপসুন্দ কর্তৃক স্বর্গজয় এবং তাহাদের বধার্থে তিলোত্তমার সৃষ্টি—ইহা জানেন না, বঙ্গীয় পাঠকের মধ্যে এমন ব্যক্তি বিরল। কিন্তু কবি ঐ সামান্য কাঠামোর উপর কি যাদুবিদ্যার বস্তু-বর্ণ-রস এবং ভাবের আত্মা সংযোগ করিয়া এই সৌন্দর্যমূর্তি খাড়া করিয়াছেন—যাহার মাহাত্ম্য ব্যক্তিগত রুচিভেদে সহস্রদোষ-দর্শন সত্ত্বেও সাহিত্য-সাধক এবং সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে চিরকাল অটুট আছে।

কেবল তাহাই কি? আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন ঐ সময়ে একেবারে সব্যসাচী হইয়াছিলেন। 'শর্মিষ্ঠা' প্রকাশের পর এবং 'তিলোত্তমা' প্রকাশের পূর্বে মধুসূদন আর দুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন, যাহারা অন্য একদিকে—সম্পূর্ণ বিভিন্ন দিকেই—বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছে। দুইখানি প্রহসন "একেই কি বলে সভ্যতা" এবং "বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ।" আমরা জানি, তিনি এই দুটি গ্রন্থপ্রকাশের জন্য পরে একপ্রকার অনুতাপই করিয়াছেন "I half regret having published those two things." রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, "তুমি জান, এখনো জাতীয় থিয়েটার বলিয়া এক পদার্থ আমাদের দেশে জন্মলাভ করে নাই। তাহার অর্থ এই যে, এখনো আমরা যথেষ্ট সংখ্যায় নাটক, সুস্থিরশিল্প-আদর্শের এবং উন্নত-আদর্শের নাটকই রচনা করিতে পারি নাই—যাহাতে দেশের সুরুচি গঠন এবং পরিচালন করিতে পারে। আমাদের এখনো প্রহসন রচনা করার সময় হয় নাই।" এই দেশের কথা এবং দেশের সাহিত্যের জন্য লোকটির মাথাব্যথা! তবু সাহিত্য-রসিক মাত্রেই জানেন, এ দুটি প্রহসনই কেবল বঙ্গের আদি প্রহসন নহে, উহারা এখন যাবৎ আমাদের সাহিত্যে প্রকৃত প্রস্তাবে অজেয় আছে। উহাদের সমকক্ষ পদার্থও আমরা এখন যাবৎ বেশী সৃষ্টি করিতে পারি নাই। উহাদের প্রদর্শিত পন্থাই এখন যাবৎ অনুসৃত হইতেছে।

এই দুটি প্রহসনে মধুসূদন যেন একটা 'দোমুখো' করাত হাতে লইয়াই, যুগপৎ বিলাতী সভ্যতার 'বাঁদরামীকে' এবং 'দেশীয় হিঁদুয়ানী'র ভণ্ডামীকে সরলভাবে কাটিয়াছেন। স্বয়ং 'চণ্ডমুণ্ড' দলের একজন সেরা হইয়া উহার পেটের মধ্যেই সোজাসুজি এইরূপ অস্ত্রচালনা! ইহাতে বিশিষ্টতা আছে।

আবার, মধুসূদনের এইরূপ বিরুদ্ধধর্মী গ্রন্থগুলি কিভাবে রচিত হইত তাহার একটা চাক্ষুষ বিবরণও এক বন্ধু আমাদিগকে দিয়াছেন। "লিপিকারগণ বসিয়া গিয়াছে—মধুসূদন একবার ইহার দিকে, একবার উহার দিকে চাহিয়া বলিয়া যাইতেছেন।" রচনা-প্রণালীর মধ্যেও বোধ করি কিঞ্চিৎ বিশিষ্টতা আছে।

তিলোত্তমাসম্ভবের ভিতরের কথাটা বাঙ্গলার সাহিত্য-সেবিগণের জ্ঞাতব্য হইয়া আছে। এই কাব্যে মধুসূদন ইংলণ্ডের কীট্‌স্ এবং ভারতের কালিদাসের ন্যায় নিখুঁত সৌন্দর্য-তত্ত্বের কবি। মধুসূদনের মধ্যে গ্রীক এবং ভারতীয় সৌন্দর্যবাদ সম্মিলিত হইয়াই অপরূপ মধু-মূর্তি ধারণ করিয়াছে। এ সৌন্দর্য একেবারে আত্মজাগ্রত বা self-conscious হয় নাই; সচেতন হইয়া দার্শনিকতা লাভ করিলে উহার কি মূর্তি হইত, তাহা চিরকালের জন্য সহৃদয়গণের চিন্তাস্থলী হইয়া আছে। কবি কীট্‌সের Endymion-এর ন্যায় উহা নিখুঁত সৌন্দর্যমুগ্ধ এবং ভাবুকতাময়ী মহাবাণীর আত্মসিদ্ধ প্রকাশের শক্তিতেই সমৃদ্ধিময় হৃদয়খানি লইয়া বঙ্গসাহিত্যের আসরে নামিয়াছিল—এখনও অসঙ্গ মাহাত্ম্যেই দাঁড়াইয়া আছে। উহার প্রকৃত কোনও উত্তরাধিকারী বঙ্গসাহিত্যে জন্মে নাই। কেবল হেমচন্দ্র যে উহার দেবাসুর-দ্বন্দ্বের চরিত্রকে বৃত্রসংহারে অনুসরণ করিয়াছিলেন, তাঁহার ইন্দ্র এবং শচী-চরিত্রের গুণ-বর্ণ-ধর্ম যে তিলোত্তমাসম্ভব হইতেই লাভ করিয়াছেন, তাহাই পরিস্ফুটভাবে দেখিতেছি। তিলোত্তমার পরিণাম সর্গ — উহার চতুর্থ সর্গ—যেন আকস্মিকভাবেই সমাপ্তি লাভ করিয়াছে! কবি যেন অতি মহিমান্বিত উপক্রম করিয়াই, অত্যন্ত তাড়াতাড়িতে, ভয়ে-ভয়েই গান বন্ধ করিয়াছেন। এই দোষে তিলোত্তমাসম্ভব সহৃদয়ের চক্ষে অপরাধী হইয়া আছে। কিন্তু উহার পূর্বার্ধ কি মহনীয় শক্তি-প্রাগল্‌ভ্য এবং সৌন্দর্যমত্ততায় উল্লসিত! উহার ভাষা ও ছন্দের

দুর্বৃত্ততা এবং দৌরাত্ম্যগুলির মধ্যে পর্যন্ত বিশিষ্টতা আছে। তিলোত্তমাসম্ভব স্বনামধন্যভাবেই নব্য বঙ্গ-সাহিত্যের উজ্জ্বল ভবিষ্যকীর্তির নান্দীময় মহাসঙ্গীত! সাহিত্যরসিকের এবং ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতেও উহা অমূল্য।

তিলোত্তমাসম্ভব সৌন্দর্যমুগ্ধ কবির প্রথম কাব্য। মধুসূদন চিরজীবন সৌন্দর্যের 'অঙ্গনা' তত্ত্বে এবং উহার অঙ্গনা মূর্তিতেই মুগ্ধ। তাঁহার সৌন্দর্য রূপসী-মূর্তি ধারণ করিয়াছে। সৌন্দর্যের পুরুষমূর্তি—ইন্দ্র বা সুন্দ উপসুন্দের মূর্তি, জগৎসিংহ, ইন্দ্রনীল, যযাতি বা শ্যামসুন্দরের মূর্তিও মধুসূদনের নিকট প্রকৃত প্রস্তাবে তত বরেণ্য কিংবা হৃদ্য নহে। আপন চরিত্রের প্রবল আন্তরিক ধর্মে, সাংসারিক ঝটিকাবর্তে ঘূর্ণ্যমান মধুসূদনের প্রকৃত স্বধর্মে কেবল রাবণচরিত্রই কবির ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। নতুবা সৌন্দর্যের স্ত্রীমূর্তিই কবি-হৃদয়ের সমগ্র অর্চনা এবং অনুসাধনা লাভ করিয়াছে। শর্মিষ্ঠা, পদ্মাবতী, তিলোত্তমা, প্রমীলা, রাধা এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের বহুরূপবতী সুন্দরীসংঘ—ইহারা মধু-আত্মার আনন্দ-সম্ভারময়ী প্রেয়সী। রাবণ ও ইন্দ্রজিৎ ব্যতীত তাঁহার কাব্যের পুরুষগণ এই সমস্ত নারী-শ্রীময়ী সৌন্দর্যলতার এক একটি আশ্রয় বা 'সহকার' ব্যতীত আর কিছুই নহে। কবির সৌন্দর্য-বুদ্ধির এই স্ত্রী-পক্ষপাত না বুঝিলে কবিকে কোন দিকে ভালরূপে বোঝা হইবে না।

তিলোত্তমা কাব্যের মূলরহস্য কি? উহার মধ্যে কবি সর্বপ্রথম আপন কবিত্বে সচেতন হইয়াছেন। সৌন্দর্যের সম্ভব বা জন্মগান করিয়াছেন। বিশ্বের সমস্ত সুন্দর পদার্থ হইতে তিল তিল সংগ্রহ করিয়া এই যে বিশ্ববিজয়িনী মূর্তি দাঁড়াইয়া গেল—যাহা পৌরাণিক কবির অতুলনীয় পরিকল্পনার নিদর্শন-রূপে জ্যোতির্ময়ী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, উহার দিকেই নবজাগ্রত কবি-আত্মার প্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট না হইয়া পারে না। অন্য কবি জগতের সৃষ্টিতত্ত্ব গাইতে পারেন, কিন্তু নব্যবঙ্গের এই নবপ্রবুদ্ধ আদি-কবি সৌন্দর্যের সৃষ্টিতত্ত্ব, উহার সম্ভব তত্ত্বই গ্রহণ না করিয়া পারেন নাই। কীট্‌স্ কবির প্রথম গ্রন্থ Endymion প্রথম পংক্তিতেই গাহিয়াছে—

A thing of beauty is a joy for ever!

আনন্দ—চিরানন্দ দান করাই সৌন্দর্যের সর্বপ্রথম, সর্ব উত্তম এবং সর্ববলীয়ান কার্য। কীট্‌স্ সৌন্দর্যের অন্যসমস্ত দিক্ গৌণ করিয়াই, নিজের হৃদয়ে কেবল ঐ আনন্দ-মূর্তির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার কাব্যাদিতে কেবল ঐ মূর্তিরই অনুভব এবং নানামুখী ধ্যানধারণা করিয়াছেন। Endymion-এর শত সহস্র দোষ সত্ত্বেও, উহা কেবল বিশ্বসৌন্দর্যের বস্তুনিষ্ঠ অথচ ভাবগত অনুভূতি, সম্ভোগ এবং স্তুতিগানেই আপনাকে পাঠকের আনন্দ-রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে ; রোমান্টিক শিল্প-কবিতার অনাবিল প্রতিমা এবং প্রমূর্তি-রূপেই আত্মপ্রতিষ্ঠা করিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভবও কেবল নিব্যূ´ঢ় (absolute) সৌন্দর্যবিলাস এবং সৌন্দর্য-মন্দিরের আরতিরূপেই আপনাকে পাঠকের হৃদয়-সন্নিকটে আনিয়াই আত্মপরিচয় করিতেছে। যে এই তত্ত্ব না বুঝিল সে বঙ্গে রোমান্টিক কবিতার আদিগ্রন্থ তিলোত্তমাসম্ভবকেও চিনিল না।

এই কাব্যের মধ্যে প্রথম পংক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া যে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের এবং যে কাল্পনিক নিসর্গসৌন্দর্যের দিব্যোন্মাদময় বিলাস আছে, গ্রন্থের ঘটনাচক্রকে একরূপ চাপা দিয়াই যাহা উদ্দাম হইয়া গিয়াছে, তাহা তিলোত্তমা নায়িকারই অপরিহার্য অঙ্গ। ঐ সমস্তকে বাদ দিলে 'তিলোত্তমা' সুন্দরীর 'সম্ভব'ই যেন অসম্ভব হইয়া পড়ে। তারপর, সুন্দরীকে অধিকার করার জন্য সেই সুন্দ-উপসুন্দের যুদ্ধ ; উহাও তো অপরিহার্য। তথাপি, কবি ঐ ধ্বংসতত্ত্বকে যথাসাধ্য গৌণ করিতে, একরূপ চাপা দিতেই চাহিয়াছেন। এইরূপ "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"-জাতীয় সুন্দরী, ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে, সংসার ধ্বংস করে ; চিরকাল মানুষের আসুর-ধর্ম উত্তেজিত করিয়া তাহাকে অপরিহার্যভাবে বিবাদ-বিগ্রহ এবং মৃত্যুপথেই লইয়া যায় ; দেবধর্মী ব্যক্তিরাও অতিকষ্টে তাহাকে একান্তভাবে অধিকার করিবার প্রলোভনটি এড়াইতে পারেন। তাহাকে বধূত্ব এবং বধূধর্ম গ্রহণ করিতেই হইবে—না করিলে সমাজ হইতে তাহার নির্বাসন! কবি মধুসূদনও কাব্যশেষে তিলোত্তমাকে সূর্য-লোকেই পাঠাইয়া দিয়াছেন। ঐ সৌন্দর্য প্রত্যক্ষ দেখার তো উপায়

নাই—উহাতে সংসার ও সমাজ দগ্ধ করিবে। বাস্তবিক তিলোত্তমার রূপ সূর্যমণ্ডলনিবাসিনী দেবতারই যেন ঘনরূপ। সবিতা হইতেই বিশ্বসংসারের সৃষ্টি হইয়া, তাঁহার সৌন্দর্যেই বিশ্বসংসার বর্ণ-রূপ-রসে 'সুন্দর' হইয়া আসিয়াছে। বিশ্বসংসার হইতে তিল তিল করিয়া পুনর্বার যে সৌন্দর্য মূর্তরূপে ঘনীভূত হয় সেই মূর্তি প্রকৃত প্রস্তাবে কাহার? সংসার উহাকে কেবল প্রতিবিম্ব ব্যতীত দেখিবার শক্তি রাখে না। সুতরাং এখন এই 'সুন্দর'-বিশ্বমধ্যে আমরা সেই সূর্যমণ্ডলনিবাসিনী তিলোত্তমার বিম্ব-প্রতিবিম্ব এবং অনুবিম্ব মাত্রই দেখিতেছি।

আমরা জানি, পরকালে বঙ্গের অপর একজন বড় কবি, ইউরোপীয় বিশেষতঃ ফরাসী সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের শিষ্যতায় এই "নহ মাতা, নহ কন্যা, নহ বধূ"-প্রকৃতির সৌন্দর্য-মূর্তিই একটি ক্ষুদ্র কবিতায় দর্শন করিয়াছেন। শীলারের Pan is dead নামক কবিতার পথে দর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া, উক্ত কবিতার শেষ শ্লোকে "ফিরিবে না ফিরিবে না—অস্ত গেছে সে গৌরবশশী" ইত্যাদি রূপ অনুশোচনাও ছিল। এখন সেই অস্তমিত মাহাত্ম্যের অনুশোচনা পরিহৃত হইয়াছে। কবি পরে উর্বশীকে চিরগৌরবশালিনী, চিরযৌবনা এবং চির-শক্তিময়ী রমণীমূর্তিতেই স্থির করিয়াছেন। কবি ব্যারেট ব্রাউনিং Pan is not dead কবিতায়, এবং রোদন নোল Pan কবিতায় শীলারের ভাব-দৃষ্টির ভ্রম নিরাস করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। বলিতে কি, বিলাতী কোন কবির কোন পরিকল্পনাই পরিস্ফুট মূর্তিমত্তায় কিংবা দার্শনিক এবং নৈতিক শক্তিমত্তায় এ দেশের প্রাচীন পৌরাণিক কবির তিলোত্তমা-সৃষ্টির সমকক্ষ নহে। মধুসূদন নব্য-বঙ্গসাহিত্যের উষামুহূর্তে সকল শিল্প এবং সৌন্দর্য-বিজ্ঞানের পূজাগৌরবশালিনী ঐ 'মানস-সুন্দরী'কেই তিলোত্তমাসম্ভবে ধারণা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন।

উহার পরেই মেঘনাদ। মেঘনাদবধের বস্তু আলোচনা করিব না। উহা এখনও বঙ্গসাহিত্যে একটা প্রথম শ্রেণীর কাব্যরূপে, এবং অনেকের দৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠ

কাব্যরূপেই আদৃত। উহার মাহাত্ম্য আমাদের সাহিত্যে কখনও ক্ষীণ হইবে বলিয়াও মনে করিতে পারি না। তবে উহার কাব্যতা এবং শিল্প-সমাধান বিষয়ে নানাদিক হইতে নানাভাবের আলোচনা হইয়াছে। কাব্যকে কবির সম্পর্কে আনিয়া দৃষ্টি করিতে না পারিলে সমালোচনামাত্রেই ভ্রম ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে। কবির প্রতি পাঠকের প্রধান অবিচারগুলি প্রায়ই এই দিক হইতে, সহযোগী অনুভূতির অভাব হইতেই ঘটিয়া থাকে। আমরা মেঘনাদকে কবির মর্মসম্পর্কে আনিয়া, উহার উদ্ভবস্থান হইতে দৃষ্টি করিয়া এই সম্ভাবনা পরিহার করিতে এবং মেঘনাদ কাব্যের হৃদয় বুঝিতে চেষ্টা করিব।

বঙ্গসাহিত্যে প্রকৃত প্রস্তাবে চারিটি বৎসর মাত্র মধুসূদনের কার্য। ১৮৫৮ সালে উহার আরম্ভ এবং ১৮৬২ সালে বিলাত গমনের সঙ্গে সঙ্গেই উহার শেষ। বিলাতে থাকিয়াও মধু অবশ্য 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' রচনা করিয়াছেন, এবং বিলাত হইতে ফিরিয়া অর্থাগমের দুরাশায় বিদ্যালয়পাঠ্য হেক্টরবধ ও নীতি কবিতাবলী রচনা করেন। তদ্ব্যতীত 'মায়াকানন' নামক একটি অসম্পূর্ণ নাটক এবং বহু ক্ষুদ্র কবিতা, কাব্য এবং নাটকের অসম্পূর্ণ চেষ্টা, নক্সা এবং পাণ্ডুলিপির ভগ্নাংশই আমাদের হাতে আসিয়াছে। তিলোত্তমাসম্ভব রচনার পর বন্ধু রাজ-নারায়ণ জাতীয় ভাবের দিকে মধুসূদনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালীর সিংহলবিজয় ঘটনাটি এ যাবৎ কাব্য সাহিত্যে একেবারে পরামৃষ্ট হয় নাই। শক্তিশালী বঙ্গকবির পক্ষে ঐ দিকে একটা গুপ্ত সোনার খনি আছে—যে অধিকার করিতে পারে উহা তাহারই। মধুসূদনের জন্য তথ্য যোগাইবার উদ্দেশ্যে পণ্ডিত রাজনারায়ণ 'সিংহল বিজয়ের' একটা ছোটখাট নক্সাও প্রস্তুত করিয়া দেন; মধুসূদন নিজেও একটি হাত নক্সা প্রস্তুত করেন। কিন্তু মধুসূদন অধ্যাত্মতঃ তখনো 'সিংহলবিজয়' গান করিবার জন্য নিজকে প্রস্তুত বলিয়া মনে করিতে পারেন নাই। এ বিষয়ে কবির পত্রখানি কবিজীবনের অন্তঃপুরে প্রবল আলোকপাত করে। আমরা উহার কিয়দংশ উদ্ধৃত করিব। ফলতঃ মধু কবিকে বুঝিতে হইলে তাঁহার পত্রগুলির সাহায্যেই বুঝিতে হইবে। বাঙ্গালী পাঠক এবং বঙ্গের

সাহিত্যসেবী মাত্রেই মধুস্থদনের পত্রাবলী হইতে কবির শিল্প-আদর্শে এবং জীবনের আদর্শ বিষয়ে নবনব সত্যের জ্ঞানলাভ করিতে পারেন। এই ক্ষেত্রে সাহিত্যের আদর্শ বিষয়ে একজন সজীব এবং সমর্থ শিল্পীর মুখে যে সত্যজ্ঞান লাভ করিতে পারিবেন, অন্যত্র তাহার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। শিল্পী তাঁহার নিজের কলা-বিভাগের ক্ষেত্রে কি পরিমাণে আমাদের শিক্ষক ও পরিচালক হইতে পারেন? সাহিত্যের পাঠকমাত্রের নিকট ঐ প্রাপ্তি মহার্ঘ না হইয়া পারে না; এবং কবিজীবনীর ক্ষেত্রে উহা অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞাতব্য বিষয়ও নাই। 'জীবনী'-লেখক ও 'মধুস্মৃতি'-লেখক মধুস্থদনের অনেক পত্র সংগ্রহ করিয়া দিয়াছেন, নিজেরা সকল দিকে উহাদের সদ্ব্যবহার করিতে পারেন নাই—তাঁহাদের পক্ষে হয়তো আবশ্যকও ছিল না। মধু রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন—"কথা হইতেছে, তিলোত্তমাসম্ভব যে ছন্দে রচিত হইয়াছে তাহা কয়জন পড়িতে জানিবে? দুঃখের বিষয় তুমি কলিকাতায় নাই—তোমাকে পাইলে এ বিষয়ে কয়েকটি বক্তৃতা না দেওয়াইয়া ছাড়িতাম না।" আবার ** "আমাদের সাহিত্যে অমিত্রচ্ছন্দের মাহাত্ম্য বুঝিতে আর বিলম্ব নাই, কেবল বিরাম চিহ্নগুলির দিকে দৃষ্টি রাখিয়াই পড়িতে শেখ, তখনই বুঝিবে, উহা বঙ্গসাহিত্যে সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ছন্দ।" "তবে, আমার আশঙ্কা হইতেছে তুমি উহার বাক্যরীতি কঠিন বলিয়াই মনে করিবে। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি কখনও জবরদস্ত হইবার জন্য চেষ্টাই করি না। শব্দগুলি অযাচিতভাবে, যেন স্রোতেই ভাসিয়া আসে—উহাকে 'অন্তরাদেশ' নাম দিতে পারি। প্রকৃত অমিত্রচ্ছন্দকে ধ্বনিগৌরবেই মনুষ্যচিত্ত আকর্ষণ করা চাই এবং অমিত্রচ্ছন্দের শ্রেষ্ঠ কবি যিনি তাঁহাকে সর্বাপেক্ষা "কঠিন" কবি বলিয়াও নির্দেশ করা যায়—মিল্‌টনকেই লক্ষ্য করিতেছি। ভার্জিল বা হোমার—সোজা কবি বলিতে যাহা বুঝায়, ইঁহাদের কেহই তাহা নহেন। যাহাই হোক, আমি এক প্রকার খেলায়-খেলায় তিলোত্তমা গ্রহণ করিয়াছিলাম! এখন দেখি, উহাতে এমন কিছু করিয়া বসিয়াছি, যাহাতে আমাদের কাব্য-সাহিত্যকে উন্নতির দিকে একটা প্রবল প্রেরণাই দিতে পারে! অন্ততঃ উহা ভবিষ্যতের বঙ্গকবিগণকে

কৃষ্ণনগরের সেই ব্যক্তিটার [ভারতচন্দ্র] কণ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক একটা সুরই শিক্ষা দিবে। তিনি এদেশে একটা জঘন্য রকমের কাব্য-প্রণালীরই জন্মদাতা, যদিও তাঁহার সুন্দর প্রতিভা ছিল।"

অমিত্রচ্ছন্দের স্বরূপ ও মাহাত্ম্য বিষয়ে অনেক ভ্রম যে তৎকালে ছিল এবং এখনও আছে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। বাঙ্গলার ছন্দমাত্রের বিশেষতঃ অমিত্র-চ্ছন্দের শক্তি কোথায়? কেবল অক্ষরের সংখ্যা অথবা মাত্রার মধ্যে নহে। যেমন হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের এবং সবল ও দুর্বল উচ্চারণের প্রবহনার মধ্যে, তেমন বিরাম-যতির প্রয়োগ মধ্যেই অমিত্রচ্ছন্দের প্রধান শক্তি। অমিত্রাক্ষরছন্দে বিরামের কোন অনুল্লঙ্ঘ্য নিয়ম নাই বলিয়া সুনিপুণ কবির হস্তে উহা মহাশক্তি রূপে পরিণত হইতে পারে। উহার গতিকেই কবিগণ আপন হৃদয়ের ভাবচ্ছন্দের সমতালে ভাষাকে ছুটাইয়া দিতে পারেন। অধিকন্তু, অমিত্রচ্ছন্দে দাঁড়াইলেই সহজে বুঝা যায় কে কবি, কে অকবি। তিনি হৃদয়ের ভাবকে বাক্যচ্ছন্দে আকারিত করার প্রাথমিক শক্তিটুকুই পাইয়াছেন কি? তাঁহার অন্তরাত্মার মধ্যেই ছন্দ এবং সঙ্গীত আছে কি? কবিত্বশক্তির প্রাথমিক পরীক্ষার মাপকাঠিটুকু এই প্রশ্নের মধ্যেই আছে! কিন্তু মিত্রাক্ষরের ক্ষেত্রে উহার 'বাঁধাগৎ' গতিকেই হয়তো এরূপ পরীক্ষার তত সুযোগ নাই। হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণের স্থানিক বিনিয়োগ এবং বিরামযতির প্রয়োগ মধ্যেই যেমন মধুচ্ছন্দের প্রধান শক্তিরহস্যটিই মিলিবে, তেমন মধুসূদনের রচনায় সংস্কৃত শব্দবাহুল্যের রহস্যটিও এস্থানেই মিলিবে। প্রাকৃত বাঙ্গলাশব্দ অধিকাংশেই কেবল লঘুগুরুভেদবিহীন এবং উচ্চারণের মানমর্যাদার স্থিরতাহীন বর্ণসমষ্টি ব্যতীত আর কিছুই নহে; অনেক স্থলে বর্ণসমূহ যেন কেবল আত্মহারাভাবে অসংযুক্ত এবং অসংশ্লিষ্ট খেয়ালের স্বেচ্ছাচারেই দাঁড়াইয়া যায়। অদ্বিতীয় ছন্দকবি মধুসূদন প্রাকৃত বাঙ্গলার অরাজক এবং একাকার রাজ্যে কেন যে অধিক পাদচারণা করিতে চাহেন নাই, পরন্তু, বর্ণগৌরবময় আর্যশব্দের বনিয়াদী ক্ষেত্রে বরঞ্চ অতিরিক্ততা দেখাইতেও ভালবাসিয়াছেন, তাহার রহস্যও এস্থানেই মিলিবে। মধুসূদনের এই ঝোঁক এবং অমিত্রচ্ছন্দের ঐ শক্তি অনেকেই তৎকালে বুঝিতে পারেন নাই।

অন্যে পরে কা কথা, স্বয়ং কবি হেমচন্দ্রও মধুচ্ছন্দের বিরাম-যতির পদ্ধতি বুঝিতে গিয়া প্রমাদের বশবর্তী হইয়াছিলেন। মেঘনাদের ভূমিকায় হেমচন্দ্র মধুসূদনের সেই—

একাকিনী শোকাকুলা অশোক কাননে
কাঁদেন রাঘব-বাঞ্ছা আঁধার কুটীরে
নীরবে—

প্রভৃতিতে শেষ পদের বিরতির মাহাত্ম্যটুকু প্রকৃত প্রস্তাবে না বুঝিয়া উহাকে 'ছন্দোদোষ'-রূপে নির্দেশ করিয়াছেন। ঐ স্বাধীনচরণা যতির মধ্যেই যে অমিত্রাক্ষরের প্রধান ছন্দ। উহার সঙ্গীত-অধিবাসী আত্মা এবং আত্মার অধিবাসী সঙ্গীত। অমিত্রচ্ছন্দ সকল ছন্দের অন্তর্নিবাসী অব্যক্ত আদ্যচ্ছন্দ, আর্যাশক্তি এবং আদ্যা শক্তি।

মধুসূদন যে কবিজীবনে কেবল "স্রোতের ফুল" ছিলেন না, তিনি কেবল অর্ধ-জাগরিত ভাবুকতার ঝোঁকেই কাব্যকবিতার লীলাখেলা করিয়া চলিতে-ছিলেন না, তিনি যে একজন সতর্কশিল্পী এবং বাণীসাধক ছিলেন, নিম্নের পত্রাংশে তাহার প্রমাণ আছে। বলিয়া আসিয়াছি, বন্ধু রাজনারায়ণ ক্ষমতাশালী মধুসূদনকে স্বাদেশিকতা এবং জাতীয়তার ক্ষেত্রে লেখণী গ্রহণ করিতে অনুরোধ করেন; এবং বাঙ্গালী কর্তৃক সিংহলবিজয়ের ইতিহাসের মধ্যে যে তদনুরূপ রস-ভূমি আছে তাহার দিকেও কবির দৃষ্টি জাগরিত করিতে চেষ্টা করেন। প্রত্যুত্তরে মধুসূদন লিখিয়াছিলেন—"আমি আরও ৩।৪ টি 'ক্লাসিক' আদর্শের নাটক রচনা করিয়া যাইতে ইচ্ছা করি, যাহাতে আমার দেশবাসী বুঝিতে পারে উন্নত নাট্য-সাহিত্য কাহাকে বলা যায়। উহার পরেই ঐতিহাসিক এবং অন্য বিষয়ে হাত দিব। তুমি 'জাতীয় কাব্য' রচনার পক্ষে যে বিষয়টির দিকে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলে, বলিতে পারি, উহা সুন্দর, অতিসুন্দর! কিন্তু আমার এখনো সন্দেহ আছে, উহাকে গ্রহণ করার উপযোগী শিল্পশক্তি আমার জন্মিয়াছে কি না। তোমাকে আরো কয়েকটি বৎসর অপেক্ষা করিতে হইতেছে। ইহার

মধ্যে, আমি আমার প্রিয়বর ইন্দ্রজিতের মৃত্যুগান করিতে যাইতেছি। ভয় নাই বন্ধু, আমি পাঠকবর্গকে 'বীররসে আক্রান্ত' করিতে যাইব না। আমাকে এরূপ আরও কয়েকটি কাব্য রচনা করিতে দাও, আমার হাত পাকা হউক।" এই পত্রে সতর্কশিল্পী কবির আশা, অভিসন্ধি এবং তাঁহার সাহিত্য-আদর্শের গুপ্ততম প্রকোষ্ঠ পর্যন্ত দেখা যাইতেছে। সকল অসম্পূর্ণ প্রযত্নের মূলও দেখা যাইতেছে। এইরূপে মেঘনাদের অন্তরঙ্গ তত্ত্ববিষয়ে আর একটি পত্র—

"আমার ইচ্ছা, গ্রীক দেবতা-পুরাণের সৌন্দর্যগুলি আমাদের প্রাচীন পৌরাণিকতার সঙ্গে মিলাইয়া দিব। এই মেঘনাদ কাব্যে কল্পনা শক্তিকে অবাধে ছুটাইতে চাই এবং বাল্মীকির সাহায্যও যতদূর পারি পরিহার করিতেই চাই। তবে ভয় নাই! একেবারে 'অহিন্দু কাব্য' হওয়ার মত তেমন কিছু করা হইবে না। আমি গ্রীক পুরাণের গল্পবস্তুগুলির অবস্থা এবং উদ্দেশ্যটুকুই ধার করিব এবং একজন গ্রীক, প্রকৃত গ্রীক যেভাবে লিখিতে পারে, তাহারই অনুসরণ চেষ্টা করিব।" মেঘনাদে পাশ্চাত্ত্য কবিগণের—যেমন হোমার, তেমনি ভাজিল, ট্যাসো, দান্তে এবং মিল্টন প্রভৃতির কাব্যসমূহের অবস্থা-বস্তু কোন্ সূত্রে আসিয়া গিয়াছে, এস্থানে তাহারই আভাস পাইতেছি।

তারপর, কাব্যসৃষ্টির অন্তরঙ্গীয় প্রধান কথা সহানুভূতি—কবির নিজের সহানুভূতি এবং অন্তরঙ্গ-প্রীতি কাব্যের কোন্ পক্ষের দিকে থাকিবে? কবি-চর্যার অন্তর্দেশে, কবির ভাবুকতার অন্তরঙ্গেই কোন-না-কোন একটা বিশেষ প্রীতি এবং ভাবাভিসন্ধির ঝোঁক না থাকিয়া পারে না। কবি যতই নিরপেক্ষ বা নিঃসম্পর্ক ভাবুকতায় বিজাতীয় বিভিন্ন বর্ণধর্মের চরিত্র অঙ্কন করুন না কেন, যতই বৈচিত্র্যমুখর সুর-তাল-ছন্দ-ভাব কিংবা রসের ক্ষেত্রে বিহার করিতে থাকুন না কেন, তাঁহার একটা-না-একটা বিশেষ-গুপ্ত হৃদ্য-বস্তু, একটা অন্তঃসংজ্ঞ-প্রিয়তার টান, প্রীতি-পক্ষপাত এবং অন্তরঙ্গ সহানুভূতির একটা ভাব-বন্ধন আছেই আছে। এই সূক্ষ্ম ভাব-যোগটাই তাঁহার কাব্য-চক্রের কেন্দ্র, প্রয়োগরীতির দিক্-দর্শনী এবং অন্তর্গুপ্ত পরিচালনীরূপে তাঁহার সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করিতে থাকে। মেঘনাদের

দৃষ্টিতে উহার স্রষ্টার পক্ষে এই সূক্ষ্ম ভাবযোগ, উহার প্রাণ-পরিচালনী প্রীতিযোগ কোন্ দিকে—কোন্ পক্ষে ছিল? নিম্নের পত্রাংশে দেখিব, মেঘনাদবধ রচনার প্রবেশপথেই মধুসূদনের সমক্ষে কত বড় একটা সমস্যা, কত বড় একটা সংকট ছিল! এমন পথসংকট যে, কবিকে একটি পথ অবলম্বন করিতেই হইবে; এবং ঐ নির্বাচন হইতে সেই মুহূর্তে সমগ্র কাব্যটির বর্ণ-চরিত্র-আত্মা এবং অদৃষ্টলিপি অপরিহার্যভাবেই স্থির হইয়া যাইবে।

মধু লিখিয়াছিলেন, "কবিগুরু যদি তাঁহার রামচন্দ্রকে কেবল কতকগুলি মনুষ্য-অনুচর দিতেন, তাহা হইলে আমি মেঘনাদকে আর্যজয়ের ইলিয়ড্ রূপে পরিণত করিতে পারিতাম।" মধুসূদন কাব্যের গঠন এবং রসনিষ্পত্তির অনুরোধে কিরূপে বিজিত পক্ষের সঙ্গে—রাক্ষস-পক্ষের সঙ্গেই সহানুভূতি করিবার পথে পরিচালিত হইয়াছিলেন, এই স্থলে আমরা তাহাই দেখিতেছি। ইলিয়ডে হোমারের রস-নিষ্পাদনী সহানুভূতি স্বাজাত্যের-সূত্রে বিজয়ী গ্রীকপক্ষের দিকে ছিল—মধুসূদন সেই সূত্র পাইলেন না। সুতরাং, তিনি হোমারের অনুসরণ করিয়াও ইলিয়ডের শিল্পাত্মার গুপ্ত রসাভিসন্ধি অনুসরণ করিতে পারিলেন না। হৃদয় দিয়া, প্রাণমনের উচ্ছ্বাসে ভর করিয়া আর্যের জয়গান করিতে পারা গেল না; কেন না, কল্পনার উল্লাসের জন্য ঐশ্বর্যবস্তুর অবলম্বনটি তিনি মেঘনাদ-কাব্যের বিজয়ী পক্ষের মধ্যে খুঁজিয়াই পাইলেন না। ঐশ্বর্যরস-বিলাসী কবি রামচন্দ্রের 'বানর-চমূর' মধ্যে তাঁহার হৃদয়রাণী, ঐশ্বর্যমহিমাময়ী এবং 'ভিখারী রাঘবের' প্রতি তীব্র অবজ্ঞাময়ী প্রমীলাকেই বা কোথায় পাইবেন? আর 'রত্নসৌধকিরীটিনী' লঙ্কাপুরীর প্রতি পরম উচ্ছ্বাসী প্রীতি-সহানুভূতির সূত্রটুকুই বা কি করিয়া অক্ষুণ্ণ রাখিবেন? ঐশ্বর্যের উচ্চশিখর না দেখাইয়া, দুর্দশাগহ্বরে উহার অধঃপাত অথবা নিয়তির বজ্রনিপাতের দৃশ্যেই বা কি করিয়া মানুষের চিত্ত দ্রবীভূত করিবেন? মহত্ত্ব এবং বীর্য-বিভূতির ছবি অঙ্কনপূর্বক প্রথমতঃ মানুষের হৃদয়কে উহার প্রতি অনুগত না করিয়া কিরূপেই বা পরে দুরদৃষ্টে করুণাবিষ্ট অথবা সহানুভূতিতে বিগলিত করিবেন? "এ হেন সভায় বসি লঙ্কা-অধিপতি, বাক্যহীন

পুত্রশোকে”—এই অবস্থা এবং ঘটনার কারুণ্যমূর্তি ও প্রয়োগের রসাত্মাটুকুই বা কি করিয়া উপপন্ন হইত? পরিশেষে, ইন্দ্রজয়ী ‘মেঘনাদ-স্বামীর’ শ্মশান-দৃশ্যে সেই মহিমাময়ী প্রমীলাকেই একেবারে সহ-মরণে লইয়া আসিয়া, ত্রিলোকের ঐশ্বর্য-রাজা এবং ত্রিভুবনজয়ী ‘রাবণ-শ্বশুরকে’ “ধবল বস্ত্র ধবল উত্তরী—ধুতুরার মালা যথা ধূর্জটীর গলে” পরাইয়া—তাহাকে শোকে যোগী এবং ‘ভিখারী’ সাজাইয়াই যে মহাদৃশ্য অঙ্কিত করিয়াছেন, তাহাই বা কি করিয়া দাঁড়াইত? অদৃষ্টযন্ত্রে নিষ্পীড়িত এবং ঘনীভূত অশ্রুর সেই বিশুভ্র মর্মর-মূর্তি—রাবণটি কিরূপে আমাদের মনোদৃষ্টি সমক্ষে এমন উজ্জ্বল এবং অমার্জনীয় হইয়া দাঁড়াইত! তারপর, অন্তিমের সেই “সপ্ত দিবানিশি লঙ্কা কাঁদিলা বিষাদে” আমাদিগকে যে একটি অশেষ দীর্ঘনিঃশ্বাসে রাখিয়া গিয়াছে, আমাদের নিত্যকালের দীর্ঘনিঃশ্বাসবাসিনী সেই ‘সৌধকিরীটিনী’ই বা কোথায় থাকিত? অপর একটি পত্রেও কবির সহানুভূতির এই নিদারুণ বিঘটনা স্বয়ং প্রকাশিত হইয়া পড়িয়াছে—“ইন্দ্রজিতের মৃত্যু এবং রাক্ষসরাজের অধঃপতন বর্ণনা করিতে আমাকে অনেক চোখের জল ফেলিতে হইল।” আবার অন্যত্র “ইন্দ্রজিতের জন্য আমার বড়ই প্রাণ কাঁদে, একজন প্রকৃত মহচ্চরিত্র বীরপুরুষ! He would have kicked the monkey army into the sea, but for that scoundrel Bibhishan!” আবার অন্যস্থলে “Ravan fires me with enthusiasm! I despise Rama and his rabble.” আর অধিক উদ্ধৃত করিবার আবশ্যক আছে কি? এই নির্মল সার্সীগুলির ভিতর দিয়া কি কবি-মর্মের কারখানার সকল কৌশল এবং কল্‌-কব্‌জা পর্যন্ত দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। তিলোত্তমাসম্ভবে ‘মনুষ্য-রস’ ছিল না; পরের কাব্যে উহা আনিতে হইবে। প্রচণ্ডতাধর্মী কবিকে আপন হৃদয়ের রসধর্মের বাধ্য হইয়াই রাক্ষসরাজের সহিত সুতরাং সহমর্মী হইতে হইয়াছিল। উহাতেই সিংহলবিজয়কে পাশে রাখিয়া ‘মেঘনাদবধ’-এর বিষয় নির্বাচন। পরন্তু, যে শক্তি তাঁহার জীবনের দেবী, তিনিই কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে বিষয় নির্বাচনে এবং গন্তব্যপথে বাধ্য করিলেন। আর রাবণটিই বা কে? প্রকৃত

প্রস্তাবে কবি মধুসূদন নহে কি? দুঃখের অপরিহার্য পাশবন্ধনের মধ্যে পড়িয়া, নিয়তির করাল কবলে পড়িয়া যে মানবাত্মা ছট্‌ফট্ করিতেছিল, সংসারে যাহার আর রক্ষা-সহায় ছিল না, যে পতঙ্গ তথাপি প্রাণ থাকিতে নিজের অগ্নিশিখা-রূপিণী আশাকেও ছাড়িতে পারিতেছিল না, যে জীব প্রকৃত প্রস্তাবে আপন মাৎসর্য-গর্বের দীপ্তশিখাতেই ধীরে ধীরে পুড়িয়া পুড়িয়া ছাই হইতেছিল! মধুসূদনের "আত্ম-বিলাপ" কবিতাটির শিরোনামা একেবারে মুছিয়া ফেলিয়া "রাবণের বিলাপ" নাম দাও। উহা যেমন মধুসূদনের মর্ম-বাণী তেমন রাবণেরও মর্মবাণী। সুতরাং, এই কবির অধ্যাত্ম সহানুভূতি প্রকৃত স্বধর্মেই কোন্ পথে যাইতে পারে? কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিতে পারে? এবং অধ্যাত্ম সহানুভূতি ব্যতীত কোনও কাব্যের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইতে পারে কি? স্বয়ং না কাঁদিয়াও পরকে প্রকৃত কাঁদাইতে পারা যায় কি? বুদ্ধি-তন্ত্রের কবির পক্ষে স্বতন্ত্র কথা—কিন্তু মধুর ন্যায় সরলদৃষ্টি এবং ভাবপ্রবণ কবির পক্ষে, মেঘনাদের মতন ভাব-প্রাণ এবং রসানন্দ-ধর্মী মহাকাব্য-রচনায় প্রীতি উদ্রেক না করিয়া সহানুভূতির উদ্রেক করিতে, অথবা কেবল সহানুভূতি জাগাইয়া প্রীতিকে ঘুম পাড়াইতে সাহিত্যক্ষেত্রে সম্ভব কি? মেঘনাদকাব্যের—বলিতে কি—মধুর সকল কাব্যের প্রাণই উহাদের অকপট ভাবুকতা, ভাবজীবী রস-ধর্ম এবং রসবত্তার মধ্যেই নিহিত আছে।

তারপর, প্রসঙ্গাধীন কবিগুরু বাল্মীকির দিকটাও একবার এ-স্থলে চিন্তা করি। মধুসূদন আপশোষ করিয়াছিলেন, "কবিগুরু যদি রামচন্দ্রকে কতকগুলি মনুষ্য-সহচর দিতেন"—হা দুরদৃষ্ট! সেই সাহচর্য মধুসূদন কোথায় পাইবেন? কবিগুরু তো স্বাদেশিকতা অথবা স্বাজাত্যের ভাবে উদ্দীপ্ত হইয়া রামায়ণ গান করিতে বসেন নাই। হোমারের কাব্যে স্বাজাত্যের—হয়তো স্বাদেশিকতার দিক হইতেই কবির সহানুভূতি বিজয়ীর পক্ষে ছিল। বাল্মীকির বক্তব্য ছিল, রাম-অয়ন! মহাপুরুষের মাহাত্ম্য-গান—মানুষের মনুষ্যত্বধর্ম এবং উহার বিজয়িনী-শক্তির মহাসঙ্গীত গান করাই তো কবিগুরুর লক্ষ্য ছিল। আবার ইতিবৃত্ততার সূত্রেও রামায়ণ রচনার সময় যে আর্য-মাহাত্ম্য কিংবা স্বাজাত্য-ঘোষণাই হয়তো ঋষির

মনে প্রবল হইতে জানে নাই। বিজিত দ্রাবিড় কিংবা রাক্ষস জাতিকে সে সময়ে আর্যজাতি ঘনিষ্ঠভাবে নিজের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন, এবং আরও ঘনিষ্ঠ-তর ভাবে লইতেই চেষ্টিত ছিলেন। ইহাও কি সত্য নহে যে, অনার্যের অংশ-বিশেষের বন্ধুতা সাহায্যেই অন্য অংশের অরিতা নির্জিত হইয়াছে? আর্যগণ সংখ্যায় অল্প ছিলেন, কিন্তু যে দেশে একটি আর্য গিয়াছে, সে একাকীই মহাশক্তি —সে একাই সহস্রকে হৃদয় দ্বারা বিজয় করিয়া আর্য-সভ্যতার পতাকাতলে লইয়া আসিয়াছে! রামায়ণেও উহারই দৃষ্টান্ত। রামচন্দ্রের পূর্বেই অগস্ত্যমুনি— দাক্ষিণাত্যে যাঁহার নাম 'তামিলমুনি'—একরূপ একাকী-ই দক্ষিণাপথে অভিযান করিয়া, আর্য-সভ্যতার জয়পতাকা দক্ষিণ হইতে আরও দক্ষিণ মুখে লইয়া গিয়াছিলেন! আর্যের বিজয়—হৃদয়ের বিজয়. কদর্য-আচারী, কদর্যাহারী এবং কদর্যজীবী রাক্ষসগণের উপরে উন্নততর সভ্যতা, অধ্যাত্মকর্ষণা এবং জীবনাদর্শের বিজয়? কবিগুরু স্বাজাত্যের ভাবে পরিচালিত না হওয়াতেই যেমন তাঁহার রামায়ণে উহা পরিস্ফুট হইতে জানে নাই, তেমন 'ঋষিকবি' বলিয়া কোনরূপ বহিস্তন্ত্রী ঐশ্বর্যভাব অথবা জড়-তান্ত্রিক অনুভাব-বিভাগের সাহায্যে বাল্মীকি বিজয়ীপক্ষের মাহাত্ম্য, প্রমাণ করিতে যান নাই। আর বাল্মীকির 'কপি', 'ভল্লুক', 'রাক্ষস', 'কুকুর'—ইহারাই বা কে? প্রকৃতপক্ষে মানুষ এবং অনার্যের জাতি-বিশেষ নহে কি? মধুসূদনও কবিগুরুর বর্ণনারীতি নিবিষ্টভাবে দেখিতে চাহেন নাই!

এ স্থানে আর একটি কথাও কদর্থের সম্ভাবনা নিরাস-কল্পেই বুঝিতে হয়। রামায়ণের মধ্যে অনার্য-ঘৃণা একেবারে প্রকট হয় নাই, তাহা নহে। কিন্তু উহা কোন 'পোলিটিক্যাল'-আদর্শগত কিংবা জাতিগত ঘৃণা নহে। আর্য-জাতির মধ্যেও শূদ্রধর্মী বা রাক্ষসধর্মী ব্যক্তির প্রতি ঋষি-আত্মার এই 'ঘৃণা' স্বভাবেই আপন্ন হইতে পারিত। শূদ্রতা এবং রাক্ষসতার প্রতি সংযম-আদর্শ-জীবী ব্যক্তি-মাত্রের যে সহজ বিরুদ্ধ-বুদ্ধি থাকিতে পারে, তদ্ব্যতীত অপর কোন বিরোধ-ভাব রামায়ণে প্রবল নহে। 'বৈশ্রবণ' রাবণও স্বয়ং ব্রাহ্মণ-পুত্র 'রাক্ষস'। [মহাভারতে

এবং পুরাণাদিতেও অনেক ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয়ের 'রাক্ষস'ত্ব লাভ কাহিনী আছে।] মানুষ কি করিয়া দেবের মাহাত্ম্যেই মহীয়ান্ হয়, বিশ্বতন্ত্রে অধর্মের ত্রিলোকবিজয়ী শক্তিদর্পও কি করিয়া আপাতদৃষ্টিতে ক্ষুদ্র দুর্বল 'তৃণের' দ্বারাই বিচূর্ণিত হইতে পারে, মহাকবি যে সেই মহারসে আবিষ্ট হইয়াই রামায়ণ গান ধরিয়াছিলেন! রামের ধর্মপত্নীর উদ্ধাররূপ সত্য দাবীর বলে—সুতরাং ধর্মবলে বলীয়ান্ 'নর-বানরের' হস্তে, ত্রিভুবন-জয়ী রাক্ষস-রাজের অভ্রভেদী মাহাত্ম্যও ধূলিসাৎ হইয়াছে! আর্য-অনার্যের সংঘর্ষবাদ যে ঋষি-কবির মনে কিছুমাত্র শিল্প-আকর্ষণ যোগাইতে পারে নাই! অন্যদিকে, মধুসূদনও যে কেবল একটি দুঃখ-অদৃষ্টের বজ্রনিপাতে বিদীর্ণদেহ মহাবৃক্ষের ছবি অঙ্কিত করিয়াই মনুষ্যকে কাঁদাইতে চাহিয়াছিলেন! "বনের মাঝারে যথা শাখা দলে আগে, একে একে কাঠুরিয়া কাটি' অবশেষে, নাশে বৃক্ষে।"—তাহাই দেখাইতে গিয়াছিলেন! মধুসূদন ঐ কার্যে যেরূপে স্বকীয় প্রাণের সহানুভূতি-নিযুক্ত বিষয় নির্বাচনপূর্বক উচ্চাঙ্গীয় কাব্যশিল্পের সমাধান করিয়া পরিপূর্ণ সাফল্য-লাভ করেন, তাহাই আমাদিগকে দেখিতে এবং বুঝিতে হইবে। যাঁহারা একালে রামায়ণ কিংবা মহাভারতের ঘটনামধ্যে আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব বুঝিতে চাহেন, তাঁহারা ঐতিহাসিক সভ্যতার ক্ষেত্রেও ভুল না বুঝিতে পারেন, কিন্তু ভারতের 'ঋষিকবি' ব্যাস ও বাল্মীকির হৃদয় যে বুঝিতে পারেন না, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কোন্ গুণে রামায়ণ কিংবা মহাভারত আর্য-অনার্য উভয় জাতির হৃদয়ঙ্গম কাব্য- এবং ধর্মগ্রন্থ-রূপেই পূজা লাভ করিতেছে? রাম এবং কৃষ্ণ ও অব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্রের—হিন্দুনামধারী ব্যক্তিমাত্রের হৃদ্যতা এবং পূজ্যতা লাভ করিয়াছেন! আর্যামী কিংবা স্বাজাত্যের আকর্ষণ বলিয়া কোনও অভিসন্ধি যে ঋষি-কবির মনে প্রবল হইতে জানে নাই! রামায়ণ এবং মহাভারত রচনার পূর্বে, উহাদের মহাকাব্য-আকারে পরিণতি হওয়ার বহুপূর্বে, আর্য-অনার্যের দ্বন্দ্ব-অগ্নি যে ভারতীয় ঐতিহাসিক-চিত্তের স্মৃতিক্ষেত্র হইতে নির্বাণ লাভ করিয়াছিল, 'খাণ্ডবদাহনে'র স্মৃতিও নির্বাপিত হইয়াই গিয়াছিল, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া

লইতে হইবে। ভারতের 'জাতিভেদ' আদর্শও ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত ছিল না বলিয়াই, উহা ইয়োরোপের 'ভেদ'-আদর্শের ন্যায় সবিশেষ ঈর্ষা-কলহ অথবা রক্তারক্তির কারণ হইতে পারে নাই! ভারতের 'ব্রাহ্মণ্য'-আদর্শ জীবন-ক্ষেত্রে সমুন্নত সংযম-কর্ষণা, নিবৃত্তি-ধর্ম এবং সমুন্নত আচার-গৌরবেই 'অ-ব্রাহ্মণের' সমক্ষে আপনাকে শ্রেষ্ঠ এবং পূজ্যতর বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছে। 'অব্রাহ্মণ-গণও' ঐ ত্যাগধর্মী, নিবৃত্তিকর্মী এবং অকিঞ্চন 'ব্রাহ্মণের' জীবনাদর্শকে নৈতিক ক্ষেত্রেই অধৃষ্য এবং আত্মক্ষমতার বহির্ভূত বলিয়া অন্তরে-অন্তরে বুঝিয়াই ব্রাহ্মণত্বকে লোভ করে নাই, অথবা উহার শ্রেষ্ঠত্বের দাবীকেও সবিশেষ ঈর্ষা করে নাই। একালেও নানা বিজাতীয় সমাজ-আদর্শের দ্বারা বিকলদৃষ্টি হইয়া এবং নানাদিক হইতে সমাজের মধ্যে কলহ-বিরোধ এবং রেষারেষি ঘটনা করার উদ্দেশ্যে নানা 'মতলবী' চালে পরিচালিত হইয়াও বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত 'অ-ব্রাহ্মণ' জাতিসমূহ যাহাতে কোনমতেই ব্যাপকভাবে 'গা' করিতেছে না! জীবনের উন্নততর আদর্শে নিয়ন্ত্রিত বলিয়া, অধিকন্তু ধর্মকর্তৃক সমর্থিত বলিয়াও হয়ত ভারতের এই 'ভেদ' আদর্শে ইয়োরোপের মতন উচ্চনীচ শ্রেণীর মধ্যগত এত হিংসাবিদ্বেষ এবং ঈর্ষাকলহ নাই; 'জন্মগত অদৃষ্ট'বাদের দ্বারা সমর্থিত বলিয়াও ঐ ভেদ হয়ত সবিশেষ অরুন্তুদ হইতে পারে নাই। ব্রাহ্মণের জীবিকা-আদর্শে সাংসারিক সুখ-সুবিধার অনুপাতে কোনদিকে বৃদ্ধিলাভ করিয়া যেমন উহাকে লোভনীয় করিয়া তুলিতেছে না, তেমন প্রত্যেক নিম্ন-নিম্নতর জাতির জীবিকাকেও জাত্যন্তরের পক্ষে 'অপরামৃশ্য' করিয়া ভারতীয়-সমাজ সকলের পক্ষেই কিছু-না-কিছু ক্ষতিপূরণ করিয়াছে। ক্ষতিপূরণ ব্যতীত কোন ভেদের আদর্শই মনুষ্য-সমাজে দীর্ঘকাল দাঁড়াইতে কিংবা ব্যাপকভাবে অভিমতি লাভ করিতে পারে না। ভারতীয় সমাজের 'ভেদ'-আদর্শকে ইয়োরোপীয় চশমার সাহায্যে দেখিতে গিয়াই আমরা চিরকাল ভুল করিয়া আসিতেছি। যদিও সাম্যবাদ হইতেই যে আপেক্ষিকভাবে মনুষ্য-সমাজের অধিকাংশ ব্যক্তির অধিকতর সাংসারিক উপকার সংসাধিত হইতে পারে, তাহাই হয়ত আধুনিক

ইয়োরোপীয় সমাজের বিগত শত বৎসরের ইতিবৃত্ত প্রমাণিত করিবে। তবে ঐ 'সাম্যবাদ' এবং উহার অপরিহার্য সিদ্ধান্ত-স্বরূপ 'প্রতিযোগিতা' ব্যাপারের, মহাফলরূপে ফলিত হইয়া বিগত মহাযুদ্ধ আবার সেই প্রমাণটাকেই হয়ত খণ্ডিত এবং চূর্ণিত করিয়া গেল! অদূর ভবিষ্যগর্ভে আরও ভীষণতর 'মহাযুদ্ধ'ই হয়ত প্রত্যেক দৃষ্টিশালী ব্যক্তির প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিতেছে! যা হোক্, কবির ঐ দৃষ্টিস্থান হইতেই মেঘনাদের কায়া এবং প্রাণের অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিতে হয়। বাল্মীকির রামায়ণ হইতে স্বতন্ত্র এই একটি কাব্য-ব্যক্তি। বাল্মীকির রাম-লক্ষ্মণকে যেমন ভুলিতে হইবে, তেমন বাল্মীকির রাক্ষসকেও ভুলিতে হইবে। বাহ্যিক ঐশ্বর্য-বিলাস এবং মত্ততা ব্যতীত হয়ত রাক্ষসত্বের অন্য কোন লক্ষণ মেঘনাদের রাক্ষসগণের মধ্যে প্রাবল্য লাভ করে নাই!

বাংলা সাহিত্যের এই মেঘনাদ-কাব্যরূপী স্থাপত্যমন্দিরের নির্মাণ মধ্যে গ্রীক এবং ইয়োরোপীয় মাল-মশলা এত অধিক পরিমাণে কেন ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কারণও বুঝিতে হইবে। কবি মধুসূদন পৃথিবীর অধিবাসী ছিলেন। পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্যগুলি তাঁহার বিহারক্ষেত্র ছিল। সাহিত্যজগতের প্রাচীন মহাকাব্যগুলির ভাবরাজ্যে যাহা সুন্দর, মধুর, বৃহৎ এবং মহৎ ছিল, মাধুকরী-বৃত্তি অবলম্বন করিয়া সেই সমস্ত সংগ্রহ পূর্বক তিনি বঙ্গদেশে এমন এক 'মধুচক্র' নির্মাণ করিবেন, 'গৌড়জন যাহে আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি!' বাঙ্গালীর জ্ঞান—এবং আনন্দের ভাণ্ডার বৃদ্ধি করিবেন—ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান লক্ষ্য; এবং সেই লক্ষ্যে মৌলিকতার অহংকারটাও মুখ্য ছিল না। বলা বাহুল্য, তিনি পরকীয় কাব্যের অবস্থাগুলি মাত্র গ্রহণ করিয়াছেন—সেক্সপীয়র যেমন পরের নাট্য-কাঠামোর উপর নিজের হইতে রক্তমাংস এবং বর্ণ সংযোগপূর্বক উহাদের স্বতন্ত্রভাবে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিয়াছেন; স্বয়ং মিল্টন, ট্যাসো এবং ভার্জিলও যে-প্রণালী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন; বাল্মীকি এবং ব্যাসও যাহা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে! গীতিকবিতার ক্ষেত্রেও প্রাচীনতম গীতিকবি হইতে আরম্ভ করিয়া আমাদের রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতির

মধ্যে পর্যন্ত অনেক সময় যে-মাধুকরীর প্রমাণ মিলিতেছে! সাহিত্যের মধুচক্র এইরূপে ন্যূনাধিক মাধুকরী-বৃত্তিতেই সমর্থ মধুকরগণের হস্তে মাহাত্ম্য, ঐশ্বর্য, ক্রমান্বয়ী ঘনতা এবং পূর্ণতা লাভ করিয়া আসিতেছে!

অধিকন্তু, তিলোত্তমা ও মেঘনাদের শিল্পতামর্মে দৃষ্টি করিয়া বুঝিতে হইবে যে, মধুসূদন প্রধানতঃ কবি এবং কাব্যশিল্পী ব্যতীত আর কিছুই নহেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কর্ম-ভূমি এবং চিন্তাভূমিতে আবির্ভূত হইলেও এবং স্বয়ং বিদ্রোহী-ধর্মে পৈতৃক সমাজ-ধর্ম-ত্যাগী হইলেও, অষ্টাদশ বা উনবিংশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সমাজবিপ্লব কিংবা সাহিত্যের ভাব-বিপ্লব তাঁহার 'শিল্পচিত্তকে' কোনদিকে বিশেষ আঘাত করিয়া জাগাইতে অথবা পরিচালিত করিতেও পারে নাই। ফরাসী বিপ্লবের বহু-ঘোষিত 'সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা'র আদর্শ এবং ক্রিয়াকর্ম হইতে ইয়োরোপীয় নর-সমাজের অধ্যাত্ম-রাজ্যে যে পরিবর্তন আসিয়াছিল তাহার নাম দিতে পারি, প্রথমতঃ, ব্যক্তি স্বাধীনতা বা ব্যক্তিগত অধীনতা-মুক্তির আদর্শ—মনুষ্যের প্রাচীন ধর্মশাসিত সমাজ-আদর্শের নীতি-বন্ধনের অধীনতা হইতে নানাদিকে ব্যক্তির মুক্তি। দ্বিতীয়তঃ, ব্যক্তিগত চিন্তার স্বাধীনতা—মনুষ্যের প্রাচীন সমাজ-শাসিত ধর্ম আদর্শের নীতিনিয়মের অধিকারে জন্মবশাৎ মনুষ্যের ভাব এবং চিন্তার জগতেই যে একটা কার্পণ্য এবং গতানুগতিকতার আবহাওয়া প্রবাহিত থাকিয়া তাহাকে নিয়তভাবে দুর্বল এবং ক্ষুদ্র করিতেছিল, সাহিত্যক্ষেত্রে উহা হইতে ব্যক্তিমাত্রের অধ্যাত্মমুক্তি। এই 'মুক্তি'র আদর্শ ইয়োরোপের উনবিংশ শতাব্দীর সাহিত্যে প্রবল ভাব-বিপ্লব আনয়নপূর্বক উহাকে নানাদিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্য হইতে মূলেই পৃথক করিয়া দিয়াছে। এই মুক্তির গুণ ও দোষ ফল লইয়া এবং উভয়কেই দৃষ্টান্তিত করিয়া রুশোর এমিলী [Rousseau's Emile], শেটু ব্রায়াণ্ডের রীনী [Chateaubriand's······], গ্যয়টের ওয়ার্থার [Goethe's 'Warther'], শীলারের রবার্স্ [Schiller's 'Robbers'] এবং বায়রণের চাইল্ড হেরল্ড, কর্সেয়ার্, ম্যানফ্রেড্ [Byron's 'Child Herald,' Manfred].

ও শেলীর রিভোল্ট অব ইস্‌লাম ও প্রমীথিউস্ আন্‌বাউণ্ড [Shelley's 'Revolt of Islam, 'Prometheus Unbound'] প্রভৃতির সৃষ্টি! বলা বাহুল্য, বঙ্গ সমাজেও এই সমাজ-বিপ্লব এবং ভাব-বিপ্লবের প্রভাব এবং ফল প্রকট না হইয়া পারে নাই। যেমন রামমোহন রায়ের 'উপাসনা সভা'র মর্মমধ্যে, তেমন 'ঝড়তুফান'-যুগের ইয়ং-বেঙ্গলের দলমধ্যেও ইয়োরোপীয় বিপ্লবের ন্যূনাধিক আঘাত, প্রতিঘাত এবং উগ্রকল্লোলই শুনিতেছি। মধুসূদনও ব্যক্তিগত ভাবে একজন 'ইয়ং বেঙ্গল' ছিলেন; ফরাসী বিপ্লবের সমস্ত ভাবাভিঘাতে, এবং ভল্‌টেয়ার [Voltaire] হইতে আরম্ভ করিয়া রুশো-শেটুব্রায়াণ্ড—গ্যয়টে-বায়রণের যাবতীয় অভিনবতা এবং অতিরিক্ততার আঘাতেও তিনি সচেতন ছিলেন; তবু শিল্পী মধুসূদনের অন্তর্জীবনে এবং কাব্য-আদর্শে ঐ লক্ষণ প্রবল হইতে পারে নাই। পরাধীনতাগ্রস্ত দেশের বা ভেদ-আদর্শ-নিয়ন্ত্রিত সমাজের দিকে কোন স্বানুভূতির লক্ষণও উদগ্র হইয়া উঠিয়া এই কবিকে সাহিত্যক্ষেত্রে 'প্যাট্রিয়ট্-কর্মী' বা সমাজ-সংস্কারক করিয়া তুলিতেও পারে নাই! এই দিকে বরং 'চিন্তাতরঙ্গিনী'র তরুণ কবিই [হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়] নিজের শিল্পিচৈতন্যে 'ইয়োরোপীয়তার জাগরণ' লক্ষণ, এবং 'রীনী'-'ওয়ার্থার'—'ম্যান্‌ফ্রেডে'র প্রভাব প্রমাণিত করিতেছেন! 'বীরবাহু' ও 'ভারত সঙ্গীতে'র মধ্যেও ফরাসী বিপ্লবের স্বাধীনতামন্ত্রের ধ্বনি এবং প্রতিধ্বনিই শুনিতেছি।

মধুসূদনের এই অমিশ্র, অমল, অসঙ্গ শিল্পিচেতনা প্রত্যেক সাহিত্য-সেবীর প্রণিধানযোগ্য!

এই অনাবিল শিল্পিচেতনা মধুসূদনকে যেমন সাহিত্যসাধনার ক্ষেত্রে উন্মার্গগামিতা হইতে রক্ষা করিয়াছে, যেমন তাঁহাকে শিল্পের ক্ষেত্রে সমাজ-সংস্কারক, ধর্ম-সংস্কারক অথবা রাষ্ট্র-সংস্কারকের আদর্শে আত্মবিস্মৃত হইতে দেয় নাই, তেমন অন্যদিকে তাঁহাকে সাহিত্যের সর্বজনীন এবং সর্বকালীন 'রস'-আদর্শে আত্মনিষ্ঠ থাকিতেও সাহায্য করিয়াছে। তিনি

যে সমকালীন বিশ্বসাহিত্যের অভিনিবিষ্ট পাঠক এবং ভোক্তা ছিলেন, সাহিত্যের বহুমুখী পদ্ধতি যে ভোক্তার দিক হইতে পরম সহানুভূতি পথে উপভোগ করিতে পারিতেন, সে-সংবাদ তাঁহার 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র কবি-প্রশস্তি-গুলিই প্রমাণ করিতেছে। অথচ, মধুসূদন সাহিত্যে আপন কর্তৃত্বের এবং শিল্পিত্বের ক্ষেত্রে কত আত্মনিষ্ঠ এবং আত্মরত থাকিয়াই চলিয়াছেন। সমস্ত জানা থাকিলেও আধুনিক সাহিত্যের নানা অসাহিত্যিক মতিগতি তাঁহাকে তিল পরিমাণেও আত্মভ্রষ্ট করিতে পারে নাই। আধুনিক সাহিত্যের নানা আত্মবিস্মৃত-ঝোঁক, উহার নানা চরমপন্থী এবং অত্যন্তবাদী-প্রবৃত্তি, যাহা Realism ও Naturalism প্রভৃতি নামাদর্শে সাহিত্যকে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অত্যাচারী করিতেছে, Problem Novel ও Problem Drama প্রভৃতির পথে সাহিত্যকে সমাজ-কবিরাজী এবং চিকিৎসাশাস্ত্রের তরফেই কুপথচালিত করিতেছে, ইতিহাস ধর্ম অথবা রাষ্ট্রনীতির সংকীর্ণ এবং সাময়িক ক্ষেত্রেও সাহিত্যকে প্রলুব্ধ করিতেছে, সে সমস্ত শিল্পী মধুসূদনের উপর কিছু মাত্র প্রভাব দেখাইতে পারে নাই। জীবনে এবং চরিত্রে স্বয়ং 'ফরাসী-বিপ্লবের' চেলা এবং বঙ্গের 'চণ্ডমুণ্ড দলে'র প্রতিনিধি হইয়াও কবি আপন সাহিত্য-সাধনার তপোবনে অবিচলিত ছিলেন, আপন পথেই সাহিত্যের সর্বজনীন রস এবং রসের নিত্যকালীয় 'সত্য-শিব-সুন্দর'-আদর্শেই সমাহিত ছিলেন। তাঁহার এই বিশেষত্বটুকু বুঝিতে না পারিলে আমরা তাঁহার মাহাত্ম্যের প্রধান দাবীটাই অগ্রাহ্য করিব! এই বৈপরীত্য এবং বিপরীতের মধ্যে অপরূপ সামঞ্জস্যই সাহিত্যশিল্পী মধুসূদনের অমর কৌলীন্য এবং মাহাত্ম্য।

৬

আমরা পূর্বপ্রসঙ্গে মধুসূদনের অনাবিল শিল্প-আদর্শের বিষয় উল্লেখ করিয়াছি! কিন্তু মধুসূদন বঙ্গে ইয়োরোপীয় ভাবজাগরণের প্রথম কবি—তাঁহার মধ্য দিয়াই ইয়োরোপীয় সাহিত্য-শিল্পের-আদর্শ বঙ্গে সর্বপ্রথম সচেতনভাবে প্রবেশ করিয়াছে! আমরা দেখিতেছি, মধুসূদনের শত বৎসর পূর্ব হইতে বাঙ্গালী ইয়োরোপের প্রত্যক্ষ সম্পর্কে আসিয়া থাকিলেও, অপর কোন বাঙ্গালী কবির মধ্যে ইয়োরোপীয় সাহিত্য-আদর্শের পথে বাঙ্গলা সাহিত্যের এই 'নবজীবন' সম্ভবপর হয় নাই। শিল্পী মধুসূদনে আসিয়াই এই আদর্শটি প্রতিমা এবং প্রমূর্তি-লাভ পূর্বক 'হাতে-কলমে দৃষ্টান্ত' স্বরূপে দাঁড়াইয়া গিয়াছে! কোন কবি বা জাতিবিশেষের প্রকৃত 'ঋণ' বুঝিতে হইলে সর্বাগ্রে কোন্ পদার্থটি দেখিতে হইবে?—নূতন আদর্শের পরিচয়। সেই কবি কিংবা জাতি অপরের শিষ্যতা-পথে ভাষার রীতি, ভাবুকতার পদ্ধতি অথবা শিল্পের গঠনপ্রণালী বিষয়ে কোন নূতন সত্য দর্শন করিয়াছে কি? ভাব এবং চিন্তাকে শিল্পের ক্ষেত্রে চরিত্র অথবা ঘটনার মূর্তি-সাহায্যে পরিমূর্ত করিবার আদর্শ-পথে সেই কবি কিংবা জাতি কোন নূতন উপনয়ন কিংবা কোন নব পদ্ধতির ক্রিয়াকৌশল লাভ করিয়া সমৃদ্ধ হইয়াছে কি? বঙ্গ-সাহিত্যে 'ইয়োরোপীয় নবজীবনে'র আদিকবি মধুসূদনের মধ্যেও উক্ত উপনয়ন-স্থানগুলিই আমাদিগকে দেখিতে হইবে। নতুবা, কেবল কোন একটি বিশেষ ভাব, উপমা বা অনুপ্রাসের ঋণ, কোন একটি বিশেষ অলঙ্কার বা 'পরের সোনা কানে পরার' দৃষ্টান্ত—এ সমস্ত সাহিত্যের আলোচনাক্ষেত্রে সবিশেষ ধর্তব্যই নহে। শিল্পের কোন্ রীতি বা পদ্ধতি বাঙ্গালী পূর্বে জানিত না বা বঙ্গ-সাহিত্যে প্রচলিত ছিল না, মধুসূদন তাহাকে বঙ্গ-সাহিত্যে দৃষ্টান্তে অবতারিত করিয়া বাঙ্গালীর চক্ষু খুলিয়া দিয়াছেন, এবং তাহার পর হইতে বঙ্গ-সাহিত্য সেই নব-আবিষ্কার-পথে স্রোতোমুখে পরিপুষ্টি লাভ করিয়া ছুটিতেছে—সাহিত্য-আলোচকের পক্ষে উহাই প্রধানতঃ চিন্তনীয় বিষয়! উহা আবিষ্কার অথবা সৃষ্টির তরফেও

মধুসূদনের প্রধান মাহাত্ম্য স্থান! বলা বাহুল্য, বঙ্গ-সাহিত্যে ইয়োরোপীয় প্রভাবের উহাই আদি ইতিহাস—বাঙ্গালীর পাশ্চাত্ত্য-ঋণের উহাই প্রকৃত বিবরণ!

বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের অব্যবহিত পূর্ব যুগের শ্রেষ্ঠ-কবি ভারতচন্দ্র। 'বিদ্যাসুন্দর' উপাখ্যানের মধ্যে যে একটা পরম বলীয়সী সারস্বত-শক্তি আছে, তাহা অস্বীকার করার যো নাই। স্ত্রী-পুরুষের সোজাসুজি মিলন, ধর্মশাসিত সমাজের সংযম এবং আচার-তন্ত্রকে ডিঙ্গাইয়া সম্পূর্ণ নৈসর্গিক উপায়ে মিলন, বাহিরের যাবতীয় বাধাবিঘ্ন-অন্তরায়কে উতরাইয়া কেবল ভাবের এবং প্রাণের টানে মিলন—ইহা নৈসর্গিক স্বাতন্ত্র্য-রঙ্গী মনুষ্যমনের নিত্যানন্দকর বিষয়। 'কবি রায়গুণাকর' অতুলনীয় শব্দমন্ত্রে এবং ছন্দোশক্তিকে মনোরম করিয়া এই মিলনের ছবি বাঙ্গলার সমক্ষে ধরিলেন! বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সহজপ্রিয় বাঙ্গালীর হৃদয় উহাকে পরম উল্লাস-রঙ্গে আলিঙ্গন করিল; দেশে দেশে, গ্রামে গ্রামে বিদ্যাসুন্দর-গানের রোল পড়িল। মানুষ এবং মানুষী সমাজের রাজদুর্গের অভ্যন্তরে, সমাজ-দেবতার গুপ্ত সাহায্য লাভ করিয়াই, সমাজনীতির হৃদয়ে গুপ্ত 'সুড়ঙ্গ' খুঁড়িয়াই মিলিত হইতেছে। বন্ধনক্লিষ্ট জীবের পক্ষে ইহাপেক্ষা পরিতৃপ্তি এবং আস্ফালনের বিষয় আর কি আছে? বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের 'তিলোত্তমা-সম্ভবে'র অভ্যুদয় পর্যন্ত [১৮৬০ খৃঃ] ভারতচন্দ্রের যুগ—মধু যাঁহাকে 'কৃষ্ণনগরের সেই ব্যক্তি' বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন! সর্বসাধারণের হৃদয়-চক্রবর্তী 'পূর্বসূরী' এবং দেশের দৃষ্টিতে স্বকীয় প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর শক্তি অভিঘাত নিজের প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াই আমাদের কবি উক্ত কটাক্ষ করিয়াছেন! মধুসূদনকে জীবিতকালে চিরদিন ভারতচন্দ্রের সহিত তুলনায় সমালোচনা সহ্য করিতে হইয়াছিল। 'মেঘনাদবধ' প্রকাশের পর স্বয়ং বিদ্যাসাগরও নাকি বলিয়াছিলেন, "খুব করিয়াছ—কিন্তু ভারতচন্দ্রকে অতিক্রম করিতে পারিয়াছ বলিয়া মনে হয় না।" শেষ পর্যন্ত প্রাচীনতন্ত্রের

সমালোচক রামগতি ন্যায়রত্ন মধুসূদনকে 'কবিকেশরী' ভারতচন্দ্রের ছায়ায় আনিয়া তুলনা করিয়াছেন! ইংরেজ আমলের প্রথমযুগের প্রবলতম প্রতিপত্তিশালী কবি ঈশ্বর গুপ্ত—তিনি পূরামাত্রায় ভারতচন্দ্রের মন্ত্রশিষ্য। রায়গুণাকর কবির শব্দমন্ত্র, ভাষার বিশুদ্ধি-আদর্শ, ঋজু এবং মার্জনা-তীক্ষ্ণ বাক্যের 'হীরার ধার' (শক্তি)-এ সমস্তের শিষ্যতা ঈশ্বর গুপ্তে প্রতীয়মান। ভারতচন্দ্রের রসিকতাও গুপ্তকবির মধ্যে আসিয়া,—একেবারে কণ্টকিত হইয়াই—তীব্র হাস্যের রিষে এবং ব্যঙ্গের বিষে দাঁড়াইয়া গিয়াছে! প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী এবং প্রতিবেগশীল কবি হইলেও স্বয়ং মধুসূদন যে এই 'ভারতচন্দ্রীয় রসিকতা'র প্রভাব-মুক্ত হইতে পারেন নাই, তাহাই মধুসূদনের নানা স্থানে লক্ষ্য করিতেছি! অধিকন্তু, আশ্চর্যের বিষয় এই যে, সজ্ঞানে অথবা অতর্কিতে, কিংবা কোন অতীন্দ্রিয় প্রাণশক্তির বাধ্য হইয়াই হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইয়োরোপীয় সাহিত্যের প্রাণগত-আবহাওয়াটুকু—বুলো-পোপ-ড্রাইডেন-ভল্টেয়ারের ভাষা-রীতি, ব্যঙ্গ-আদর্শ এবং অধ্যাত্মশক্তির স্বভাবটুকু—যেন এই সুদূর বঙ্গদেশে, ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্তের যুগ পর্যন্ত-ই প্রবাহিত ছিল! সারস্বত-জগতের এই একটি অপরূপ রহস্যেও আমাদের দৃষ্টি না হইয়া পারে না। এইরূপে পূর্বাপরের জ্ঞান ব্যতীত বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের জন্ম অথবা কর্ম-স্থানও বুঝিতে পারা যায় না।

বঙ্গ-সাহিত্যে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র প্রকাশকে [১৮৬০ খৃঃ] নানাদিকেই প্রাচীন-সাহিত্য-যুগের সীমা বলিয়া ধরিতে হয়। ঐ সময়েই ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যু [১৮৫৮ খৃঃ] তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে-সঙ্গেই 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে'র অবসান; এবং তিলোত্তমা-সম্ভবের সঙ্গে-সঙ্গেই বঙ্গে নব সাহিত্যযুগের আরম্ভ! উহা ইয়োরোপীয় আদর্শে 'নব জীবন' প্রাপ্ত, এবং আধুনিক 'বিশ্বসাহিত্য'-আদর্শে দীক্ষাপ্রাপ্ত নব 'রোমাণ্টিক' সাহিত্য-যুগের আরম্ভ! ভারতচন্দ্র হইতে ঈশ্বর গুপ্ত পর্যন্ত বঙ্গ-সাহিত্যের ভাষা-রীতিগত 'বিশুদ্ধি যুগ' বলিতে পারা যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীময় সমগ্র ইয়োরোপে যে 'বিশুদ্ধি যুগ' চলিয়াছিল, ফরাসী দেশের বুলো এবং ইংল্যাণ্ডের

পোপ-ড্রাইডেনকে উহার 'অধিরাজ' -রূপে নির্দেশ করার একটা প্রথা প্রচলিত আছে। বলিতে হয়, একরূপ অতর্কিত ভাবে, মানব-চিত্ত-স্রোতের কোন অনির্দেশ্য অনির্বচনীয় ভাব-ধর্মবশেই বঙ্গ-সাহিত্যের 'কৃষ্ণচন্দ্রীয় যুগে'ও ভাষা এবং শিল্পের ক্ষেত্রে কেবল পরিশুদ্ধি এবং তীক্ষ্ণতার আদর্শই মুখ্য হইয়াছিল। মধু-সূদন হইতেই বঙ্গ-সাহিত্যে উন্নতি-নীতিক এবং রোমান্টিক-আদর্শের সূত্রপাত! ভাবুকতায় সংযম এবং সমুচ্চ বস্তুতন্ত্রতা বিষয়ে মধুসূদন গ্রীক শিষ্য, ক্লাসিক কবি-গণের শিষ্য হইলেও, তাঁহার মধ্যে 'রোমান্টিক যুগ'-ধর্মই প্রবল বলিয়া অনুভূত হইবে। মধুসূদন ভাষা ও ভাবের অভ্যুন্নতি, তীক্ষ্ণতা এবং পরিস্ফুট বস্তুবাদ বিষয়ে একদিকে যেমন হোমারের শিষ্য, ছন্দের প্রবাহ-শক্তি বিষয়ে যেমন ভার্জিল ও মিল্টনের শিষ্য, রচনার রমণীয় মধুরতা বিষয়ে যেমন ট্যাসোর (Tasso), অনুগামী, ভাব-বস্তুর সমুচ্চ বিভাবনা বিষয়ে যেমন দান্তের (Dante) সমধর্মা, তেমন অন্যদিকে, কাব্যে আত্মপ্রকাশ এবং ব্যক্তিবাদ বিষয়ে পেত্রার্ক (Petrarch) হইতে আরম্ভ করিয়া উনবিংশ শতাব্দীর বায়রণাদির মন্ত্রেই দীক্ষিত। আবার, ইঁহাদের সঙ্গেই আমাদের শ্রীহর্ষ, কালিদাস ও ভবভূতির এবং কৃত্তিবাস-কাশীরামের ভাষা ও রসাদর্শের অপরূপ সঙ্গতি করিয়া, অনির্বচনীয় স্বাভাবিকতা, সুসঙ্গত সবলতা এবং পরিপূর্ণ সারল্যময় ব্যক্তিত্বেই মধুসূদন দাঁড়াইয়াছেন! বঙ্গ-সাহিত্যে বলিতে গেলে ভারতীয় সাহিত্যে, এই প্রথম ইয়োরোপ-তন্ত্রের 'বিশ্বতা'-দীক্ষিত ব্যক্তি! এই ব্যক্তিটিকে বাদ দিলে বঙ্গ-সাহিত্যের পূর্বাপর গতি যেমন ছিন্নসূত্র এবং খাপছাড়া হইয়া যায়, তেমন বঙ্গ-সাহিত্যের পরবর্তী উন্নতিও অসম্বদ্ধ প্রমাণিত হইয়াই দাঁড়ায়! বুঝিতে হইবে, ভারতবর্ষ মধুসূদনের পূর্বে শতাধিক বৎসর হইতে ইয়োরোপের ভাব-সংশ্রবে আসিয়া থাকিলেও উহাকে কোন দিকেই যথাযথরূপে গ্রহণ করিতে পারে নাই—কেন না তখন মধুসূদন দত্ত জন্মগ্রহণ করে নাই। ভারতীয় হৃদয়ের রুদ্ধদ্বার ইয়োরোপ-পথে অনর্গল করিবার যাদুমন্ত্র কেবল এই ব্যক্তিটির মধ্যেই ছিল; এবং তাঁহার যাদুকার্যের পশ্চাতেই এখন পরবর্তী আপামর সাধারণ অবারিত পথে হুড়মুড় করিয়া চলিয়াছে।

আমাদের প্রাচীন কাব্য এবং ইয়োরোপীয় আধুনিক কাব্যের পরিব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কোথায়? ঠিক দেশীয় তন্ত্রী এবং বিলাতী বায়ু-যন্ত্রীর মধ্যে যে পার্থক্য। সেতারতন্ত্রীর প্রত্যেক ধ্বনি, প্রত্যেক 'টুং টাং'-ই এক একটা স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি, অথচ উহাদের ক্রমানুগত্যময় প্রবন্ধ হইতেই তন্ত্রী-রাগিণীর উৎপত্তি এবং বিকাশ। অর্গানের (organ) প্রত্যেক সুরই যেন শ্রুতিপথে স্রোতে প্রবাহিত হয়; এবং এই স্রোতে বহমান স্বরগুলির মধ্যগত একটা সমযোগী সম্বন্ধ এবং সংস্থিষ্ট হইতেই অর্গানের রাগিণী বিকাশ" লাভ করে। তেমনি, সংস্কৃত কাব্যের প্রত্যেক শ্লোক, শ্লোক-যুগ্মক বা কুলক-ই এক একটি পার্থক্য-বিশিষ্ট ভাব এবং অর্থের যেন স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি! প্রত্যেকেই স্বাধীনভাবে স্বতন্ত্র ব্যক্তিরূপে দাঁড়াইতে পারে; এবং উহাদের মধ্যবাহী একটা অন্বয় এবং সংগ্রথন-সূত্রের প্রবন্ধ হইতেই সংস্কৃতকাব্য প্রমূর্তি লাভ করে! অন্যদিকে, আধুনিক ইয়োরোপীয় কাব্যের প্রত্যেক শ্লোকে ভাবের সেই স্বতন্ত্রতা না থাকিতেও পারে, কেবল অর্থ বা বক্তব্যের প্রবাহ-সম্বন্ধের জোরেই সংগতি লাভ করিয়া উহা কাব্যের গঠনে উপাদান হইয়া দাঁড়ায়। প্রবন্ধ এবং সম্বন্ধের এই প্রকৃতিভেদ হয়ত ভারতীয় এবং ইয়োরোপীয় সমাজ-বন্ধনের মধ্যেও উদ্ভন হইয়া আছে—হয়ত উভয়ের চিত্রাঙ্কন পদ্ধতির মধ্যেও নিবিষ্ট-দৃষ্টিতে এরূপ একটা রীতি-পার্থক্য-ই ধরা পড়িবে। তন্ত্রী-রাগিণী যাহাদের প্রিয় নহে, এ দেশের চিত্ররীতি কিংবা সমাজ-আদর্শেও হয়ত তাহারা প্রীত হইতে পারিবে না।

মোটামুটি ভাবে দেখিতে গেলে, মেঘনাদবধের প্রত্যেক বাক্য, সংস্কৃত কাব্যের শ্লোক-পরিব্যক্তি লক্ষ্য করিতেছে না, অথচ পরবর্তী বাক্যের সঙ্গে মিশিয়া, 'ঠাসাঠাসি করিয়া' দাঁড়াইয়াই অর্থের এক একটা বহমান ধারাগতির সৃষ্টি করিতেছে। ইয়োরোপীয় অমিত্রচ্ছন্দের অন্তরাত্মার মধ্যেও অর্থের এই ধারাগতিটুকুই মুখ্য! মাঘ, ভারবি বা রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির শ্লোক-গতি, এবং শ্লোক-গত বাক্যচ্ছন্দের প্রকৃতি অনুধাবন করিলেই বুঝিব, ইয়োরোপীয় শ্লোকবন্ধ (stanza) বা ইয়োরোপীয় অমিত্রচ্ছন্দের বাক্য

এবং 'প্যারা'র (para.) সঙ্গে উহার একটি সূক্ষ্ম অথচ মৌলিক পার্থক্য আছে! ইয়োরোপেও রেনেসাঁসের (Renaissance) পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী বাক্য-বিন্যাসের মধ্যে, ক্লাসিক (Classic) সাহিত্যের এবং আধুনিক সাহিত্যের বাক্যবিন্যাসের মধ্যেও হয়ত আমাদের এই সংস্কৃতরীতির স্বাধর্ম্যই প্রতীয়মান হইবে। সংস্কৃত শ্লোকের সীমা-নিবদ্ধ দ্বিপাদ, ত্রিপাদ অথবা চতুষ্পাদ বৃত্ত-গতি হইতেই বোধ করি তাহার এই পার্থক্য ও স্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য হইয়াছিল; এবং সংস্কৃতের স্বাজাত্য-ধর্মে বঙ্গভাষার পয়ার এবং লাচারী ছন্দের শ্লোকমধ্যেও উক্ত প্রবৃত্তিটিই অক্ষুণ্ণ ছিল।

মধুস্দনের অমিত্রচ্ছন্দের মধ্য দিয়াই সর্বপ্রথম পাশ্চাত্য কাব্যের বাক্য-রীতির এই ধারাগতি এবং প্রবাহগত রাগিণী বঙ্গ-সাহিত্যে অবতীর্ণ হইল। মধুর অমিত্রচ্ছন্দ যেমন একদিকে সর্বপ্রকার বাহিক স্থিতি-রীতির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ, তেমন বঙ্গভাষার ক্ষেত্রে সর্বপ্রকার প্রাচীনতানিষ্ঠ পদগতি এবং মিল্‌তির বিরুদ্ধেও বিদ্রোহ। উহা ভাবের উদ্দাম স্বাধীনতার স্রোতে ভাষাকে ছাড়িয়া দিয়া, বাহিক হাল এবং পাল উভয় গুটাইয়া 'ভাসিয়া যাওয়া' ব্যতীত আর কিছু নহে। কবিত্বের প্রকৃত ছন্দ প্রকৃত কবিমাত্রের মধ্যেই ভাষার বাহিক মিল্‌তিকে অতিক্রম করিয়া তাঁহার ভাবাবিষ্ট হৃদয়ের স্রোতের মধ্যেই যে আছে—অন্য কুত্রাপি যে নাই, সাহিত্যের পাঠকমাত্রকে উহা সর্বপ্রথম বুঝিয়া লইতে হয়! এই স্রোতে নৌকা ভাসাইতে না পারিলে, বাক্যচ্ছন্দের হাজার বাহিক মিল্‌তি সত্ত্বেও রসজ্ঞের সমক্ষে কবিতা একটা বিফল এবং 'মৃত'-পদার্থ ব্যতিরিক্ত আর কিছুই হয় না। 'বিদ্রোহী' মধু বঙ্গ-সাহিত্যের ছন্দের ক্ষেত্রে এই প্রথম প্রকটিত ভাবে মহতী ভাবুকতা এবং ভাব-প্রাণতার সরল আনন্দধর্ম এবং তরঙ্গোন্মাদ আনয়ন করিলেন।

এই প্রসঙ্গসূত্রে প্রাচীন বাঙ্গলা গদ্যের, সংস্কৃত গদ্যের, বলিতে হইলে উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ববর্তী প্রাচ্য-গদ্যের একটা প্রবল এবং পরিব্যাপ্ত মর্মকথাও বুঝিয়া লইতে হয়। উনবিংশ শতকের পূর্ব পর্যন্ত ইংল্যাণ্ডেও ড্রাইডেনী

গদ্যের আবির্ভাব পর্যন্ত ইংরেজী সাহিত্যেও, স্বল্প কতিপয় লেখককে বাদ দিয়া, এইরূপ গদ্য-রীতিই সাধারণভাবে প্রবল ছিল, বলিতে পারি। আমাদের গদ্যের মধ্যেও ব্যাপকভাবে ঐ "শ্লোক-রীতি'-ই প্রবল ছিল। প্রাচীন সংস্কৃত গদ্যের প্রত্যেক পংক্তিই যেন শ্লোকের আদর্শে, আপনার ভাবাত্মা এবং অলঙ্কারকে মুখ্য করিয়া একটা স্বতন্ত্র unit বা পরিব্যক্তি রূপেই দাঁড়াইয়া যাইত—ঐরূপে বহু পরিব্যক্তির প্রবন্ধ হইতে এক একটি 'প্যারা' (para.) দাঁড়াইয়া যাইত—অথবা প্যারার আদর্শ একেবারেই উজ্জ্বল ছিল না। উনবিংশ শতাব্দীর প্যারার আদর্শ ছিল না বলিলেও হয়ত অত্যুক্তি হইবে না। প্রাচীন সূত্র-আদর্শের এক একটি বাক্য—প্যারাগুলি যেন উহাদের সমষ্টিময় বিস্তার। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার ও কেশবচন্দ্রে বিশেষতঃ বঙ্কিমচন্দ্রে আসিয়াই বাঙ্গলা-গদ্যের বাক্য এবং প্যারা আধুনিক আদর্শে পূর্ণ অভিব্যক্তি লাভ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। সাহিত্যে 'আধুনিক গদ্য' বলিতে এখন আমরা অর্থের বিশ্লেষণ-রীতিনিষ্ঠ এবং ধারাবাহী গদ্যই বুঝিতেছি। একালে ইয়োরোপীয় সাহিত্যেও যে প্রাচীন বা প্রাচ্য-গদ্যরীতির দৃষ্টান্ত একেবারে অনুসৃত নহে, তাহা বলা যায় না। প্রসিদ্ধ লেখক এমার্সনে (Emerson) উহাই প্রবল বলিয়া নির্দেশ করিতে পারি। রবীন্দ্রনাথ, প্রবলভাবে ইয়োরোপীয় গদ্যের বিশেষতঃ ফরাসী গদ্যের প্রভাব সত্ত্বেও, অনেকস্থলে 'কাদম্বরী'র গদ্যরীতি—প্রাচ্য-গদ্যরীতিই প্রমাণিত করিতেছেন। পরন্তু, প্রাচ্য-গদ্যরীতি একদিকে কতদূর সৌন্দর্য-সিদ্ধি করিতে পারে, যেমন এমার্সনের তেমন রবীন্দ্রনাথের গদ্য, প্রবন্ধ এবং প্রসঙ্গগুলি তাহারই দৃষ্টান্ত হইতে পারে। তাঁহাদের প্রত্যেক পংক্তি, প্রত্যেক প্যারা যেন স্বতন্ত্র অলংকারে, বিশ্লেষণ শক্তিতে, বুদ্ধিমত্তা ও ভাববত্তার ঐশ্বর্যে স্বতন্ত্র পরিব্যক্তি রূপে দাঁড়াইয়া যায়। এই লক্ষণ এত প্রবলভাবে পাঠকের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে যে, সমগ্র প্রসঙ্গটির মূল উদ্দেশ্য-বস্তু, উহার সামগ্র্য-লক্ষ্যটিই যেন 'ঝাপ্সা' হইয়া, কোথাও বা একেবারে চাপা পড়িয়া যায়! প্রকৃত আধুনিক গদ্য-প্রসঙ্গের মধ্যে যে একটি একত্ব বা ব্যক্তিত্ব থাকে, উহার ধ্বনি, অলঙ্কার বা বাক্যার্থের মধ্যে যে একটি

polyphony এবং symphony থাকে—পরস্পর সম্বন্ধশীল বিস্তারিত বাক্যের ও সর্ববিধ অলংকরণের মধ্যস্থ যে একটি একাগ্রমুখী সঙ্গতি এবং বহুস্রোতের মধ্যে ঐকতানমুখী যে একটি সঙ্গীতি থাকে, কবি-ধর্মাতার গতিকে ইহাদের গদ্য-মধ্যে অনেক স্থলেই উহা অস্পষ্ট হইয়া যায়। রবীন্দ্রনাথের বিস্তারিত পদ্য-চেষ্টার মধ্যেও এই লক্ষণ পরিদৃষ্ট হইবে। তাই তিনি আধুনিক আদর্শের 'মহাকাব্যে'র কবি নহেন—বিস্তারিত 'নবেলের' বা গদ্যগ্রন্থের শিল্পীও নহেন। তিনি স্বক্ষেত্রে অতুলনীয় ছোট গল্পের কর্তা—অতুলনীয় গীতিকাব্যের কবি, ক্ষুদ্রের এবং সূক্ষ্মের অভ্যন্তরস্থ অনন্তের ও অব্যক্তের দৃষ্টিশীল মহাকবি!

কাব্যের ভাষারীতি ব্যতীত কাব্যের গঠন-রীতির (Technique) ক্ষেত্রেও মধুসূদন প্রতীচ্য গ্রীক আদর্শকেই বঙ্গ-সাহিত্যে প্রথম অবতারিত করিয়াছেন। বলা বাহুল্য, গ্রীকরীতিই আধুনিক পাশ্চাত্ত্য কাব্যের প্রচলিতরীতি। রামায়ণ, মহাভারত এক একটি সম্পূর্ণ ঘটনাকে উহার বীজ হইতে এমন কি বীজপূর্ব আধ্যাত্মিক বা আধিদৈবিক অবস্থা হইতেও আরম্ভ করিয়া উহার চূড়ান্ত পরিণতি পর্যন্ত, উহার সাংসারিক এমন কি পারলৌকিক নিয়তি পর্যন্ত, ধারাবাহিক ভাবে অবলম্বন করিয়াই রচিত হইয়াছে। ব্যাস-বাল্মীকি প্রত্যেক পাত্রের জীবনগতি জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া উহার শ্মশানান্ত পর্যন্ত, উহার পরলোকগত সন্ততি পর্যন্ত অনুধ্যান করিয়াছেন। ঐরূপ অনুধ্যান ব্যতীত কেবল ঐহিকের আপাত-দৃষ্ট জীবনাংশ বা উহার কোন ভগ্নাংশ ধরিয়া কোন message, কোন জীবন-বার্তা মানবজীবন বিষয়ে কোন সিদ্ধান্ত, কোন 'criticism of life' (জীবন-সমালোচনা) উপস্থিত করা প্রাচীন ভারতীয় কবির পক্ষে একরূপ অসম্ভব ছিল, বলিতে পারি। মানবজীবন একটি ইহ-পরলোক-জীবী অব্যাহত সন্ততি রূপেই ঋষিকবির নেত্রে প্রসারিত ছিল! যে কবি এই সমগ্রতা দেখিতে পারিলেন না, তাঁহার পক্ষে কাব্য-চেষ্টা করাই যেন ঋষিকবির আদর্শে একটি অন্যায়! রামায়ণ-মহাভারতের আদর্শে এই সাহিত্য-শিষ্টাচার সমগ্র পৌরাণিক যুগের ভারতবর্ষে প্রভুতা লাভ করিয়াছিল বলিয়াও নির্দেশ করা যায়। কিন্তু হোমার রচনা করিয়াছিলেন Illiad

অর্থাৎ ঈলিয়াম বা ট্রয় নগরের অবরোধ! এই অবরোধও দশবৎসর ব্যাপী সংগ্রাম ব্যাপারের ফলস্বরূপ ট্রয় নগরের ধ্বংসেই সমাপ্তিলাভ করে। কিন্তু হোমার কেবল শেষ কতিপয় মাসের ঘটনাকেই মুখ্যভাবে অবলম্বন করিয়া আকিলেসের (Achilles) ক্রোধ এবং সমর-বিরতি হইতে সূচনাপূর্বক 'ট্রয়ভরসা' (Hope of Troy) হেক্টরের (Hector) বধ ও তাঁহার শ্মশানকৃত্য বর্ণনা করিয়াই কাব্য সমাপ্ত করিয়াছেন। ঈলিয়ড্ প্রকৃত প্রস্তাবে 'হেক্টর বধ'। এই লক্ষণেই ঈলিয়ড্ একদিকে আমাদের রামায়ণ-মহাভারতের ন্যায় 'ইতিহাস-কাব্য' হয় নাই, অথবা রঙ্গলালের 'পদ্মিনী' আদর্শের 'উপাখ্যান-কাব্য'ও হয় নাই; সাহিত্যক্ষেত্রে একটা স্বতন্ত্র theme বা বক্তব্যের আলাপশীল কাব্যরীতির আদর্শ রূপেই দাঁড়াইয়া আছে। এই রীতি-লক্ষণেই হোমার একদিকে The Father of European Poetry রূপে স্থির আছেন। আমরা বলিতে পারি ভারতবর্ষও স্বতন্ত্র-ভাবে এই আদর্শ দর্শন করিয়াছিল—মাঘের 'শিশুপালবধ' ও ভারবির 'কিরাতার্জু-নীয়মে' এইরূপ খণ্ড বক্তব্যের আদর্শটিই মুখ্য হইয়াছে। কিন্তু মধুসূদন যেমন ছন্দো-রীতি, যেমন ভাষারীতি তেমন গঠন-রীতিতেও মাঘ-ভারবির কিছুমাত্র প্রভাব গ্রহণ করেন নাই বলিয়াই প্রতীয়মান হইবে। তিনি হোমারের 'হেক্টর বধ' আদর্শে লঙ্কাসমরের খণ্ডাংশকেই বক্তব্যরূপে গ্রহণপূর্বক 'লঙ্কাভরসা' ইন্দ্রজিতের নিধন ও শ্মশানকৃত্যেই 'মেঘনাদবধ-কাব্য' শেষ করিয়াছেন। বলা বাহুল্য এই হোমারিক পাশ্চাত্ত্য আদর্শ যেমন মধুসূদনের 'তিলোত্তমাসম্ভবে', তেমন তাঁহার অনুসরণ পথে হেমচন্দ্রের 'বৃত্র-সংহারে'ও আসিয়া গিয়াছে; নবীন চন্দ্রের 'পলাশীর যুদ্ধে' ও উক্ত form বা 'কাব্যের কায়া-গঠনের আদর্শ'-ই প্রতিফলিত হইয়াছে।

বঙ্গে পূর্ব হইতে পৌরাণিক আদর্শের 'মনসা'-ও 'চণ্ডী'-কাব্য এবং 'পদ্মিনী' আদর্শের উপাখ্যান-কাব্যই প্রবল ছিল। সুতরাং কাব্যের গঠনক্ষেত্রে এই হোমারিক আদর্শ-পরিচয় একটা বিশেষ প্রাপ্তি বলিয়াই উল্লেখ করিতে পারি।

কাব্যের ক্ষেত্রে মধুসূদনের উপর তৃতীয় পাশ্চাত্ত্য প্রভাব গ্রীক দেবযন্ত্র ও দেববাদ। ইহা যে অনেক দিকে বরং একটি অযুক্ত এবং অবাঞ্ছিত পদার্থই

বঙ্গ-সাহিত্যে 'উন্নতি'র নাম-মুদ্রায় প্রচলিত করিয়াছে, অথবা পুনর্জীবিত করিয়াছে, তাহা না বলিলেও সত্য বলা হইবে না।

হোমারের কাব্য পাঠ করিলেই স্পষ্ট হয় গ্রীক দেববাদ কি ছিল; এবং কেন উহা খ্রীষ্টধর্মের আক্রমণেও এত সহজে ধ্বংস হইয়া গিয়াছিল। গ্রীক দেবগণ চরিত্রে একেবারে মানুষ অথবা উচ্চশ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাও নিম্নতন চরিত্রের জীব বই নহেন। হিংসা, প্রতিহিংসা, নরলোকে প্রভুত্বের জন্য পরস্পর ঝগড়া, পূজা পাওয়ার জন্য লোভ, পূজকের প্রতি অত্যধিক দয়া-পক্ষপাত, দুর্বৃত্ত ও ডাকাত শ্রেণীর মানুষ অপেক্ষাও ক্রূরতা, খলতা এবঞ্চ মদমত্ততা—এ সমস্ত হোমারিক দেবচরিত্রে অমানুষিক ভাবেই প্রকট হইয়াছে। গ্রীক আর্যগণের লৌকিক-ধর্ম হোমারের কাব্যছায়ায় পড়িয়া অধঃপাতে গিয়াছিল বলিয়া কোন গ্রীক দার্শনিক যে অভিযোগ করেন তাহার প্রমাণ প্রতিপদে! প্লেটো কেন যে কাব্যকে তাঁহার 'রিপাব্লিক' (Republic) হইতে নির্বাসন-দণ্ড দিয়াছিলেন, তাহাও বুঝিতে বিলম্ব হয় না। স্বর্গের রাজা 'জোভ' (Jove) এবং স্বর্গরাজ্ঞী জুনো (Juno)—উভয়ের ঝগড়া ইতরজাতীয় নরদম্পতির কোঁদলকেও হার মানায়! মনুষ্যবুদ্ধির ধর্মাধর্ম ন্যায়-অন্যায় বিষয়ে হোমারিক দেবতা মাত্রেই অপরূপ মাত্রায় স্বাধীন। মানুষিক 'নীতি' বলিয়া এক পদার্থ তাঁহাদের নাই।

হোমার কেবল কাব্যের machinery-রূপে, দুর্বোধ্য দেব-নিয়তিরূপে এই দেব-যন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, এই যদৃচ্ছাচালিত নিয়তি-শক্তি খাড়া করিয়াছেন ইহা মনে করিতে ইচ্ছা হয়। হোমারের প্রতি আমাদের ভক্তি আছে। হোমারের কাব্য কবিকল্পনার অত্যুন্নত শিল্প-গুণে, ভাষা ও ভাবুকতার কৌলীন্যে এবং সংযম-শক্তিতে বরিষ্ঠ! হোমারের মানবচরিত্রগুলিও দেবচরিত্র হইতে আপাততঃ অনেকাংশে উৎকৃষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান। সমুচ্চ মানব-আদর্শ-রসিক মহাকবি দেবতাকে এইরূপ কদর্য-কালিমায় অনুলিপ্ত করিলেন! ইহার মধ্যে একদিকে একটি অপরূপ রহস্য আছে। ইহা অন্ততঃ একদিকে সমগ্র

গ্রীক জাতিটার প্রবল সংসারভাবনিষ্ঠ এবং ভোগসুখাচ্ছন্ন অধ্যাত্মজীবন ও ধর্ম-বুদ্ধির প্রতিবিম্ব!

উপরে উপরে দুই-চারিটি দার্শনিক (Philosopher) থাকিলে কি হইবে? প্লেটো, আরিষ্টোটল, সক্রেটিস্, জেনো থাকিলেও কি হইবে? দুই চারিটি কবি, শিল্পী Jurist বা দেশের ভাগ্য-পরিচালক থাকিলেই বা কি হইবে? পরিব্যাপ্ত গ্রীকসাধারণ কি পূজা করিত, ইহ-পরকালের কোন্ আদর্শ রাখিত, তাহাদের ন্যায়-অন্যায়, পাপ-পুণ্য কোন্ আদর্শে শাসিত হইত, উহার সংবাদ হোমারিক দেবচরিত্রের মধ্যেই উজ্জ্বল হইয়া আছে! একটা নীতিচক্র-হীন—'সুদর্শনচক্র'-বিহীন শাসক সম্প্রদায় মনুষ্যের অদৃষ্ট-পরিচালক! সর্বত্র Tyranny (অত্যাচার), কেবল পক্ষপাত, কেবল might is right ('জোর যার মুল্লুক তার')! কেবল শক্তির খামখেয়ালী অথবা ভক্তের প্রতি অনুগ্রহ! সমস্ত জাতিটার ভোগ-জীবনে—সংসার-জীবনে এবং অধ্যাত্ম-আদর্শের জীবনে কিছুমাত্র সামঞ্জস্য ছিল না। স্বেচ্ছাতন্ত্রী দেবগণকে তাঁহাদের রীতিতেই জীবন পরিচালিত করিয়া পূজা! ভারতবর্ষের বৈদিক অদ্বৈতবুদ্ধি ঋষিতন্ত্র অথবা বর্ণাশ্রম-ধর্মের 'অধিকার'বাদী এবং ক্রমোন্নতি-লক্ষ্মী কর্ষণাতন্ত্র বলিয়া কোন আদর্শ সাগরবেষ্টিত এবং বাণিজ্য-লক্ষ্মীর করুণা-পরিপুষ্ট গ্রীসদেশে ছিল না। ভারতীয় অদ্বৈত 'ব্রহ্ম'-বাদের অথবা জ্ঞান-বৈরাগ্য-তন্ত্রী মুক্তিবাদের নাম-গন্ধও গ্রীকজাতির ভাব-রাজ্যে কিংবা জীবনে কিছুমাত্র ছায়া ফেলিতে পারে নাই! 'সোনার মিশীনী' আরগস্ এবং মিশর দেশের প্রাচীন জড়বাদী সভ্যতার ছায়ায় পড়িয়া গ্রীসদেশীর আর্যজাতি কেবল সংসারসুখ-নিষ্ঠ, বহির্দৃষ্টিরত এবং বহিঃ-সৌন্দর্যে মত্ত হইয়া পড়িয়াছিল—সংসারের 'খোসা'-টুকুর সৌন্দর্য উপভোগে বুদ্ধি-বরিষ্ঠ, এবং ক্রিয়া-কর্মকুশল 'বীর'-জাতিরূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছিল। গ্রীক-চরিত্র পুরাপুরি 'বীর'-আদর্শের চরিত্র; উহার মধ্যে 'দৈব'-প্রকৃতির গন্ধমাত্র নাই—অবশ্য একেবারে পরিণাম-বিহীন, সৌষ্ঠবহীন বা মোহ-কলুষ 'পশু' চরিত্রও নহে। গ্রীক সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য, এমন কি দর্শন পর্যন্ত কেবল এই ক্রিয়া-

নিপুণ, সৌষ্ঠব-স্থন্দর এবং বহির্ভদ্র 'বীরাচার'-আদর্শ-ই খ্যাপন করিতেছে! এই ভদ্রতা, এই কলা-নৈপুণ্য এবং সৌষ্ঠব-বুদ্ধি হইতেই প্রাচীন জগতের শিল্প-সাহিত্যে এবং সমস্ত ললিতকলা বিভাগে গ্রীকজাতির অতুলনীয় মাহাত্ম্য! হোমারের কাব্যেও আদ্যন্ত ঐরূপ 'শিল্পতা'রই প্রতিষ্ঠা! 'দৈব'-আদর্শ বা অধ্যাত্মতা বলিয়া কোন চরিত্রসাধনা—যাহা রামায়ণ-মহাভারতে প্রতিপদে উন্নন হইতেছে এবং যাহা 'শ্রুতিফল'-রূপে আমাদের চিত্তকে উপসংহারে দখল করিতেছে—তাহার ছিটেফোঁটাও হোমারের মধ্যে নাই! এই বহির্ভদ্র 'বীর'-আদর্শের নামই—খ্রীষ্টানের দৃষ্টিতে—pagan-আদর্শ!

ভারতীয় অদ্বৈতবাদ—বৈদিক 'আত্মা' বা 'একমেবাদ্বিতীয়ং'-বাদ—ভারতীয় দেবতাগণকে কবিকল্পনার উৎকট বিজৃম্ভণ এবং নিশ্চিন্ত লীলাখেলার হস্ত হইতে নানাদিকে রক্ষা করিয়াছে, বলিতে পারি। বৈদিক দেবতাগণকেও গ্রীকের তুলনায় নানাদিকে নিষ্কলঙ্ক বলা যাইতে পারে। ভারতীয় আর্যগণের আদিকাব্য রামায়ণ-মহাভারতের দেবতাচরিত্রও নানাদিকে ঐরূপ মানুষ-কলঙ্ক হইতে মুক্ত আছে। সংস্কৃতের পুরাণসমূহের মধ্যে আসিয়া, বিশেষতঃ প্রাকৃত ভাষার (যেমন বঙ্গভাষার 'চণ্ডী'-কাব্য ও 'মনসা'-কাব্য প্রভৃতি) পৌরাণিক কাব্যচেষ্টার সম্মুখে আসিয়াই ভারতীয় দেবচরিত্র গ্রীক দেবচরিত্রের সহোদর এবং সমধর্মা হইয়া দাঁড়াইয়াছে! পুরাণে দেবানুগ্রহের আদর্শ প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু ঐ অনুগ্রহের মূলে ছিল তপস্যা। অসুর এবং রাক্ষসগণও প্রথম প্রথম তপস্যাবলে শিব এবং শিবানীর বরযোগ্য হইয়াই সৃষ্টি-মধ্যে ক্ষমতা এবং প্রভুতা লাভ করে; পরে-পরে প্রকৃতিগত দুর্জেয় তামসিকতার বশে এবং শক্তি-প্রাবল্যে অন্ধ হইয়াই শক্তির কুব্যবহার করিতে থাকে, উহাতেই ক্রমে বিশ্বনীতির বিদ্রোহী এবং ভুবনের উপপ্লবকারীরূপে পরিণত হইয়া আপনার ধ্বংস আপনিই ডাকিয়া আনে। ইহাই হইল পৌরাণিক 'দেবানুগ্রহ'-বাদের এবং অনুগ্রহ-দর্পিত দৈত্যতা বা রাক্ষস-তত্ত্বের মূল। সুতরাং উহাও খামখেয়ালী গ্রীক 'দেবানুগ্রহ' হইতে কত ব্যবহিত। গ্রীক 'অনুগ্রহ'-বাদের মূলে সময় সময়

'পূজা' থাকিলেও ভারতীয় তপস্যা এবং 'উপস্থিত বরযোগ্যতা'র আদর্শটুকু মোটেই ছিল না। পৌরাণিক দেব-বাদও ভারতীয় আর্য-সমাজের দুরদৃষ্টকালের ঘটনা, নানাদিকে দ্রাবিড় ও অনার্য আদর্শে কলুষিতবুদ্ধির এবং উহার সঙ্গে রফারফি-বুদ্ধির পরিকল্পনা; তথাপি উহার মধ্যেও গ্রীকের তুলনায় দিনরাত্রির ন্যায় একটা পার্থক্যই অনুভূত হইতেছে। ভারতীয় ধর্মের পরমমিত্র (?) খ্রীষ্টান পাদ্রীগণ পুরাণের কোণ-কানাচ ঘাঁটিয়া ভারতীয় দেবতাগণের যে কয়টি কুৎসা আবিষ্কার করিয়াছেন, সেই কুৎসাগুলিই গ্রীকের তুলনায় যেন স্তুতিবাদ বলিয়াই শুনাইবে। প্রাচীন পাশ্চাত্ত্য জগতের অতুলনীয় শিল্পবুদ্ধি-শালী এই গ্রীকজাতি আপনাদের অধ্যাত্ম-জগতে এই সমস্ত অন্যায় এবং অ-নীতির দেবতা-মূর্তি কি করিয়া পূজা করিয়াছে? গ্রীক দার্শনিকগণের ধর্ম কেন গ্রীক সাধারণের ধর্ম হইতে পৃথক্ হইয়া পড়িয়াছিল? গ্রীক দার্শনিকগণ সাধারণের ধর্মকে কেন এত ঘৃণা করিয়াছেন? যে-গুণে ভারতীয় ঋষি সর্ব-সাধারণের ধর্মবুদ্ধি এবং দেবতার 'মানবীকরণ'-আদর্শের আবহাওয়া পর্যন্ত উচ্চতর আদর্শে পরিচ্ছন্ন রাখিতে অথবা সংস্কৃত করিতে পারিয়াছিলেন তাহা কি? এবং, কিরূপেই বা উহা পরবর্তী কালের সংস্কৃত পুরাণ এবং প্রাকৃত-ভাষার পুরাণ চেষ্টাগুলির মধ্যে আসিয়া অধঃপতিত এবং কলঙ্কিত হইয়া গেল—সেই-বৃত্তান্ত একটা স্বতন্ত্র আলোচনা-গ্রন্থের সৃষ্টি করিতে পারে। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে কেবল এই বলিয়া নিবৃত্ত হইব যে, মধুসূদন কাব্যক্ষেত্রে হোমারের প্যাগান্ (pagan) দৃষ্টান্তেই প্রবলভাবে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন; এবং উক্ত উৎসাহকে বঙ্গের 'চণ্ডী'-ও 'মনসা'-কাব্যগুলির দেব-বাদের আদর্শ প্রবলতরভাবে সমর্থিত করিয়াই 'তিলোত্তমাসম্ভব' ও 'মেঘনাদ-বধে'র দেবযন্ত্রকে আধুনিক বঙ্গ-কাব্যের ক্ষেত্রে পুনর্জীবন দান করিয়াছে। এইরূপে গ্রীক ও প্রাকৃত বাঙ্গলার পৌরাণিক দেবগণের 'দুর্বোধ্য' কার্যতন্ত্রের ছায়াতেই মেঘনাদের 'চঞ্চলা'-লক্ষ্মী এবং 'দুরন্ত', 'দুর্নিবার' কামদেবতার কার্য-প্রণালী অধ্যয়ন করিতে হইবে। 'শম্ভু-স্বয়ম্ভূ হরয়ো যেনাক্রিয়ন্ত সততং গৃহকর্ম

দাসঃ' সেই 'ভুবন-বিজয়ী' এবং নরামরে সমান বুদ্ধি, দুর্দান্ত মদনের অমানুষিক আলাপ-ব্যবহারও এইরূপ দৃষ্টিতেই সঙ্গতি লাভ করিবে।

মধুসূদন পূর্বতন কোন্-কোন্ কবি হইতে তাঁহার কাব্যের কোন্ অবস্থা অথবা ঘটনার ঋণ গ্রহণ করিয়াছেন, ভাব এবং চিন্তার কোন্ কোন্ উপায় অথবা উপজীব্য পদার্থটি কোন্ কবি হইতে প্রাপ্ত হইয়াছেন, 'মেঘনাদবধ' পাঠ করিতে করিতে তাহা নিরূপণপূর্বক অগ্রসর হওয়া এক শ্রেণীর অধ্যয়ন কিংবা ব্যাখ্যানের পদ্ধতি হইতে পারে। বিদ্যালয়সমূহে সাহিত্যের অধ্যাপনে পণ্ডিতেরা সাধারণতঃ উক্ত পদ্ধতি-ই অনুসরণ করেন। কিন্তু উহাতে বরং কবির প্রকৃত পরিচয় অপেক্ষা কাব্যার্থের অথবা বাক্যবিশেষের অর্থপরিচয়েই অধিকতর সহায়তা ঘটে ;—কবি-প্রতিভার প্রকৃত মাহাত্ম্যটাই হয়ত আড়ালে পড়িয়া যায়। উপস্থিত ক্ষেত্রে ঐরূপ পাণ্ডিত্য অথবা পাণ্ডিত্যাভিমানের প্রণালী অনুসরণ করিতে আমরা অসমর্থ। আমরা বুঝিতে চাই, 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রধান প্রাণশক্তি কোথায়? কবির রস-নিষ্পত্তির মূলটুকু কোথায়? অনেক আধুনিক কবির ন্যায়, যেমন মিল্‌টনের তেমন রবীন্দ্রনাথের ন্যায়-ই, মধুসূদনকে একজন সমুচ্চশ্রেণীর গ্রন্থজীবী-কবি বলিয়াও নির্দেশ করিতে পারি। তাঁহার মধ্যে পূর্বসূরীগণের বৃহৎ ভাবচিন্তার বিত্তঋণ ন্যূনাধিক আসিয়া পড়াই স্বাভাবিক। সাহিত্যে উন্নতিশীল কবিমাত্রের মধ্যে, জাতীয় ভাব এবং চিন্তাসূত্রের বর্ধনকারী অথবা স্বাধীন-আবিষ্কারী প্রতিভা মাত্রের মধ্যে এইরূপ একটি 'ঋণ' পূর্বভিত্তি এবং পৈতৃক সম্পত্তিরূপে ন্যূনাধিক না থাকিয়া পারে না। কেননা, পূর্বাবস্থা হইতে অগ্রসর হওয়ার নাম-ই তো 'উন্নতি'! তবে, বুঝিতে হইবে ঐরূপে 'মেঘনাদবধে'র আদ্যন্ত তন্ন তন্ন করিয়া বিচারপূর্বক উহার 'পূর্বঋণ' নির্দেশ করিয়া আসিলেও মধুকবির প্রকৃত ব্যক্তিত্ব অথবা তাঁহার শক্তি ও প্রতিভার বিশেষত্ব নির্ধারিত হইবে না। তাজমহলের ন্যায় মালমসলা এবং ইঁটপাটকেল তো আমাদের প্রত্যেকের সমক্ষেই পৃথিবীময় ছড়াইয়া আছে, তবু তো এ-যাবৎ তাজমহলের প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় স্থাপত্যশিল্প রচিত হইল না! 'মেঘনাদবধে'র প্রত্যেক শব্দই বঙ্গ-ভাষার

কোষগ্রন্থে মিলিবে, উহার ভাববস্তু ও চিন্তার অনেক ছোটবড় পদার্থ-ই হয়ত মধুসূদনের পূর্বাপর সাহিত্য-রাজপথে ছড়াইয়া আছে। তবু তো কোন দ্বিতীয় বাঙ্গালী দ্বিতীয় 'মেঘনাদবধ' রচনা করিতে পারিল না! ভারতের অপর কোন প্রাকৃত ভাষাও মধু-সংঘটন করিতে পারিল না! পরন্তু এই দৃষ্টিস্থান হইতেই মধুসূদন দত্তের প্রকৃত মহাত্মতা এবং দুর্লভতা হৃদয়ঙ্গম করিতে হইবে।

সবিশেষ বুঝিতে হইবে মেঘনাদবধের শিল্পতা-নিষ্পত্তির প্রাণস্বরূপ অদৃষ্ট-বাদটি! কেননা, উহা কাব্যটির পূর্বোক্ত দেবতাযন্ত্রের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সম্বন্ধ থাকিয়া উহার একটি সিদ্ধান্তরূপেই দাঁড়াইয়া আছে; এবং ঐ স্থানেই নিদারুণ ভ্রম নিয়তভাবে ঘটিয়া আসিতেছে। উহা কর্মফল-বাদী ভারতীয় ঋষির 'অদৃষ্ট' নহে—গ্রীক অদৃষ্টবাদ! অনির্বচনীয় এবং 'অচিন্ত্য হেতুক' 'দেবতার ইচ্ছা' বা 'দৈব' বলিতে যাহা বুঝায়, মধুসূদন হোমার হইতে সেই অদৃষ্টবাদই লাভ করিয়াছিলেন—এবং মেঘনাদবধের রসনিষ্পত্তি বিষয়ে তাহাই অবলম্বন করিয়াছেন। ত্রিভুবনবিজয়ী রাবণের উচ্চশির ঐরূপ 'দৈবাদৃষ্ট'-বশেই 'ভিখারী' রাঘবের চরণে ধূলি-লুণ্ঠিত হইয়া গেল! অন্ধ, জীবন-পথিক মনুষ্য যাহার অর্থ অথবা রহস্য খুঁজিয়া পায় না, সেই অপ্রতিবিধেয় অদৃষ্টের বাধ্য হইয়াই রাবণের পরাজয়, নির্যাতন এবং ধ্বংস! রাণী চিত্রাঙ্গদা উহাকে 'কর্মফল' বলিয়া বুঝাইতে চাহিয়াছেন, কিন্তু রাবণ তাহা গ্রহণ করে নাই। এই অদৃষ্টবাদই 'মেঘনাদবধে'র কারুণ্য-নিষ্পত্তির মূল! কবি স্বয়ং আপনাকেও যে অদৃষ্ট-কবলে এবং লক্ষ্মী-সরস্বতীর দ্বন্দ্বতলে পড়িয়া নিষ্পেষিত মনে করিতেন, উহা সেইরূপ অদৃষ্ট! 'রসাল ও স্বর্ণলতিকা'র মর্মতলেও সেই নিদারুণ অদৃষ্ট। এই 'অদৃষ্ট' বা 'বিধিলিপি' না বুঝিলে মেঘনাদবধের রস-আত্মা এবং রাবণাদির প্রতি সহানুভূতি সম্পূর্ণ বিপ্রতিষিদ্ধ হইয়া যাইবে।

রাবণের সীতাহরণ ব্যাপারকে বাল্মীকি একটি 'রাক্ষসিক' কার্য বা নৈতিক অপকর্মরূপে উপস্থাপিত করিয়াই রামের দিকে পাঠকের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু মধুসূদনের রাবণ 'আত্মসম্মান'-গর্বীরাজা,

অপ্রণয়ী কিংবা অনিচ্ছুক নারীর প্রতি তাহার কিছুমাত্র কামাভিসন্ধি নাই। ভগিনীর অপমানে নিজের প্রতাপ-শ্রী এবং রাজশ্রীকে অবমানিত মনে করিয়া 'আততায়ী' রামের সঙ্গে সমুচিত শত্রুতা এবং স্বকীয় অপমানের প্রতিশোধ সাধনের উদ্দেশ্যেই মধুসূদনের রাবণ কর্তৃক সীতাহরণ! সেজন্যই মধুসূদনের রাবণ সীতার সতীত্বধর্মের উপর কিছুমাত্র বলপ্রকাশ করিতে পারে নাই! রাজনীতি-অধিকারের শত্রুতা এবং রণনীতি-অধিকারের অরিতা-কার্যরূপেই যে মধুসূদনের রাবণ সীতাহরণ করেন, ইহা মেঘনাদের পাঠককে সর্বাগ্রে, কাব্য-পাঠের প্রবেশমুখেই বুঝিয়া লইতে হইবে। তাই, নিজেকে 'ভিখারী'-রামের হস্তে পদে পদে বিধ্বস্ত দেখিয়া মহাবীর রাবণ নির্দয় ভাগ্যলক্ষ্মী এবং নিদারুণ অদৃষ্টলিপি স্মরণ করিয়াই পদে পদে ক্ষোভে-রোষে ছট্‌ফট্ করিয়াছে ও আমাদের সহানুভূতির দাবী করিতেছে! বলবীর্যে এবং ঐশ্বর্যে পৃথিবীর প্রতিদ্বন্দ্বী এই সম্রাট-পুরুষ দৈববলে সামান্য শত্রুর হস্তেই তৃণের ন্যায় ভাঙ্গিয়া যাইতেছে! মহাবীর 'কুম্ভকর্ণ', 'বীরচূড়ামণি' বীরবাহু, এবং 'ইন্দ্রজিৎ' মেঘনাদের শক্তি-দর্প পর্যন্ত চূর্ণ-চূর্ণ হইয়া উড়িয়া গেল! এস্থলেই গ্রীক অদৃষ্টবাদ! এবং বুঝিতে হইবে, ইহা একটি 'মামুলি কথা'ও নহে। এই যুগেও আধুনিক জগতের 'জড়বাদী' অথবা 'সংশয়ী বিজ্ঞান'-দর্শনের হৃদয়েও মনুষ্য-জীবনের অপরিহার্য 'দুঃখ-তত্ত্ব' এবং 'মৃত্যু-নিয়তি'র বিষয়ে হয়ত এতজ্জাতীয় 'দুর্বোধ্য অদৃষ্টবাদ'ই আছে। যাই হোক্, এইদিক হইতে না দেখিলে যেমন কবির মানবজীবন-বিষয়ক অভিজ্ঞতা তেমন তাঁহার রাবণ-চরিত্রের অধ্যাত্ম-তত্ত্ব এবং 'মেঘনাদবধ' কাব্যের করুণ-রসের মূলরহস্যও হৃদয়ঙ্গম হইবে না। আরও বুঝিতে হইবে যে, এই 'অদৃষ্টবাদ' না ধরিলে কবি কখনও বাল্মীকি-শিষ্য ভারতবর্ষের চিত্তে 'রাবণের প্রতি পাঠকের কারুণ্য-সহানুভূতি'-রূপ রস-নিষ্পত্তি সিদ্ধ করিতেই পারিতেন না। এক্ষেত্রেই মধু-কবির গভীর শিল্প-দৃষ্টির এবং শিল্পতা-বুদ্ধির পরিচয় আছে।

এই স্থলে দাঁড়াইয়া, 'মেঘনাদবধে'র রস-মর্ম হৃদয়ঙ্গম করিবার উদ্দেশ্যে

আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, কবির হৃদয় 'অদৃষ্টবাদ' বিষয়ে পুরাপুরি 'গ্রীক' হইয়া গিয়াছিল; এবং এই গ্রীক অদৃষ্টবাদ বঙ্গ-সাহিত্যে ('নলোপাখ্যান' এবং 'শ্রীবৎস-চিন্তা' প্রভৃতি উপাখ্যানের সহিত পরিচিত বঙ্গ-সাহিত্যের পক্ষেও) নানাদিকে নব-উপনয়ন এবং নূতন প্রাপ্তি বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি! হেমচন্দ্র মধুসূদনের পথে এই গ্রীক অদৃষ্টবাদকেই 'নিয়তি' নামে, সুরাসুর-মানবের জীবন পরিচালয়িত্রীরূপে, 'বৃত্র-সংহারে' গ্রহণ করিয়াছেন! যেমন 'মেঘনাদবধে' গ্রীক দেববাদ, দেবযন্ত্র এবং অদৃষ্টবাদ দেখিতেছি, তেমন মধু-কবির অসম্পূর্ণ কাব্যসমূহের মধ্যেও—'সুভদ্রাহরণ' এবং 'সিংহল-বিজয়' প্রভৃতিতেও—উহাই দেখিতেছি। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র মধ্যেও ঐ অদৃষ্টবাদ! মধুসূদন রাজনারায়ণ বসুকে যে একটি কথা লিখিয়াছিলেন, উহা তাঁহার রাবণ-চরিত্রের মূল রহস্যটাও ব্যক্ত করিতেছে, "তুমি ইন্দ্রের প্রতি অবিচার করিতেছ, ইন্দ্র প্রকৃত বীরপুরুষ। But he cannot resist Fate !"—'নিয়তি'কে বাধা দিতে পারে নাই। এই অপ্রতিরোধ্য নিয়তিবাদ, উহা মধুসূদনের উভয় কাব্যের মেরুদণ্ড। মেঘনাদবধের অন্তরাত্মা বুঝিতে না পারিয়া যেমন তরুণবয়স্ক রবীন্দ্রনাথ, তেমন অসংখ্য বিচারক ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। 'মেঘনাদবধ' কাব্যের মেরুদণ্ড কোথায় ? 'এই কাব্যের নায়ক কে ?' 'বাল্মীকির বীরপুরুষ রাম-রাবণ এই কাব্যে আসিয়া এত বিলাপ করে কেন ?' "এই কাব্যের নায়ক রাম-লক্ষ্মণ না হওয়া তো প্রতীয়মান! কাব্যের রঙ্গভূমিতে, মহিমান্বিতভাবে অঙ্কিত হইলেও, ইন্দ্রজিতের কার্য এত স্বল্প যে তাঁহাকেও 'নায়ক' বলা চলে না। কাব্যক্ষেত্রে রাবণের জীবনও শেষ হয় নাই, অথচ এই 'বাঙ্গালী' কবির কাব্যটি আদি হইতে শেষ পর্যন্ত কেবল অপরিহার্য দুঃখ-যন্ত্রণার 'বিলাপে পূর্ণ' !" ('মূঢ় যে ঘাঁটায় সখা হেন বাঘিনীরে'—ইত্যন্ত কথা রামচন্দ্র নর্মকৌতুকের ভাবে বন্ধু বিভীষণকে বলিয়াছিলেন। তাহাও রামচন্দ্রের 'নিদারুণ ভীরুতা'র দৃষ্টান্তরূপেই ব্যাখ্যাত হইয়াছে! লেখক।) এজাতীয় সংশয় এবং বিরুদ্ধ বুদ্ধির জিজ্ঞাসা ৬০ বৎসর [কিঞ্চিদূন শতবর্ষ] ধরিয়া 'বিচারক-মহল'কে মথিত করিয়া আসিতেছে।

মধুসূদন বলিয়াছিলেন, 'বাল্মীকির সাহচর্য যতদূর পারি পরিহার করিব, একজন গ্রীক—প্রকৃত গ্রীক যেভাবে কাব্য লিখিত, সেইভাবেই কাব্য লিখিব'। [In the present poem (মেঘনাদবধ), I mean to give free scope to my investing Powers (such as they are) and to borrow as little as I can from Valmiki……I shall not borrow Greek stories but write, rather try to write, as a Greek would have done. রাজনারায়ণ বসুর নিকট মধুসূদন-লিখিত পত্রাংশ] তারপর কাব্য শেষ করিয়াও রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, "আমি মেঘনাদকে কাব্যশাস্ত্রের দোষগুণ-আদর্শে বাজাইয়া এমনভাবে গড়িয়া তুলিয়াছি যে, অতি বড় বিপক্ষ বিচারকগণ—ফরাসী সমালোচকগণও উহার প্রতি বিরূপ হইতে পারিবেন না।" ['…I think I have constructed the Poem on the most rigid principles and even a French critic would not find fault with me."—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ] অদ্বিতীয় সাহিত্য-পণ্ডিত মধুকবির এসকল কথারই বা অর্থ কি? কেহ কবির প্রতি প্রকৃত সম্মানবুদ্ধি এবং সহৃদয়তার সহিত কথাগুলি 'তলাইয়া' দেখিতে কিংবা "বাল্মীকিকে ভুলিতে"ও চাহেন নাই।

আমরা বলি, মধুসূদনের দিক হইতে দেখিতে জানিলে মেঘনাদকে এসকল বিষয়ে অনিন্দিত-শ্রী এবং দিব্যসুন্দর-কাব্য বলিয়াই বুঝিতে পারিব। মেঘনাদের নায়ক সপরিজন, নিদারুণ অদৃষ্ট নিয়তির নাগিনী-পাশবদ্ধ এবং অপরিহার্য-ভাবে মৃত্যুকবলোন্মুখ রাবণ। লঙ্কাপুরীর আশা-যষ্টি ইন্দ্রজিতের দৈব নিয়োজিত বিনাশ রাবণদৃষ্ট-নাটকের অন্তিমাঙ্কের চূড়ান্ত পূর্ব দৃশ্য ব্যতীত আর কিছুই নহে। উহার পর, রাবণের শেষ প্রত্যক্ষবৎ প্রতীয়মান বলিয়া পরম শিল্প-ফলশ্রুতির আদর্শেই কাব্যক্ষেত্রে পরিহৃত হইয়াছে। মানবজীবনের অপরিহার্য নিয়তির 'ফলশ্রুতি'ই মেঘনাদবধ কাব্যতরুর সকল গৌণ-মুখ্য রসধারা, ঘটনা-পল্লব এবং শাখা-প্রশাখার মূল কাণ্ড—কাব্যটির করুণরসাত্মক স্থায়ীভাবের মেরু-দণ্ড। "নিয়তি কেন বাধ্যতে?" "কালো বলী কেবলঃ।"

গ্রীক 'দৈব'বাদের মূলতত্ত্ব যাহারা বুঝিয়াছেন তাঁহারা দেখিবেন, গ্রীক ভাস্কর্যের পরম শক্তিশালী শিল্পনমুনা লেওকুন (Laocoon) কি অতুলনীয় ভাবুকতায় উহাকে প্রমূর্ত করিয়াছে। লেওকুন-পরিবার সর্ববলীয়ান্ এবং দুরতিক্রম্য দুরদৃষ্টের মহানাগপাশে পড়িয়া ছট্‌ফট্ করিতেছে—ঐ মহাপাশ কোনমতে ছাড়াইবার যো নাই। ধ্বংস অনিবার্য। গ্রীক 'অদৃষ্ট'বাদের দৃষ্টিতে উহাই তো মনুষ্যজীবন। ঐ চিরপ্রসিদ্ধ ভাস্কর্যমূর্তি মনে রাখিয়া চিন্তা কর Laocoon Group-এর বামদিকের মূর্তি বীরবাহু (বা কুম্ভকর্ণ ?) ডাহিনে মেঘনাদ—মহাসর্পের দংশন-জর্জরিত মেঘনাদ। মধ্যস্থলে, নাগপাশের পূর্ণ পীড়নের কেন্দ্রস্থলে, মৃত্যু-দংশনের অব্যবহিত পূর্বমুহূর্তে, ঘনীভূত ক্ষোভ রোষ-বিষাদের অশক্ত বীর্যমূর্তি রাবণ—মহাপুরুষ রাবণ। ইহাই তো লেওকুন-প্রমূর্তি—যাহা গ্রীক 'নিয়তি'—ভাবের বস্তুগত পরিকল্পনা এবং যাহা গ্রীকপণ্ডিত মধুসূদনের মনে না থাকিয়া পারে না। ইহার ছায়ায় মেঘনাদকাব্যকে দর্শন কর—উহার অন্তরতম প্রদেশ পর্যন্ত বিস্পষ্ট হইবে, সমস্ত আপাত অসঙ্গতিরও সঙ্গতি হইবে।

রাবণকে নিপাতিত করিবার জন্য তাহার প্রত্যক্ষতার অন্তরালে, তাহার জীবন-পরিচালক যে নিয়তিচক্র চলিতেছিল, কবি তাহাকেই প্রমূর্তি দানপূর্বক কাব্যের ক্ষেত্রে উহার দেবযন্ত্ররূপে উপস্থিত করিয়াছেন। রাবণ পদে পদে 'বিধি' ও 'বিধাতা'রূপে ঐ নিদারুণ অদৃষ্ট ষড়যন্ত্রকেই লক্ষ্য করিতেছে।

অপরাজিত বীর্যশালী রাবণ 'বিলাপ' করিয়াছে! দেখিতে হইবে, কাব্যের ক্ষেত্রে ঐ বিলাপের প্রয়োগ-লক্ষ্য। উহার উদ্দেশ্য রাবণের চিত্ত-দুর্বলতা বা কার্পণ্য তো নহে! পাঠকের সমক্ষে নিদারুণ অদৃষ্ট-পীড়নার অসহ্য শক্তির পরিমাণটুকু প্রকাশ! এবং দুঃখ-পীড়ার এতটা পরিমাণ সত্ত্বেও রাবণের সহ্যতা-শক্তি এবং তাহার ধৈর্য ও বীর্যশক্তির সঙ্কেত! জীবনে চিরকাল অপ্রতিদ্বন্দ্বী বীরপুরুষের মুখে নিজের 'অকারণ' দুরদৃষ্টের প্রতি রোষ এবং ক্ষোভজনিত হাহাকার! যে অসহ্য যাতনায় পদে পদে নিষ্পেষিত হইয়া তিলে তিলে মরিবে

তথাপি কোনমতে আত্মসমর্পণ করিবে না—এমন আত্মনিষ্ঠ এবং দৃঢ়প্রতিজ্ঞ বীরপুরুষের অশক্ত ক্ষোভরোষ-গর্জিত হাহাকার। 'মন্ত্রৌষধিরুদ্ধ বীর্য' মহাসর্পের হা হুতাশ। প্রচণ্ড অগ্নিজ্বালায় দহ্যমান মহাচুল্লীর তপ্ত নিশ্বাস। রাবণচরিত্রের এই রহস্যময় করুণ-লক্ষণটি—'গ্রীক'-লক্ষণটি বুঝিতে না পারিলেই অবিচার! উহা যে, অদৃষ্টনিয়ন্ত্রিত, বিষাক্ত-অঙ্গাবরণে আবদ্ধ হইয়া মহাবীর হারকিউলিসের হাহাকার! দেবযন্ত্রিত, অনির্বাণ বিষ-জন্য ক্ষত সর্বাঙ্গে ধরিয়া মহাপুরুষ ফাইলেক্‌টেটের ছট্‌ফটি! কুক্ষিদেশে করাল দংষ্ট্রাবদনা, ত্রিমুখী কুকুরীর অনিবার কামড় সহ্য করিয়াও মনুষ্যজাতির মহামহিম উদ্ধারকর্তা প্রমীথিউসের 'বিলাপ'-নিয়তি! গ্রীক অদৃষ্টবাদ না বুঝিয়া 'মেঘনাদবধ' বুঝিতে যাওয়া!

বলিয়াছি, কবি মধুসূদন আপন অদৃষ্টের ডাকিনী-নিয়তির বাধ্য হইয়াই যেমন স্বয়ং জীবনপথে পরিচালিত, তেমন সাহিত্যক্ষেত্রে উহার সহমর্মতা-সূত্রেই গ্রীকশিষ্য! দৈবনিয়ন্ত্রণা-বাদী হোমার, এস্‌কাইলাস ও সফোক্লিসের শিষ্য! ইংরাজী সাহিত্যেও সম্পূর্ণ গ্রীক আদর্শে বিরচিত সেই অদ্বিতীয় Samson Agonistes-এর কবি মিল্‌টনের শিষ্য। গ্রীক সাহিত্য শিল্পের আদর্শ ছিল Humanism—মানবত্ব। শিল্পমাত্রই মানবজীবনের তত্ত্বদর্শন বা Criticism of life. যেই 'মানবত্ব' আদর্শে হোমারের দেবতাগণ পর্যন্ত অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রণায় মানুষের দেহ-ধর্মে ছট্‌ফট্ করে, সেই মানব-ধর্ম! মানুষের এই ছট্‌ফটি দেখাইবার উদ্দেশ্য কি? তাহাদের দৈন্য বা কার্পণ্য দেখাইবার জন্য তো নহে—অদৃষ্ট যন্ত্রণার প্রবলতা, দুর্বিষহতা, একেবারে অসহ্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে! এত যন্ত্রণায় পড়িয়াও মানবের মহাপুরুষগণ, স্যামসন্, প্রমীথিউস বা ফাইলেক্‌টেটগণ নিজের সূত্র, আত্মমুষ্টি এবং আত্মকেন্দ্র যে ছাড়েন নাই, মহাপুরুষগণের সেই মাহাত্ম্য সমুজ্জ্বল করিয়া দেখাইবার উদ্দেশ্যে! মহাপুরুষমাত্রের জীবনেই তো এই দুঃসহ নিয়তির লক্ষণ! গ্রীক-দর্শন এবং গ্রীক-শিল্প মনুষ্যের জীবন-নিয়তি অধ্যয়ন করিয়া ঐ তত্ত্বটুকুই সর্বথা বলীয়ান্ বলিয়া দেখিয়াছে। নিয়তির নিদারুণ কাঠুরিয়া একে একে জীবনের সকল সুখ-সোয়াস্তি ও আশাভরসার শাখাদলকে কাটিতেছে,—

স্বয়ং দুর্বিষহ যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, মৃত্যুর দংষ্ট্রাকরালবদন প্রত্যক্ষ হইয়া সম্মুখে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে—তবু নিজের ব্যক্তিত্ব, নিজের আত্মাদর ছাড়িবার কথামাত্র নাই, আত্মসমর্পণের লেশমাত্র নাই! এই তো মনুষ্যত্ব-ইতিহাসের মহাপুরুষ! এই ছট্‌ফটি না বুঝিয়াও 'মেঘনাদবধ' বুঝিতে যাওয়া!

রাম-লক্ষ্মণকে 'হীন' করা হইল কেন? রাবণ মেঘনাদ হইতেই আত্মার ক্ষমতায় যেন 'দুর্বলতর' করা হইল কেন? বাল্মীকিকে না-ভোলা, এমন কি অনেক স্থলে কবিগুরুর প্রয়োগ-আদর্শটিও প্রকৃত প্রস্তাবে না-বোঝার কারণেই এইরূপ প্রশ্ন উঠিতে পারে। বেচারা কবি, 'মাথার দিব্য' দিলেও কেহ তাঁহার দিক হইতে দৃষ্টি করিতে চাহে নাই! ঐরূপ না করিলে রাম-লক্ষ্মণের দৈবপুষ্ট শক্তি এবং রাবণ-মেঘনাদের অদৃষ্ট-শক্তি-জন্য পরাজয় ও বিনিপাত কি করিয়া উজ্জ্বল হইত? 'অদৃষ্ট' কাব্যের রসনিষ্পত্তি হইত? বাল্মীকি এবং কৃত্তিবাসও কি অনেক স্থলে প্রকারান্তরে তাহাই করেন নাই? যেমন বলিয়াছি, ইন্দ্রজিতের পতন রাবণ-নায়কের জীবনের অন্তিমপূর্ব দৃশ্য ও চরমের মহাশ্বাস ব্যাপার ব্যতীত আর কিছুই নহে। মেঘনাদের মৃত্যুর পর অপরিহার্যভাবে পতনোন্মুখী হইয়া ভিত্তিমূল পর্যন্ত কম্পমানা 'সৌধকিরীটিনী' 'সপ্ত দিবা নিশি' বিলাপ করিয়াছে—আমাদের মনোজগতে দাঁড়াইয়া হাহাকারেই রত আছে; সর্বস্বহারা রাবণ, নিজের সর্ববল-গর্বের আশ্রয় ইন্দ্রজিৎ-পুত্রের চিতাপার্শ্বে মহাবসানের সেই 'সর্ব-উলঙ্গ ভিখারী' বেশে চিরকালের জন্য দাঁড়াইয়া আছে! রাবণের বধ সাধন করিলে বোধ করি 'মেঘনাদবধ' কাব্যের এতটা মাহাত্ম্য, উহার 'রস' প্রয়োগের এতটা অধ্যাত্ম-শক্তি জমিতে পারিত না। লঙ্কা কাঁদিতেছে, কিন্তু কদাপি আত্মসমর্পণের কথা তো মনে আনিতেছে না! রাবণ বিলাপ করিতেছে অসহ্য পীড়া-ধর্মে—দেহি-ধর্মে, ভুলেও তো রামের নিকট পরাভব স্বীকারের কথাটুকুন ভাবিতেছে না! মধুসূদন তাহাকে কাঁদাইয়াছেন, তাহার আত্মার ঐ বিজয়শ্রী উজ্জ্বল করিবার উদ্দেশ্যে। এই অনম্যমেরুদণ্ডী রাবণ! সংসারে মেরুদণ্ডী মহাপুরুষগণ কি এইরূপে অবস্থার অসহনীয় নিষ্পেষণেও চিরকাল সত্যের জন্য, ভাবের জন্য,

আত্মমর্যাদার জন্য সংগ্রাম করিয়া চলিয়া যান না—মরিয়া যান না? এই স্থানেই 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নৈতিক (Moral) শক্তি—রাবণ-চরিত্রের নৈতিক ভিত্তি! মনুষ্যের জন্য দৃষ্টান্ত বা আশ্বাস খুঁজিতে হয়, তাহাও এই স্থানে। এই তো 'মেঘনাদবধ' কাব্যের শিল্পাত্মা—গ্রীক শিল্পাত্মা—অথচ সর্বজনীন রসনিষ্পত্তি! মানবজীবনের সুগহন নৈতিক দ্বন্দ্বকে বাস্তবমূর্তি প্রদান করিয়া সাহিত্যক্ষেত্রে একটি বরিষ্ঠ শিল্পসিদ্ধি! বঙ্গীয় সাহিত্য-রসিক মাত্রের অন্তরাত্মা এতকাল যাহা হয়ত অতর্কিতে বুঝিয়াছে, অথচ বাক্যমুষ্টিতে ধরিয়া আপত্তিকারিগণের সমক্ষে উপস্থিত করিতে পারে নাই!

বলিতে কি, এইরূপ মহনীয় আদর্শের দ্বিতীয় একটি চিত্র বঙ্গসাহিত্যে নাই। এই তন্ত্রীয়, এই জাতীয় অপর একটি কাব্য বা নাটক বঙ্গ-ভাষায় রচিত হয় নাই। হেমচন্দ্র নিয়তিযন্ত্র অবলম্বন করিয়াছেন; বৃত্রসংহারও সেক্সপীয়রের 'করুণান্ত' নাট্য-আদর্শে উচ্চাভিলাষী বৃত্র-জীবনের একটি 'ট্রাজিডি' হইয়াছে। সেক্সপীয়রের অথেলো, লীয়ার, হ্যামলেট বা ম্যাক্‌বেথ—পরম করুণরসাত্মক ট্রাজিডি সত্য, উহাদিগকে হয়ত গ্রীক 'ফেট' (Fate) বা নিয়তির আদর্শেও ব্যাখ্যা করা যায়। কিন্তু উহাদের নায়কগণের করুণান্ততার মধ্যে 'প্রমীথিউস বাউণ্ড' বা 'ফাইলেকটেটের ন্যায় মনুষ্যের অন্তর্বলের জয়শ্রী উদ্দিষ্ট হয় নাই। উহারা 'মৃত্যুর কোলেও আত্মার বিজয়-গাথা' নহে। কেবল মিল্‌টনই অন্ধ স্যামসনের অদৃষ্ট পীড়া-বিজয়ী আত্ম-সামর্থ্যের মধ্যে এবং শেলী 'প্রমীথিউস আন্‌বাউণ্ড' (Prometheus Unbound) নামক কাব্যে প্রমিথিউসের সহত-শক্তির মধ্যে প্রকৃত গ্রীক-শিষ্যতার পরিচয় দিয়াছেন। মেঘনাদের ন্যায় এইরূপ বিনির্মল গ্রীকতন্ত্রী করুণ-কাব্য পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিগণও অধিক রচনা করিতে পারেন নাই। এইস্থানেই এই বাঙ্গালী কবি মধুসূদন দত্তের মহার্ঘতা!

এই কাব্যরচনা করিতে বসিয়া মধুসূদন কিরূপ 'মধুমত্ত' হইয়া উঠিয়াছিলেন—মহীয়সী বাক্-দেবতার অধিষ্ঠানে নিজেকে কিরূপে একেবারে সপ্তম স্বর্গে উত্তোলিত মনে করিতেছিলেন—তাহার প্রমাণ দেখুন। "মেঘনাদ একটা মহিমাময় কাব্য

হইতে চলিয়াছে। ইহার অমিত্রচ্ছন্দও সঙ্গীতের-তত্ত্বকে অপূর্বভাবেই আয়ত্ত করিতেছে। আমার এই ছন্দ যেমন ভার্জিলের ছন্দের মতনই মধুরতায় বহিয়া চলিয়াছে, তেমন সরল এবং কোমল ভাষাকেও অবলম্বন করিতেছে। ইহার মধ্যে 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র সেই দুর্দান্ত সমুন্নতি আর দেখিতে পাইবে না।" পুনশ্চ—"আমার মাতৃভাষা আমার হস্তে এমন অফুরন্ত ভাণ্ডার দিবেন বলিয়া তো স্বপ্নেও মনে করিতে পারি নাই। তোমাকে বলিতে কি, এই কাব্যের স্থল-বিশেষ আমার হৃদয়কে আত্মশ্লাঘাতেই পূর্ণ করিতেছে। আমার মধ্যে চিন্তা এবং কল্পনার উদ্রেক মাত্রই যেন ভাষা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়—এমন সমস্ত কথা, যাহা কখনও জানিতাম বলিয়াই মনে করি নাই। ইহা একটা পরম রহস্য—তোমাকে বলিলাম।"

যে কবি এইরূপে ভাবাক্রান্ত এবং আত্মবিস্মৃত হইয়াই কাব্য রচনা করিতে পারেন, তাঁহার সেই কাব্যে অতর্কিতে তাঁহার নিজের বুক হইতে রক্ত প্রবাহিত হইয়া গিয়াই উহার 'প্রাণপ্রতিষ্ঠা' করিয়া দেয়। এবং সেই রক্তের উত্তাপ প্রাণীমাত্রের বুকে লাগিলেই তাহাকে আবিষ্ট না করিয়া পারে না। ক বর পক্ষে পাঠকের হৃদয়কে নিজের দাসানুদাস করিবার অন্য উপায় নাই। মধুকবিও সেই উপায়ে কি করিয়া বসিলেন? মেঘনাদ এমন একটা কাব্য হইয়া গেল—যাহা পাঠ করিতে বসিলে পাঠকের হৃদয় আত্মবিস্মৃত হইয়া একেবারে কবির দাসানুদাস হইয়া যায়। তাহার আর বিচারের শক্তিও যেন থাকে না। কবির হাজার দোষ থাকুক, কবি পাঠকের চিরন্তন সংস্কারকে, এমন কি ধর্ম-বিশ্বাসকেও যতই প্রচণ্ডভাবে আঘাত করুক, পাঠকের মুখ খুলিবার শক্তি নাই, সে মুগ্ধ—বিস্মিত, স্তম্ভিত। ঠিক 'মৈস্মরী' (Mesmerism) বিদ্যায় আবিষ্টের ব্যাপার। পাঠক বুঝিতেছে, এ যে এক অসুরের হাতেই পড়িয়াছে! সে আপন ইচ্ছার বশীভূত করিয়া, আপন শক্তির প্রবল বাত্যা-চক্রে ফেলিয়া তাহাকে স্বর্গ-মর্ত্য-নরকে ঘুরাইয়া আনিতেছে। তাহার মন বুদ্ধি এবং বিশ্বাসকে ইচ্ছামত ওলটপালট করিয়াই খেলা করিতেছে! তাহার কি রা-শব্দ করিবার সাধ্য আছে? আর

বিচার এবং সমালোচনা—সে তো পরের কথা। কিন্তু এই বিচারশক্তিও কি পাঠকের অটুট থাকিবে ? যে একবার এই প্রচণ্ড যাদুকরের হাতে পড়িয়াছে—একবার 'মেঘনাদবধ' প্রথম হইতে শেষ পংক্তি পর্যন্ত পাঠ করিয়াছে, তাহার বিচারশক্তিটাও কিয়ৎ পরিমাণে খোয়াইয়া গেল। সে সমস্ত ভুলিয়াই বলিতে বাধ্য হইল, 'মধুসূদন তুমি কবি—যথার্থই বড় কবি!' সাহিত্যজগতের অন্য বড় কবির তুলনায় মধুর 'হাজারো দোষ' মনের মধ্যে গিজ্ গিজ্ করিতে থাকিলেও এ কথা না বলিয়া কাহারও ছাড়া নাই!

সেকালে মধুসূদনের বিপক্ষদলের বড় বড় পণ্ডিত ব্যক্তি যাঁহারা মধুকে নিন্দা-টিট্‌কারী করিতে কসুর করিতেন না, যাঁহারা 'তিলোত্তমাসম্ভব' পাঠ করিয়া নাকি বলিয়াছিলেন, 'হাঁ, উত্তম উত্তম অলঙ্কার আছে; মন্দ হয় নাই,' তাঁহারা যেমন 'মেঘনাদ'কে বঙ্গের শ্রেষ্ঠ-কাব্য বলিতে বাধ্য হন, তেমন একালেও বঙ্গ-সাহিত্যের এত উন্নতি সত্ত্বেও, উহার ভাবুকতার ভাণ্ডারে এবং ভাষার গতি এবং বাঁধুনিতে এত বুদ্ধিশালিতা, এত মনস্বিতা, এত পরিমার্জনা এবং এত কোমলতা-বিকাশ সত্ত্বেও অনেক পাঠক এই কথাই বলিতে বাধ্য হইতেছে। মধু তাঁহার বন্ধুর নিকট লিখিলেন, "It has silenced our cavillers, isn't that a victory old chap?"

'মেঘনাদবধ' রচনার সময়ে মধুসূদনের প্রয়োগ-আদর্শ কি ছিল? 'আমি যদি প্রকৃত রস উদ্রেক করিতে পারি, তাহা হইলে বাল্মীকির রাম-লক্ষ্মণের চরিত্র এদিক ওদিক হইল, কি রাক্ষসগণের চরিত্র কবিগুরুর হইতে বিপরীত হইয়া গেল, তাহাতে কি আসে যায়? উহারা না হয় আমারই রাম-লক্ষ্মণ এবং রাক্ষস।' 'রাবণের চরিত্র আমার কল্পনাশক্তিকে আগুনের ন্যায় উদ্দীপ্ত করে; এ একজন জবরদস্ত—লোক Grand fellow! The subject is heroic; only the monkeys spoil the joke! but I shall look to them.' আমি দেখিব, মানুষ আমার রাক্ষসরাজের সঙ্গে বাধ্য হইয়াই সহানুভূতি করে কি না!' ইহাও একটি জবরদস্ত বিদ্রোহের কথা—কিন্তু

বাঙ্গালার পাঠকগণকে তো একেবারে কাঁদিয়াই সে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিতে হইয়াছে।

আমাদের বুঝা উচিত, মধুস্থদনের এই জবরদস্তি কিসে খাটিল। মনুষ্য-হৃদয়ের কোন্ ছিদ্রপথে কবি আমাদের চিরার্জিত সংস্কারের বিদ্রোহী হইয়াও 'মেঘনাদবধ' কাব্যের প্রতিষ্ঠা সিদ্ধি করিলেন? আমরা দেখিয়া আসিয়াছি, রাম-লক্ষ্মণের মনুষ্য সহচর ছিল না, কপিসৈন্যে স্ত্রীজাতি ছিল না, 'সৌধ-কিরীটিনী লঙ্কা'র ঐশ্বর্যরাজী ছিল না বলিয়া কবি কেমন সঙ্কটে পড়িয়াছিলেন! অথচ তাঁহারাই বিজয়ীপক্ষ! কবি-কল্পনাকে অবাধে খেলাইয়া পাঠকের সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার জন্য কবির দৃষ্টিতে সে দিকে বিশেষ কিছুই ছিল না। একেবারে অসম্ভব ছিল এমন কথা বলা যায় না; তবে মানিতে হইবে, বাহ্যিক ঐশ্বর্যের পূজারী মধুস্থদনের পক্ষে, তাঁহার আত্মনিষ্ঠা সহানুভূতি এবং প্রয়োগ-কলার পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই তিনি একরূপ দুঃসাধ্য সাধনে অর্থাৎ বিজিতের দিকে পাঠকের সহানুভূতি সাধনে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু কোন্ কৌশলে সিদ্ধিলাভ করিলেন? কবি কোন্ সূত্রে, হৃদয়ের কোন্ ছিদ্রপথে তাহাকে আক্রমণ-পূর্বক এত সহজে অভিভূত করেন, বিজিত এবং বশীভূত করিয়া ফেলেন? তাহার রহস্য আর কুত্রাপি নাই, শিল্প-শাস্ত্রের সেই নিতান্ত 'জানা কথা'—করুণরসে! সাহিত্যে এমন কাব্য আর আছে কিনা জানি না—যাহার কান্নাতেই আরম্ভ, কান্নাতেই পরিণতি, কান্নাতেই সমাপ্তি; অথচ উহা কোনদিকে মনুষ্যমনের কিছুমাত্র অবসাদকর হয় নাই। করুণরস স্বয়ং 'আদিরসে'রই একটি গভীরতর পরিণতি—সহানুভূতি এবং প্রীতির উদ্রেকেই উহার প্রধান শক্তি। মধুস্থদন উহা যে-পরিমাণে প্রয়োগ করিয়া গিয়াছেন, বঙ্গের অপর কোন কবি এ পর্যন্ত তাহার নিকটবর্তী হইতে পারেন নাই। এই করুণরসে অভিভূত হইয়া তৎকালের কোন সমালোচক বলিয়া উঠেন, 'মধুস্থদন মিল্টনকেও অতিক্রম করিলেন।' সহৃদয় মধু উহাতেই লিখিয়াছেন, 'মিল্টনকে অতিক্রম! উহা একেবারে পচা কথা। কেহ কালিদাস, ভার্জিল অথবা ট্যাসোর সমকক্ষ

হইয়াছে বলিলে তাহার কিছু অর্থ হয়—কারণ তাঁহারা মানুষ। মিল্টনকে কেহই অতিক্রম করিতে পারে না—কারণ, মিল্টন দেবতা।' ['Some say it is better than Milton—but that is all bosh—nothing can be better than Milton; may say it licks Kalidas; I have no objection to that. I don't think it impossible to equal Virgil, Kalidasa and Tasso. Though glorious, still they are mortal poets; Milton is divine—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত পত্র।] যা হোক এস্থলে কিন্তু করুণ রসেরই বিজয়াশক্তি আমরা টের পাইতেছি। জগতের বড় কবিগণ প্রায় সকলেই আমাদের হৃদয়ের এই করুণ-তারে আঘাত করিয়াই চিরস্থায়ী প্রীতিসম্বন্ধ লাভ করিয়াছেন। অন্যভাব যতই সুন্দর, মধুর অথবা মুগ্ধকর হউক না কেন, হৃদয়কে নাড়া দেবার শক্তিতে কেহই করুণের তুল্য নহে। কবি অপর সহস্র প্রকারে হৃদয়কে সুখাবিষ্ট, শান্ত, তৃপ্ত, নর্তিত বা স্তিমিত করিতে পারেন, কিন্তু চিত্তের গভীর হইতে গভীরতম তলদেশ পর্যন্ত আলোড়িত করিয়া উহাকে একেবারে গলাইয়া ফেলার পক্ষে অপর কোন উপায়ই করুণের তুল্য নহে। এজন্যই কমেডি অপেক্ষা ট্রাজেডির অধিকতর শক্তি এবং মাহাত্ম্য! আমরা দেখিতেছি, মধুসূদন জীবনের দুরবস্থার বিদ্যালয়ে যে-শিক্ষা অর্জন করেন, উহাই পরিশেষে বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে অমরতা উপার্জনে সাহায্য করিয়া গিয়াছে।

এই করুণ ভাবটিই 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র দুর্দান্ত-উল্লাসী অমিত্রচ্ছন্দকে মোলায়েম করিয়া গিয়াছে। এই মধুসূদন নামক ব্যক্তিটি কেমন বুকের কাছে বুকটি ধরিয়াই কথা বলে! তাহার কোন ফিলজফি (দর্শন) নাই—কিন্তু সাহিত্যে সকল ফিলজফি যেজন্য, সেই আন্তরিকতাটুকু যেন লোকটির স্বতঃসিদ্ধ হইয়া গিয়াছে; প্রকৃতিমাতার হস্ত হইতে স্বাভাবিকতার 'পাশ' (pass) লইয়াই যেন বঙ্গসাহিত্যে নামিয়াছেন। অন্য মানুষ, অন্য অহঙ্কারী কবি মুখ খুলিতেই তাঁহাদের অহঙ্কার, মুরুব্বিপনা এবং মুন্শীয়ানাটাই যেন

আমাদিগকে পদে পদে আহত করে; কিন্তু এই লোকটির যত অহঙ্কারই হউক না কেন, তাঁহার অহঙ্কার যেন বরং প্রীতি-করুণারই উদ্রেক করে! মেঘনাদবধের রচনারীতির প্রধান মাহাত্ম্য হইতেছে যে, উহা পড়িতে বসিয়া সকলে মনে করেন 'ইহা তো আমারই লেখা। আমিও এরকম লিখিতে পারি।' যদিও, কলম ধরিলেই ভুলটি ভাঙ্গিয়া যাইবে। মধুসূদনের মধ্যে কোন দার্শনিকতা নাই, কোনরূপ intellectuality-মনস্বিতার বাতিক বা তত্ত্ব-বিলাসিতা নাই। কিন্তু, একটু নিবিষ্ট-দৃষ্টি করিলেই বুঝা যাইবে, মধু হৃদয়ের যে-তন্ত্রে আঘাত করেন, সহস্র মনস্বিতাতেও তাহা পারে না! আপাততঃ সরল কথার মধ্য দিয়াই হৃদয়কে স্পর্শ করিয়া, উহাকে অধিকার করিয়া একেবারে বশীভূত করা। এ স্থলেই প্রতিভা—একরূপ অজেয়-প্রতিভা! অবশ্য বাঙ্গালীর রসানন্দশীল কবি কৃত্তিবাস এবং কাশীরাম দাসই বাঙ্গালী মধুসূদনকে বাক্যরীতির এপথে জাগাইয়া দিয়াছিলেন। আমরা জানি, মিল্টনের ছন্দের মধ্যেও অপরাজেয় প্রাবল্য, উদ্দীপ্তি, উদ্ধতি এবং সমুন্নতি আছে, কিন্তু করুণবাক্যে হৃদয়ের গুপ্ততারে মধুসূদনের ন্যায় স্পর্শ করার শক্তি নাই!

ব্যাপারটাই বা কি! সমগ্র কাব্যটি জুড়িয়া পাত্রগণ অপরিহার্য দৈব-দুঃখের মহাপাশে পড়িয়া কেবলই ছট্‌ফট্‌ এবং হা-হুতাশ করিতেছে! রাম লক্ষ্মণের জন্য, সীতা অতীত জীবনের সুখের কথা স্মরণ করিয়া চিত্রাঙ্গদা মন্দোদরী পুত্রশোকে, প্রমীলা স্বামীশোকে, রাবণ সর্বস্বনাশী অদৃষ্টের বজ্রপীড়ায় নিষ্পেষিত হইয়া ক্ষোভে, রোষে অথবা নিরাশ্রয় দুঃখেই বিধাতাকে অভিযোগ-পূর্বক মর্মভেদী হাহাকার তুলিয়াছে! এই কান্নায় কাঁদিয়া আমাদের কি লাভ? কেনই বা উহা সাহিত্যের ক্ষেত্রে রসাল বলিয়া মনে হয়? উহার মধ্যে যে সংসারবাসী মনুষ্য-আত্মার চিরকালীয় ক্রন্দনের সোদরত্ব এবং সমতা আছে—ঐরূপে মনুষ্যজীবনের ন্যূনাধিক গুপ্ত অথবা প্রত্যক্ষ সত্যের সংবাদটিই আছে! এই ভবজীবনের অপরিহার্য রোগশোক, দুঃখ-দুর্দশা এবং মৃত্যু-পরাজয়ের

মর্মগত প্রতিকৃতিটুকুই আছে! তাই বুঝি, করুণরসে মনুষ্যের এত সহানুভূতি! কোন-না-কোন মতে চক্ষুর জল ফেলিতে না পারিলে 'কাব্যপাঠের ফলে'ই যেন 'পাক' ধরিয়া উঠে না। সুখের অপেক্ষাও বরং দুঃখের কথাতেই যেন মনুষ্য-হৃদয়ে গভীরতর রেখা অঙ্কিত করে। এই আদি-অন্তে অন্ধকারময়ী প্রবাসপুরী, এই মর্ত্যপুরী, এই মৃত্যুপুরী! ইহার অধিবাসী মাত্রেই তো জন্মগত অদৃষ্টে ন্যূনাধিক দুঃখী! পৃথিবী যে মনুষ্যের সকল কামনা পূর্ণ করিতে, তাহাকে কোন দিকেই নির্মল সুখ দান করিতে পারে না। তাই মনুষ্যের নিহতার্থতা, নিষ্ফলতা এবং পরাজয়ের দীর্ঘনিশ্বাসের প্রতি মনুষ্যহৃদয়ের এতই মমতা—এতই সহোদর স্নেহ!

মধুসূদন কাব্যের ক্ষেত্রে করুণরসকে কত মহার্ঘ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, রাজনারায়ণের নিকট পত্রে তাহার প্রমাণ আছে—"যে কবির সৌন্দর্যজ্ঞান আছে, যে কবি কোমল-মধুর এবং করুণরসে মনুষ্যের হৃদয়কে সমুন্নত (sublime) ভাবলোকে উন্নীত করিতে পারে, সে কবির তরণী কালস্রোতে আপনার বৈজয়ন্তী উড়াইয়া চলিয়া যায়! পাঠকগণ একযুক্ত হইয়াই সে কবিকে প্রীতি-পূজার অর্ঘ্য দান করে। সংস্কৃতের কালিদাস, লাটিনের ভার্জিল এবং ইটালীর ট্যাসোর দিকে চাহিয়া দেখ—আমার বিশ্বাস, ইংরাজী-সাহিত্যে ইহাদের সমকক্ষ একজন কবিও নাই। ইংল্যাণ্ডের মিল্টন মহত্তর জীব। তাঁহার নিজের শয়তানের মতই মিল্টন উচ্চতমভাবে ভরপুর। কিন্তু 'মধুর' বলিতে যাহা বুঝায়, মিল্টনে তাহার লেশমাত্র নাই। মিল্টন মনুষ্যের চিত্তকে উচ্চতম ভাবশিখরে তুলিয়া ধরিতে পারেন; কিন্তু মনুষ্যহৃদয়কে তিনি স্পর্শ করিতে পারেন না, বলিলেই হয়। উহার ফল কি হইয়াছে! মিল্টনের নাম পরম দীপ্তিতে উর্জস্বল হইয়া আছে—কিন্তু তাঁহার পাঠকসংখ্যা কত পরিমিত। মিল্টন তাঁহার শয়তানের মতই অতুলনীয়। আমাদিগকে স্বীকার করিতেই হয় যে, মিল্টন সম্পূর্ণ উন্নতক্ষেত্রের জীব—কিন্তু তাঁহার সঙ্গে আমাদের হৃদয়ের প্রকৃত সহযোগ নাই। তাঁহার স্বর্গীয় কণ্ঠগীতি আমরা

ভয়ে-বিস্ময়ে-রোমাঞ্চিত দেহে শুনিতে থাকি, যেন গভীর বনের নির্জন গুহা হইতে সিংহের কণ্ঠধ্বনিই কানে আসিতেছে।"

হাঁ! মিল্‌টনের গম্ভীর-কণ্ঠ বিশ্বসাহিত্যে অতুলনীয়! সে যে গভীর অরণ্যের দূরনির্জন কন্দরশায়ী, পুণ্যসত্ত্ব এবং একাকি-চর সিংহের বক্ষঃগর্জন! মিল্‌টনের চিত্ত প্রকৃতই 'তুরঙ্গমং একচরং অশরীরং গুহাশয়ম্‌'। তাই বুঝি, 'মিল্‌টনী' ছন্দের অনুপম ধ্বনি-শক্তির সঙ্গে সঙ্গে কালিদাস, ভার্জিল ও ট্যাসোর কোমল-মধুর-রাগিণী মিলাইয়া, নিজস্ব জীবন ও হৃদয়ের কারুণ্য-ধর্মে অতুলনীয় করুণকণ্ঠ আমাদের এই মধুসূদন!

মধুসূদনের শিল্পতা-আদর্শও কি ছিল, মেঘনাদের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে কবি কি পরিমাণে নিঃসংশয় ছিলেন এবং পাঠকগণকেও উহা কোন্‌ভাবে বিচার করিতে তিনি আশা করিতেন, তাহার প্রমাণও সংশয়ী কেশব গাঙ্গুলীর নিকট [মধুসূদন-লিখিত পত্রে মিলিতেছে—'আমার কাব্য পাঠ করিতে প্রথমতঃ দেখিবে উহার পরিকল্পনা; দ্বিতীয়তঃ, যে ভাষায় ভাব এবং বস্তুর পরিকল্পনা প্রকাশিত হইয়াছে এবং তৃতীয়তঃ, প্রত্যেক বাক্যশ্লোকের গতি এবং উদ্দেশ্য। সমগ্রের শ্রুতি ফলের জন্য চিন্তাই করিও না—কাল উহার বিচার করিবে। যদি আমি উক্ত সকল দিকেই সাফল্যলাভ করিয়া থাকি, অর্থাৎ যদি গ্রন্থটিতে প্রকৃত কবিত্ব থাকে, ভাব মধুর এবং বিশুদ্ধ ভাষায় প্রকাশিত হইয়া থাকে, যদি উহার ভাষার মধ্যে প্রকৃত সঙ্গীত থাকে, তবে বন্ধুগণের উহার জন্য চিন্তিত হইবার কিছুমাত্র কারণ নাই। আজ, না হয় কাল, না হয় ত্রিশ বৎসর পরে আমার কাব্য স্বীকৃতি পাইবেই।'] সচেতন শিল্পী-কবির এই সুদৃঢ়, বিশ্বাস-বলীয়সী ভবিষ্যৎবাণী ঠিক হইয়াছিল কিনা, তাহা আজ ৬০ (? ৯৬) বৎসর পরে বাঙ্গালী পাঠক বিচার করুক; পরকালের পাঠকও বিচার করিতে থাকুন!

এই সর্বপ্রতীত এবং অগণিত দোষ-সঙ্কুল দোষ-বলিষ্ঠ এবং দোষ-মিষ্ট 'মেঘনাদবধ কাব্য'। পাঠক অন্ততঃ বুঝিতে থাকুন যে, ব্যাকরণ-বিশুদ্ধিই কাব্যের জীবন নহে এবং অলঙ্কারদুষ্টতাও কাব্যের মৃত্যুবাণ নহে!

'মেঘনাদবধে'র অন্য সমালোচনা করিব না। 'তিলোত্তমাসম্ভবে'র 'নহ মাতা, নহ বধূ'—জাতীয় সুন্দরী এই কাব্যে আসিয়া 'প্রমীলা'-মূর্তিতে বধূধর্ম প্রেমধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল এবং পরিশেষে প্রেমাস্পদের সহমৃতা হইয়া আমাদিগকে নেত্রজলে ভাসাইয়া গিয়াছে। প্রমীলা পরম-ঐশ্বর্য মহিমময়ী নারী চরিত্র, অথবা ঐরূপ নারীত্বের রেখাচিত্র—স্বভাবেই নরত্বের ক্ষেত্রে রাণী চরিত্র। একদিকে ঐশ্বর্য এবং বীর্যের দীপ্তিধর্মে, অন্যদিকে ললনাসুলভ কোমলতা, পতিপ্রেম, প্রেমদাসীত্ব এবং প্রেমপ্রাণতার প্রসাদগুণে উহা পরম উজ্জলমধুর চরিত্র। কালিদাসের 'ভীমকান্ত'—আদর্শের মাহাত্ম্য সম্যক্ বুঝিয়াই মধুসূদন শচী এবং প্রমীলা চরিত্র ধারণা করেন। একদিকে ঊষারাণীর উৎসাহ দীপ্তি, অন্যদিকে অস্তমিত নিদাঘ-সূর্যের সহগমনোন্মুখী সন্ধ্যা-তপস্বিনীর শান্তকোমল এবং উপরতিময় ললাটের সিন্দূররাগ সংমিশ্রিত করিয়াই কবি শিল্পী যেন প্রমীলাচিত্র অঙ্কিত করিয়াছিলেন। প্রমীলা কদাপি প্রাকৃতজন রম্যা অথবা প্রাকৃতজন-কাম্যা রমণী নহেন ; সাধারণ নর-প্রকৃতি উহাকে কেবল দূর হইতে প্রণামপূর্বক 'দেবী' সম্বোধন করিবার জন্যই যোগ্যতা রাখে ; মেঘনাদের ন্যায় পুরুষেই কেবল স্বভাব-সত্ত্বে উহাকে 'প্রিয়া' সম্বোধন করিতে পারে !

এস্থলে একটি অপরূপ রহস্যও আছে। 'খ্রীষ্টান'-কবি কেমন করিয়া এই সহমরণের মাহাত্ম্য গান করিলেন ! যে-সহমরণ রাজবিধিতেই গর্হিত হইয়া গিয়াছে, যাহার কথা শুনিবামাত্র নাসিকাটি কুঞ্চিত করা আধুনিক তন্ত্রের শিক্ষিত ব্যক্তিগণের মধ্যে একটা শিষ্টাচার-রূপেই দাঁড়াইয়া গিয়াছে ! আসল কথা, সহমরণের যাহারা সহায়তা করে, যাহারা ঐ দৃশ্য দেখিতেও যাইতে পারে, তাহারা অত্যন্ত নিন্দনীয় এবং দণ্ডনীয় ব্যক্তি। তাহারা নির্দয়—অসাধারণ বিশ্বাসনিষ্ঠ-প্রেমের অপার্থিব ভীষণ আত্মোৎসর্গে হয়ত কেবল দৃষ্টিকুতূহলী নির্মম ব্যক্তি ! এরূপ নির্দয়তার জন্যই সমাজের শাস্তিভোগ করা উচিত। কিন্তু সমস্ত বিঘ্নবাধা সত্ত্বেও, যদি কেহ আপনাআপনি সহমরণে গিয়া বসে,

তাহা হইলে সমাজ যেন হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়ায়—সহমৃতব্যক্তির শ্মশান ভস্মগুলিই যেন হুড়াহুড়ি করিয়া লুঠিতে আরম্ভ করে! গাথায়, কাব্যে, ইতিহাসে সহমৃত-ব্যক্তির মাহাত্ম্যগানের যেন আর সীমা থাকে না! সেক্সপীয়ার তো 'রোমিও জুলিয়েটের' সহমরণ লইয়া একটি মহানাটক রচনা করিয়া ফেলিলেন! আত্মহত্যা পাপ, কিন্তু প্রেমের তরফে আত্মহত্যাটাই গৌরবের জিনিষ হইয়া যায়। যাহারা দেশের বা সমাজের উপকারার্থ যুদ্ধ করিতে যায় এবং যুদ্ধে প্রাণদান করে, তাহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে প্রেমের বশেই আত্মহত্যা করে না কি? মনুষ্যের সাহিত্যে উহার কত স্তুতিবাদ, কত সুখ্যাতি! অথচ, ভারতবর্ষে যে মানুষ প্রেমের আদর্শে, দাম্পত্য-বন্ধনকে জীবনমরণাতিশায়ী মহাসম্বন্ধ বলিয়া বিশ্বাসে মরিতে পারিত, তাহা বিদ্বেষী ইয়োরোপের মুখে 'বর্বরতার লক্ষণ' বলিয়াই নিন্দালাভ করিতেছে! কবি মধুসূদন বাহ্যতঃ খ্রীষ্টান হইয়া গেলেও, তাঁহার হৃদয় যে ভারতবর্ষের হৃদয়ের সঙ্গে সহানুভূতি-সূত্রেই যুক্ত ছিল, প্রমীলার সহমরণ গানের ক্ষেত্রে তাহার প্রমাণ আছে।

(৭)

'মেঘনাদবধ' রচনার সমকালে মধুসূদন রাজনারায়ণকে লিখিয়াছিলেন, "আমি একটি খণ্ডকাব্য রচনা করিতেছি। It is all about poor Radha and her বিরহ।" আরও লিখিয়াছিলেন, "আশ্বস্ত হও বন্ধু, আমি তোমাদের স্কন্ধে পয়ার বা ত্রিপদী চাপাইতে যাইতেছি না। ইটালীয় মিশ্র-ছন্দকে বাঙ্গলায় আনা যায় না কি?" মধুসূদনের ন্যায় ছন্দ-প্রতিভাশালী-কবির পক্ষে অসম্ভব কি? বঙ্গসাহিত্যে ভারতচন্দ্রের পর ছন্দের ক্ষেত্রে মধুসূদনই সচেতনভাবে চলিতেছিলেন। ধ্বনির জ্ঞান এবং পারদর্শিতা না থাকিলে এক ভাষার ছন্দকে অন্য ভাষায় অবতারিত করা একেবারেই অসম্ভব। মধুসূদন বাঙ্গালার মূল ছন্দদ্বয়কে, বঙ্গভাষার পয়ার ও লাচাড়ীকে সংমিশ্রিত করিয়া 'ব্রজাঙ্গনা

কাব্যে'র ছন্দগুলিকে সৃষ্টি করিলেন। এজন্য উহার প্রত্যেক কবিতাই নব নব মিশ্র-ছন্দে উল্লসিত হইতেছে।

'ব্রজাঙ্গনা'র স্বতন্ত্র কবিতাগুলির কাঠামো (form) এবং শিল্প-প্রমূর্তি (technique) প্রকৃত প্রস্তাবে গ্রীক 'ওড্' (ode) হইতে অভিন্ন! কোন একটি বিশেষ-ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অভিভাষণ, সম্বোধন বা উচ্ছ্বাস, নানা ছন্দে বা একেবারে স্বাধীন-ছন্দে (vers Libers) উচ্ছ্বাসই 'ওডে'র বিশেষত্ব। বর্তমানকালের পাশ্চাত্য-সাহিত্যে 'ওড' এখন নানামুখী-গতি এবং প্রবৃত্তি অনুসরণ করিয়াই চলিয়াছে। বঙ্গভাষায় মধুসূদন 'ব্রজাঙ্গনা'র 'রাধা-উক্তি'-রূপে 'ওড'কে অবতারিত করিলেন। পরে হেমচন্দ্র উহাকে বিস্তার দান পূর্বক 'কবিতাবলী'র 'পিণ্ডারিক ওড'গুলির মধ্যে উক্ত সূত্রকেই প্রকৃত শিল্প-আদর্শে অনুসরণ করিয়াছেন।

মেঘনাদবধ, ব্রজাঙ্গনা ও কৃষ্ণকুমারী একরূপ একসঙ্গেই কবির সৃষ্টিশালায় মূর্তিলাভ করিতেছিল। 'কি মনে কর? ছয় মাসের মধ্যেই একটি বিয়োগান্ত নাটক, একটি কবিতা-গ্রন্থ এবং একটি মহাকাব্যের আধাআধি! আর কিছু না হোক, আমাকে অন্ততঃ একটি পরিশ্রমী জানোয়ার বলিয়াই প্রশংসা করিও। বঙ্গসাহিত্যে একেবারে একটি বৃহৎ ধূমকেতুর মতই উদিত হইয়া গেলাম।' [How are you, old boy, a Tragedy, a volume of Odes, and one half of a real Epic poem! All in the course of one year; and that year only half old! If I deserve credit for nothing else, you must allow that I am, at least, an industrious dog·········you may take my word for it, friend Raj, that I shall come out like a tremendous comet······রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ]

এস্থলেও সব্যসাচীর দৃষ্টান্ত! মেঘনাদবধে পাঞ্চজন্য এবং ব্রজাঙ্গনার বংশী যুগপৎ বাজাইয়াছেন বঙ্গসাহিত্যের এই মধুসূদন! ভাবের দিকেও 'ব্রজাঙ্গনা'র

মধ্যে কিঞ্চিৎ বিদ্রোহ আছে। 'Poor Radha!' মধুসূদনের রাধা পুরাপুরি বৈষ্ণবকবিগণের রাধিকা নহেন, তিনি মানবী। মানবীর বিরহোন্মাদ বর্ণনা করাই কবির লক্ষ্য; বৈষ্ণব কবিগণ যে রাধিকাকে গুরুর ভাবে, প্রেমধর্মের আরাধ্যারূপে দর্শন করিয়া থাকেন, সে লক্ষণটিও 'ব্রজাঙ্গনায়' নাই। রাধিকার মধ্যে চিরকালের 'বিরহিনী রমণী'কে দেখিতেই কবি মধুসূদন বদ্ধপরিকর! প্রকৃতির সঙ্গে এ রমণীর অপরিসীম সহানুভূতি—বিশ্বসংসারকে আপন বিরহের দিব্যোন্মাদময়ী দৃষ্টিতে গ্রহণ করাই ব্রজাঙ্গনার বিশেষত্ব! এদিক হইতে ব্রজাঙ্গনা বঙ্গসাহিত্যে ইয়োরোপীয় 'প্রেম'-আদর্শের প্রথম গীতিকাব্য (Love-lyric)। বৈষ্ণবকবিগণ রাধিকাতত্ত্বে যেরূপ নানাদিক হইতে দৃষ্টি করিয়াছিলেন—পূর্বরাগ, মান, বিরহ, মিলন ইত্যাদি—ইহাতে তাহা নাই; কেবল 'বিরহ'। অবশ্য, মধুসূদন 'বিহার' নামে অপর একটি সর্গ রচনা করিবেন বলিয়াও স্থির করেন; কিন্তু উহা সমাধা করিতে পারেন নাই। কৃষ্ণতত্ত্বের দিকে ভগবদ্ভাবে দৃষ্টি রাখার দরুণ বৈষ্ণব কবিগণের 'রাধার মধ্যে সময় সময় যে সুগভীর আন্তরিকতার স্ফূর্তি হইয়াছিল, তাহাও মধুসূদনের মধ্যে কদাচিৎ মিলিবে! কিন্তু, এই গীতিকাব্যে মধুসূদনের সুগভীর নাটকীয় শক্তির পরিচয় আছে। মধুসূদন সর্বতোভাবে আত্মবিস্মৃত হইয়া কৃষ্ণ-প্রণয়িনী রাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দৃষ্টিতেই বিশ্ব-প্রকৃতিকে দর্শন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। মেঘনাদ রচনা করিয়া মধুসূদন উক্ত প্রণালীর রচনার দিকে যেন একটু উপরতি অনুভব করিলেন—তিনি 'বীর'-আদর্শের রচনাক্ষেত্রে নিজের চূড়ান্ত করিলেন বলিয়াই ধারণা হইল। এ বিষয় তাঁহার একটি পত্র—"কিন্তু, হয়ত মেঘনাদের পর 'বীর' আদর্শের কবিতাকে বিদায় করিতে হইল। এ ক্ষেত্রে নূতন উদ্যমমাত্রেই আমার পক্ষে পুনরুক্তি ব্যতীত সম্ভবতঃ আর কিছুই হইবে না! তবে, আমার সম্মুখে রোমান্টিক এবং গীতি কবিতার সুবিস্তারিত ক্ষেত্রই দেখিতেছি! গীতি কবিতার দিকে আমার একটা ঝোঁক আছে বুঝিতেছি।" ["I suppose I must bid adieu to Heroic

Poetry after Meghnad. A fresh attempt would be something like a repetition. But there is the wide field of Romantic and Lyric Poetry before me, and I think I have a tendency in the Lyrical way'—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ] এ-সূত্রেই ব্রজাঙ্গনার সৃষ্টি। তাঁহার রাধা প্রমীলারই সহোদরা—মানবী। বীরাঙ্গনা কাব্য কিঞ্চিৎ পরে (১৮৬২) রচিত হইলেও, ব্রজাঙ্গনা কবির 'বীরাঙ্গনা'গণেরও সহোদরা; এবং বীরাঙ্গনা কাব্যের প্রধান শক্তি ও নাটকত্ব!

সুতরাং, প্রসঙ্গ সূত্রে বীরাঙ্গনার রীতি-বিষয়ও চিন্তায় না আসিয়া পারে না। মধুসূদন যখন যে নারীর ভূমিকা গ্রহণ করেন, তদ্‌ভাবেই ভাবুক হইয়া, এবং একরূপ আত্মবিস্মৃত হইয়াই উহা সম্পাদন করেন। বীরাঙ্গনাতেও কবি ভিন্নভিন্ন রমণীচরিত্রে সুতীক্ষ্ণ সহানুভূতি এবং অন্তর্দৃষ্টির পরিচয় দিয়াছেন। অমিত্রচ্ছন্দের সমাধান বিষয়েও বীরাঙ্গনা মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ কাব্যগ্রন্থরূপে প্রতিপত্তি লাভ করিতে পারে। প্রবল অহমিকা তত্ত্ব এবং নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উল্লাসিনী রমণী বলিয়াই উহাদের 'বীরাঙ্গনা' নাম সার্থক হইয়াছে। অবশ্য, বলিতে হয় যে, ওভিদের Heroic Epistles এবং পোপের Epistles-এর পথেই মধুসূদন তাঁহার কাব্যের নামতত্ত্ব এবং প্রকাশের প্রণালী লাভ করেন। কিন্তু, বঙ্গসাহিত্যে তিনি উহাকে সম্পূর্ণ অভিনবরূপে এবং মৌলিক ভাবেই সমাধা করিয়াছেন! ভারতীয় আর্য-সমাজের যে অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ংবরা' হইতে জানিতেন, সমাজের যে গৌরবময় অবস্থায় রমণীগণ 'স্বয়ং তত্ত্ব' পরিচালন করার উপযোগী শিক্ষা এবং বিশ্বস্ততা উপার্জন করিতেন, মধুসূদন তাহারই স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। এখন সমাজ হইতে রমণীর স্বয়ংশক্তি এবং বীরাঙ্গনা-তত্ত্ব লাভ করিবার যোগ্যতাও সঙ্গে সঙ্গে নির্বাসিত হইয়া গিয়াছে! অবস্থাগতিকে যেমন স্ত্রীজাতির তেমন পুরুষ জাতির স্বয়ং-কর্ম এবং স্বাতন্ত্র্য-তত্ত্বকেও নানাদিকে সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ করা সমাজ যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করিয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী রাষ্ট্রীয় অধীনতার এবং বিপরীত-ধর্মী রাজশক্তির

আধিপত্য-গতিকে সমাজের শক্তি-হ্রাস এবং অধঃপতন হইতেই এ অবস্থা এবং নির্ধারণা সম্ভব হইয়াছে। ভারতীয় সমাজ এখন কেবল নিজের সমস্ত 'আটঘাট' এবং সদর ও অন্দর দরজা বন্ধ পূর্বক দুর্দিনের মহানিশা যাপন করিতেই যেন নিরত আছে! 'বীরাচারী' রমণীগণের লুপ্ত স্মৃতি সচেতন করিয়া তৎসঙ্গে সহানুভূতির পথে সমাজের বিলুপ্ত গৌরবের স্মৃতিবুদ্ধি পরিস্ফুট করাই হয়ত একদিকে মধুসূদনের লক্ষ্য ছিল! সমাজের বর্তমান অবস্থার বিরুদ্ধে উহাও হয়ত একটা গুপ্ত বিদ্রোহ! যাহাকে, কবি এক্ষেত্রে অপরূপ ভাবেই সাফল্য সিদ্ধি করিয়াছেন! যে দিকেই হউক, এ সমস্ত বীরাঙ্গনার সঙ্গে সহানুভূতি না করিয়া মানুষ পারে না।

এস্থলে আমাদিগকে বুঝিতে হয় যে, মধুসূদনের এই 'ব্রজাঙ্গনা' ও 'বীরাঙ্গনা' কাব্য বঙ্গসাহিত্য-ক্ষেত্রে পাশ্চাত্ত্য 'প্রেম'-কবিতার আদর্শও প্রথম আমদানী করিয়াছে; এবং ব্রজাঙ্গনা অন্তত একদিকে পরকালের নানামুখী 'প্রেম'-কবিতার আদি-ধাত্রীরূপে দাঁড়াইয়া আছে। আরও বুঝিতে হইবে যে, পাশ্চাত্ত্য গন্ধ সত্ত্বেও ব্রজাঙ্গনা কাব্য অন্যদিকে ভারতীয় আদর্শের—বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা। ফলতঃ এরূপ বৈষ্ণবগুণ সত্ত্বেও উহা পাশ্চাত্ত্য ভাবের সংমিশ্রতা সংঘটন করিয়াই পরবর্তী বঙ্গসাহিত্যে হয়ত একটা দোষেরও অতর্কিত জন্মদাত্রী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে! ব্রজাঙ্গনা কাব্যের এই অবস্থান এবং স্বরূপ লক্ষণ প্রত্যেক সাহিত্যরসিককে নিবিষ্ট ভাবেই বুঝিতে হয়!

যেমন বলিয়াছি, ব্রজাঙ্গনা নিদানতঃ বৈষ্ণব আদর্শেরই কবিতা। বৈষ্ণব আদর্শে স্ত্রীপুরুষ মাত্রেই 'রাধা'ত্ব এবং রাধিকাভাবের সাধক। বিশ্বের চরম 'সচ্চিদানন্দ'-তত্ত্বকে 'শ্যামসুন্দর' রূপে পরিকল্পনা পূর্বক উহাকেই স্বামী এবং প্রাণ-নাথ এবং পরমার্থরূপে বৈষ্ণব স্ত্রীপুরুষগণ সাধনা করেন; বঙ্গীয় বৈষ্ণব-গণের মধ্যে প্রাচীন সহজিয়াগণের সমসূত্রে এরূপ 'প্রেম' সাধনাই সমধিক উজ্জ্বল। সুতরাং, বৈষ্ণব কবিগণ রাধাকৃষ্ণ বিষয়ে যাহাই গান করুন না কেন, তাঁহাদের কাব্য অধ্যাত্মতার গন্ধ ছাড়াইয়া গিয়া যতই জড়তাগন্ধী অথবা কামগন্ধী হউক না কেন, সমস্তকে চূড়ান্তের সেই 'রাঙ্গাচরণে নৈবেদ্য'

রূপে গ্রহণ করিতে এবং ব্যাখ্যা করিতে পারা যায়। প্রাচীন বঙ্গসাহিত্যের বৈষ্ণব কবিতামাত্রের এই 'নৈবেদ্য' লক্ষণ না বুঝিলে আমরা 'বৈষ্ণব আদর্শ' কিছুই বুঝিলাম না। এখন, মধুসূদন খ্রীষ্টানকবি হইলেও এবং তাঁহার কবিতায় বৈষ্ণবী অধ্যাত্মতা সবিশেষ উজ্জ্বল না হইলেও, ব্রজাঙ্গনাকাব্যের অকপট রাধা-'মুখোস' এবং কৃষ্ণকামিনী রাধিকার সমস্ত ভাব-বিলাস এবং প্রেমোন্মাদ যে বৈষ্ণব লক্ষণ, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। মধুসূদনের এই ব্রজাঙ্গনামুখী কবিতা তাঁহার বাঙ্গালীত্ব এবং বাঙ্গালীত্বের মধ্যেও আবার বঙ্গীয়-বৈষ্ণবী-প্রকৃতির প্রভাব এবং শিষ্যতাই প্রমাণিত করিতেছে! প্রেমের বুলি ধরিতেই 'ইয়োরোপীয় প্রেম'তন্ত্রী খ্রীষ্টান কবির পক্ষেও যে 'রাধা'-প্রকৃতির বশ্যতা অপরিহার্য হইয়াছে—এই স্থলেই বঙ্গে বৈষ্ণব আদর্শপ্রাবল্যের প্রমাণ এবং কবির 'বাঙ্গালী বৈষ্ণব'ত্বের লক্ষণ। সেইরূপে, রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহের পদাবলী'—কবি স্বয়ং উহাকে যতই 'সস্তা' মনে করুন না কেন--একটা অসামান্য বাঙ্গালী গ্রন্থ এবং বৈষ্ণবতন্ত্রীয় কাব্যগ্রন্থ! বুঝিতে হইবে, মুখ্য ভাবে পাশ্চাত্ত্য শিষ্যতা এবং 'ব্রহ্মপন্থি'তার মধ্যেও বাঙ্গালী বৈষ্ণবতন্ত্রের ওই রাধা-মুখোস এবং রাধারীতি প্রবল এবং উজ্জ্বল না হইয়া পারে নাই। উহার পর, রবীন্দ্রনাথের ব্রহ্মমুখী কবিতা এবং ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতে, বলিতে গেলে বাঙ্গালীর ব্রহ্মসঙ্গীতগুলিতেই, আত্মনিবেদনের বৈষ্ণবী ধারা, কীর্তনী-রীতি এবং রাধামুখিতাই উজ্জ্বল হইয়াছে! সুতরাং উহাদের রাধা-মুখোস বা স্ত্রীমুখিতাও যে সঙ্গত হইয়াছে, তাহা বলিতে পারা যায়! এস্থলে আরও বলিতে পারি যে, ব্রহ্মপন্থী রবীন্দ্রনাথের 'গীতাঞ্জলি'ও 'রাধা' রীতি অবলম্বনেই উহার 'অঞ্জলিত্ব' এবং প্রধানভাব-তত্ত্বটুকু সিদ্ধি করিয়াছে। উহা বৈষ্ণবীয় মধুর'রস অবলম্বনেই ইয়োরোপের খ্রীষ্টানগণের সমক্ষে—ভগবানের প্রতি 'পিতৃ'-ভাব সাধক খ্রীষ্টানগণের সমক্ষে—অপরিচিত ভাবপন্থার কবোষ্ণ-মধুর এবং রহস্যমধুর (mystic) কবিতারূপেই অতুলনীয় শক্তিসিদ্ধি করিয়াছে। ইয়োরোপীয় সাহিত্য-রসিকের সমক্ষে এরূপ 'সুদূরতা' এবং 'অস্পষ্ট মধুরতা'র মধ্যেই উহার প্রধান শক্তি।

কিন্তু, দেখিতে হয় যে, এ সমস্ত সংসারভাবের 'প্রেম'-কবিতা নহে; এবং এই রাধা-রীতির 'মধুরতা'-ই যেমন বাঙ্গালী প্রেমকবিতার প্রধান শক্তিস্থান, তেমন উহার পতনস্থান এবং দৌর্বল্যস্থানও এস্থলেই আছে। আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যের পুরুষ কবিগণের অধিকাংশ 'প্রেম'-কবিতা এরূপ পতনস্থানই প্রমাণিত করিতেছে! পুরুষ-কবিগণও আত্মপ্রকাশের ক্ষেত্রে রাধা-মুখোস ছাড়িতে জানিতেছেন না; এবং বৈষ্ণবত্বের বাহিরে উহা যে কি অনর্থময়, বেরসিক পদার্থ তাহাও বুঝিতেছেন না। ঐ সমস্ত যেমন বৈষ্ণব কবিতা হইতেছে না, তেমন প্রেমের কবিতাও হইতেছে না; হইতেছে কেবল অ-প্রেমের কবিতা— অবৈষ্ণব বা ভাক্ত-বৈষ্ণব কবিতা!

যেখানে প্রকৃত বৈষ্ণবতত্ত্ব নাই, নৈবেদ্য লক্ষণ নাই, কেবল সংসার ভাবের প্রেম কবিতা—পরিষ্কার স্ত্রীপুরুষের মিলন-বিরহ-সম্ভোগ, বিপ্রলম্ভ আকুলতা এবং অভিসারের কবিতা, সেখানে রাধা-মুখোস এবং রাধারীতি! আমাদের পুরুষ 'প্রেমিকগণের' মুখেও রাধারীতি! আমরা পূর্বতন প্রসঙ্গে বলিয়াছিলাম যে, 'আমরা প্রেম জানি না'। আমাদের উদ্দেশ্য না বুঝিয়া কেহ কেহ তর্ক এবং আপত্তি জানাইয়াছেন। এস্থলে আমাদের দৃষ্টিস্থান হইতে কথাটিকে বুঝিয়া লউন! পুরুষের মুখে 'স্ত্রী-মুখোস পরা' স্ত্রীভঙ্গিমার কবিতা! উহাও 'প্রেম' প্রকাশের সহজ রীতি নহে—সত্য প্রেম প্রকাশের পদ্ধতিও উহা নহে। উহা কি করিয়া আমাদের আধুনিক প্রেমকবিতায় এত প্রবল এবং উজ্জ্বল হইল! আরও দেখিয়া লউন, মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনার রাধা-মুখোসের মধ্যেই আমাদের 'প্রেম' কবিতার প্রথমপতনের ঐ আদিম সূত্রটি! যদিও মধুসূদনকে আমাদের আত্মবিস্মৃতি এবং অপরাধের জন্য দায়ী করা যায় না! স্বয়ং বৈষ্ণবী রীতির মধ্যেই হয়ত বি-চেতন ব্যক্তির জন্য এ সঙ্কটস্থান গুপ্ত আছে।

অবৈষ্ণব বা 'ভাক্ত-বৈষ্ণব' কবিতা কাহাকে বলিব? যেখানে রাধার ভূমিকা মাত্র আছে, মেয়েলী ঠাট এবং 'ভড়ং'টুকু আছে, স্ত্রৈণ আকার

ইঙ্গিত, চেষ্টিত এবং ভঙ্গিমা আছে, মেয়েলী হাবভাব, চোর-কটাক্ষ, চাপারীতি এবং আঁচলের বাতাস আছে, পরকীয়া-খণ্ডিতা-বিপ্রলব্ধা অথবা অভিসারিকার আলোকভয়াতুর আকুলিবিকুলি এবং কথাবার্তার প্রণালী আছে, গুপ্তপ্রেমের দিবাভীত আকুলিবিকুলির অবলম্বন যাতি-যুথি-মল্লিকা-কোকিলা-ভোমরা-মলয়া এবং জ্যোছনা আছে—অথচ কৃষ্ণ নাই! কৃষ্ণের পদে কবি স্বয়ং। একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতে দেখিলেই স্পষ্ট হইবে, কৃষ্ণের পদে আর কেহ নহে, স্বয়ং কবি। এস্থলে পাঠক, আর একটু নিবিষ্ট দৃষ্টিতেই দেখিবেন, আর্টের ক্ষেত্রে—কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রেই উহা কত বড় অনাচার! সাংসারিক প্রেমনীতির ক্ষেত্রে যেমন কবির আত্মপক্ষে, তেমন পাঠকের দিকেও কত বড় পাপাচার!

পুরুষ কবিগণ স্ত্রীমুখে—আপনার মন হইতে একটা স্ত্রী খাড়া করিয়া—'আপনাকেই ভালবাসিতেছে'! আপনার সৌন্দর্য, ঐশ্বর্য, মাহাত্ম্য, কবিত্ব অথবা গুণিত্বকে পূজা করিতেছে! আত্মবিলাসে, অহমিকা-বিলাসেই রত হইয়াছে—এবং পাঠককে সহপথিক করিতেছে! আমাদের এরূপ 'প্রেম-কবিতায়' একটি স্ত্রীলোকই বক্তা, উহা স্ত্রী কর্তৃক পুরুষ-পূজা! স্ত্রীলোকটি পুরুষটাকে কতমতে কাকুতিমিনতি-স্তুতি-আরতি-আলিঙ্গন এবং বন্দন করিতেছে, কেবলি বলিতেছে "ওগো প্রিয়তম, আমি তোমাকে যে ভালবেসেছি, আমার সেই অপরাধ কোরো মার্জনা, কোরো মার্জনা"; বলিতেছে, "তুমি আমারি গো তুমি আমারি," পায়ে লোটাইয়া কাঁদিয়া কাঁদিয়া বলিতেছে, "লহ লহ মোরে"; কিন্তু পুরুষটি নিশ্চল-নির্বিকার নিশ্চিন্ত-শান্ত ভাবে বসিয়া ঐ পূজা গ্রহণ করিতেছে! ভুলেও কদাপি মুখে আনিতেছে না "আমি তোমারি"! পুরুষটির মধ্যে কোন প্রকার আত্মবিতরণ, আত্মনিবেদন অথবা প্রেমে আত্ম-বিস্মৃতির লেশগন্ধও নাই! মনুষ্যত্বের সাধনক্ষেত্রে যৌন-প্রেমের প্রধান মাহাত্ম্য কোথায়?—মানুষকে স্বার্থবিস্মৃতির এবং আত্মোৎসর্গের পথে উন্নয়নে। সাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রেম-উপাখ্যান অথবা কবিগণের আত্মপ্রেম-কাকলিরই বা সাফল্য কোথায়? মানুষ কেন ব্যক্তি বিশেষের পিরীতি-কচকচি শ্রবণ

করিবে? জীবনতন্ত্রে কোন্ নৈতিকসূত্রে উহার সার্থকতা? উহার প্রধান সার্থকতা কি এই নহে যে—সৌন্দর্যের এবং আনন্দের পথেই উহা, মনুষ্য কর্তৃক স্বার্থশৃঙ্খলাছেদের দৃষ্টান্ত দেখাইয়া, হৃদয়কে মহত্তম আত্মধর্মে উন্নীত করে? হৃদয়কে উচ্চতম স্বাধীনতার শিখরে, দিব্যভাবে উপনীত করে? প্রত্যেকের সহজীয় পথেই অনুত্তম লোকে উদ্গতির দৃষ্টান্ত দেখাইয়া জীবন সাধনার সাহায্য করে? সে সম্ভাব্যতার লেশগন্ধও যে আমাদের 'প্রেম' কবিতায় নাই!

রেনেসাঁসের (Renaissance) পর হইতে ইয়োরোপীয় সাহিত্যে কবিগণের ব্যক্তিত্বগন্ধী এবং আত্মসম্পর্ক-গন্ধী প্রেমকবিতার প্রচলন হইয়াছে। পেত্রার্ক (Petrarch) ও দান্তে (Dante) উহার সূত্রপাত করিয়াছিলেন। কামবৃত্তির দৈবীকরণ (deification of Love) আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্যের কবিগুরু দান্তে তাঁহার 'ভাইটা নোভা' (Vita Nauva) ও 'ডিভাইন কমেডী'তে সংসারভাবের 'প্রেম'কেই আধ্যাত্মিক দেবত্ব ও মৃত্যুঞ্জয়ত্ব প্রদানপূর্বক উহার লোকালোক-বিজয়ী মহিমাসঙ্গীত গান করিয়াছেন! তাঁহাদের দৃষ্টান্ত পথে আধুনিক ইয়োরোপীয় সাহিত্য কবিগণের অহমিকা-মুখর প্রেমসঙ্গীতে ভরপুর! মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যও —অবশ্য স্বাধীন পথেই—কালিদাস-ভর্তৃহরি প্রভৃতির ভিতর দিয়া 'ভগবান্' কুসুমায়ুধের স্তুতি-প্রণতি এবং আরতিতে মুখর হইয়াছে! তাঁহাদের সমসূত্রে, বঙ্গের সহজিয়া ও বৈষ্ণব-কবিগণের চিত্তমন্দিরে 'পিরীতি'-দেবতা 'ভক্তিমুক্তি'-প্রদাতার আসন লাভপূর্বক উপাস্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিলেন। কবিগণ সময় সময় ভাবের বশে রাধাকৃষ্ণের 'মুখোস' ফেলিয়া দিয়া, অকপট অহমিকাতেই গান ধরিয়াছেন। চণ্ডিদাসের 'শুন রজকিনি রামি' উহার-ই দৃষ্টান্ত। পাশ্চাত্ত্য সাহিত্যের রীতিপরিচয়ের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বঙ্গসাহিত্যে এরূপ অহমিকা'-রীতি এখনও আর বাধিতেছে না, উহা কোনদিকে অশিষ্টতা বলিয়াও ধারণা জন্মাইতেছে না—এই অহমিকা সাহিত্যে শিষ্টাচার-সম্মত হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। মানুষ এখন সাহিত্য-ক্ষেত্রেও চাহিতেছে—সরলতা। পাপই হউক, আর

পুণ্যই হউক, সাহিত্যে আত্মপ্রকাশিনী সরলতাটুকুন একটা পরম 'রস'-রূপেই সাধুবাদের সামগ্রী হইয়া পড়িয়াছে।

এরূপ সহজপথে, 'অহমিকা'-পথেই কবিগণ প্রেমের গান ধরুন, উহা অন্ততঃ শিল্পতার-ক্ষেত্রে ব্যভিচারী হয় না। কিন্তু, পুরুষের মুখেই এরূপ স্ত্রীমুখ্য রীতি, বিশেষতঃ স্ত্রী কর্তৃক পুরুষ-পূজার কবিতা! উহাকে 'ভাক্ত বৈষ্ণব' ব্যতীত আর কি বলিব? যদি বলি, উহা প্রেম নহে—আত্মবিলাস, সূক্ষ্ম মনস্তত্ত্বের ক্ষেত্রে পুরুষের অহমিকা-বিলাস—সাহিত্যরসিকের অথবা 'রস'-পিপাসিতের পক্ষে ভয়ানক কু-সঙ্গী, তাহা হইলে কি বলিবার আছে? জীবনের নৈতিক ক্ষেত্রে এই অনৃতভাব এবং অনৃজু-রীতি ভাল কি মন্দ, সে বিচার করিব না; ঐরূপ বিচার করিবার জন্য অন্ততঃ শিল্প-সমালোচকের কোন ক্ষমতা নাই বলিয়াই ধরিয়া লইলাম। তাঁহার কর্তব্য এবং দায়িত্ব-ই হইতেছে 'স্বরূপ'-কথন। কিন্তু উহা ত নিদারুণ সত্য! এই অপূর্ব-অদ্ভুত এবং অস্বাভাবিক ধারা আমাদের সাহিত্যে বৈষ্ণবরীতি হইতেই অতর্কিতে প্রবল হইয়াছে। এ সমস্ত স্ত্রী-মুখী কবিতার 'আমি'টুকু যে রাধিকা নহেন, অথবা কবিও যে রাধাকেই গুরুস্থানীয় করিয়া কিংবা তাঁহার মুখেই ভগবানের প্রতি আত্ম-সমর্পণ করিতেছেন না, তাহা কবিতাগুলি হৃদয় দিয়া পাঠ করিলেই স্বতঃ-সিদ্ধ হইয়া যায়। এস্থলে 'সহৃদয়তা'ই প্রমাণ। কবিগণ যেন আপনাদের 'অহং'-তত্ত্ব হইতেই একটি 'নারী' বহির্ভাবিত করিয়া উহার পূজালাভ-পূর্বক পরিতোষ উপার্জন করিতেছেন! শিল্পীর দিক হইতে উহাই নিদারুণ সত্য। পুরুষ কবিগণের পক্ষে তাঁহাদের আমিত্ব-বিলোপী অথবা আত্মদানী কোনরূপ ভাব-ক্রিয়া, হৃদয়গতি এবং রসানুভূতির একেবারে অসদ্ভাব! উহাতেই বর্তমান যুগধর্ম এবং যুগলক্ষণ বুঝিতে পারা যাইবে। আমরা সকলেই ন্যূনাধিক এরূপে, 'স্রোতের শিউলী' (শ্যাওলা?) হইয়াই চলিয়াছি! ভারতীয় সমাজের মধ্যে উপার্জনধর্মী হইবার জন্য 'প্রেমের' পক্ষে তত অবকাশ নাই; 'প্রেম পূর্বক পরিণয়'-প্রথা এ সমাজে প্রচলিত নহে। ভারতীয় দাম্পত্য-ধর্মে প্রেম একটি পরিণয়-পরবর্তী

সাধনা ; এ কারণেই হয়ত ঈদৃশ অস্বাভাবিকতা কোন কোন দিকে সম্ভবপর হইয়াছে। ফলে, আমাদের পুরুষ কবিগণের এ সমস্ত প্রেমকবিতা ইয়োরোপীয় প্রেম-কবিতার ন্যায় প্রকাশ্যভাবে উপার্জনধর্মী নহে, আবার স্ত্রী-মুখী এবং পরস্বমুখী বলিয়া উহার মধ্যে সহজ কামগন্ধও অবাধে প্রকাশ পাইতে পারে না। আমরা শিল্পের ক্ষেত্রে কামগন্ধী কবিতাকে নিন্দা করি না, উহা স্বাভাবিক—'প্রবৃত্তিরেষা ভূতানাম্'; এবং স্বভাবের বর্ণনা করাও কাব্য-শিল্পের আমল-বহির্ভূত নহে। কিন্তু, আমাদের প্রেমকবিতায় সরল 'উপার্জনধর্ম'ও নাই, স্বাভাবিক কামগন্ধও নাই—উহা যেন কেবল মেয়েমুখো ভাবুকতা, অনৃত ভাবোন্মত্ততা, পরের মুখোস পরিয়া আত্মপূজা! একটা পরম ভণ্ডতাগ্রস্ত এবং শিল্পতা-বিদ্রোহী ও 'রস'-বিদ্রোহী গ্লানিকর পদার্থ! জগতের অন্য কোন সাহিত্যে ইহার জুড়ি আছে কি না, জানি না। কিন্তু, সাহিত্যের ক্ষেত্রে, বিশেষতঃ গীতিকবিতার ক্ষেত্রে যে সহজতা এবং ঋজুতাই প্রধান শক্তি। হেম-নবীনের কয়েকটি সরল প্রেম-কবিতা এবং নিধুবাবুর হৃদয়োচ্ছ্বাসময় প্রেমসঙ্গীতগুলি বাদ দিলে, প্রথম নারীপরিচয়-জাগ্রত রবীন্দ্রনাথের 'কড়ি ও কোমল' এবং 'মানসী'-র কয়েকটি মনোরম পুরুষমুখ্য কবিতা বাদ দিলে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে মুক্তকণ্ঠ এবং ঋজু-প্রকৃতির প্রেম-দৃষ্টান্ত নির্দয়ভাবেই দুর্লভ বলিয়া প্রতীয়মান হইতেছে। উহাই হইল, বর্তমানের প্রেম কবিতার 'আর্ট'!

এই আমিত্ববাদের কবিতা প্রসঙ্গে মধুস্থদনের শেষ সাহিত্য-কার্যের ধারাও বুঝিয়া লওয়াই আবশ্যক। মধুস্থদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী' তাঁহার ইয়োরোপ প্রবাসের সময়ে, ১৮৬২ হইতে ১৮৬৬ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই রচিত হয়। সনেট (Sonnet) বা চতুর্দশপদী কবিতা নবযুগের (রেনেসাঁস—Renaissance) ইটালীর সৃষ্টি—ইয়োরোপের সকল সাহিত্য ইটালী হইতে এই অভিনব সাহিত্য-শিল্পের কায়াপ্রাণের (অর্থাৎ সনেটের) নমুনা শিক্ষা করিয়াছে। উহা হইতে আধুনিক 'গীতি-কবিতা'ও নিজের শত-সহস্রমুখী অহমিকাতত্ত্বকে লাভ করিয়াছে ; এবং ছন্দের নির্ধারিত শৃঙ্খলাবন্ধন ছেদপূর্বক অগণিত উপস্থিত ছন্দেই আত্মপ্রকাশ

করিতেছে। শেক্‌স্পীয়র-মিল্টন এবং ওয়ার্ডসোয়ার্থের সনেট ইংরাজী খণ্ডকাব্য সাহিত্যের একটি প্রধান সিদ্ধি। মধুস্থদন সনেটকেও বঙ্গসাহিত্যে অবতারিত করিলেন। এক্ষেত্রে একমাত্র রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত, মধুস্থদনের সমকক্ষ কবি বঙ্গসাহিত্য এখনও সৃষ্টি করিতে পারে নাই। সনেটের মধ্যে একটা চিত্ত-সংযম আছে, ভাবতত্ত্বে এবং ভাষার ধ্বনিতত্ত্বে নিপুণ অধিকারের প্রয়োজন আছে, যে কারণে সনেট রচনায় প্রতিপত্তিলাভ করা সুলভ নহে। ইংলণ্ডের পূর্বোক্ত কবিগণ সনেটের মুখেই আত্মপ্রকাশ করিয়া গিয়াছেন; অর্থাৎ তাঁহাদের অধ্যাত্মমূর্তির পরিচয় লাভ করিতে হইলে সনেটগুলির মধ্যেই অনুসন্ধান করিতে হয়। মিল্টনের 'Soul animating strains though few' সাহিত্য-সেবিগণের নিকট প্রতিষ্ঠা অর্জন করিয়াছে। মধুস্থদনকে জানিতে হইলে—কবি মধুস্থদনটি কি ছিলেন, তাঁহার হৃদয় এবং বুদ্ধি কতদূর বিস্তৃত এবং প্রগাঢ় ছিল তাহা বুঝিতে হইলেও—'চতুর্দশপদী কবিতা'ই খুঁজিতে হইবে। সাহিত্যিক মধুস্থদনের বাক্‌শক্তি এবং বাক্‌সংযম, চিত্তশক্তি এবং চিত্ত সংযম কি পরিমাণে ছিল, তিনি বিশ্বসংসারের কতদূর আপনার অস্মিতার অধিকারে আনিয়াছিলেন, তাহার সংবাদ পাইতে চাইলেও সনেটগুলিই অন্বেষণ করুন, একেবারে আশ্চর্যান্বিত না হইয়া উপায় থাকিবে না। এসমস্ত কেন আমাদের বিদ্যালয়াদিতে পঠিত হয় না, বুঝি না; আমরা যে উহাদের মাহাত্ম্য বুঝিতে পারি নাই—ইহাতেই তাহা প্রমাণিত হয়। এ লোকটির হৃদয় কতদূর সুপ্রসন্ন এবং প্রসারিত ছিল! কোন্ গুণে এ-ব্যক্তি নব্যবঙ্গসাহিত্যের 'জনক' হইতে পারিয়াছিল! আমাদিগকেও আত্মপ্রসার লাভ করিতে হইলে কিরূপে তাঁহার শিষ্যতাপথেই চলিতে হইবে! কোন্ গুণে এ-লোকটি যেমন আমাদের দেশের, তেমন ইয়োরোপের অন্তরাত্মাটিকেও পুঁথির ন্যায় পড়িয়া লইয়াছিল, নিজের মধ্যে একেবারে পরিপাক করিয়াই নূতনরূপে আবার বঙ্গ-সাহিত্যের মধ্যে উপস্থিত করিয়াছিল!

মধুস্থদনের গ্রাস করিবার শক্তি যেমন অসাধারণ, পরিপাকের এবং

প্রকাশের শক্তিও তেমনই অসাধারণ। তবে, মধুসূদন যে বঙ্গভাষায়, খণ্ড-কবিতার ক্ষেত্রে তাঁহার শক্তি-অনুরূপ সমর্থ-শিল্পী অথবা সূক্ষ্মশিল্পী হইতে পারেন নাই, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। তাঁহার অল্পবয়সের ইংরাজী কবিতাগুলির মধ্যেই স্থানে স্থানে যে সূক্ষ্মতার এবং গভীরতার আভাস পাই, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার প্রৌঢ় বয়সের রচনাতেও আমরা সকল সময় উহার সমকক্ষতা অথবা পরিণতি খুঁজিয়া পাই না। উহার কারণ কোথায়? ইংরাজী ভাষার মহত্তর শক্তি, এবং শ্রেষ্ঠতর ঐশ্বর্যে। মধুসূদন সুলভ শিক্ষাপথেই ইংরাজীতে শেক্‌স্‌পীয়র-মিল্টন এবং বায়রণ-ওয়ার্ডসোয়ার্থের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন; কিন্তু, বঙ্গভাষায় ক্রিয়াযোগী তাবৎ শক্তিই মধুসূদনকে স্বয়ং অর্জন করিতে হইয়াছিল। বঙ্গভাষায় অন্তরাত্মাটি চিনিয়া লইতেই কত সময় এবং শক্তি ব্যয় করিতে হইয়াছিল! তাঁহার বাঙ্গলা রচনায় সূক্ষ্ম-ভাবধারণা যে অনেক সময় অব্যাহত হইতে পারে নাই—স্থানে স্থানে যে আসিতে-আসিতেও আসে নাই, সচেতন শিল্পী-কবি সে বৃত্তান্ত পুরাপুরি বুঝিয়াছিলেন। এজন্য মধুসূদন অত্যধিক সূক্ষ্মতার দিকে না যাইয়া, বৃহৎ তুলিকাহস্তে কেবল ভাবের বৃহৎ প্রবাহগতি এবং বিপুল উচ্ছ্বাসের ধারণাতেই অবহিত হইয়াছিলেন এবং উহাতে সিদ্ধিলাভ করিয়াই নিজেকে এ-জীবনের জন্য কৃতার্থ মনে করিয়াছেন।

'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী'র প্রধান রস কবির আত্মসম্পর্ক ও আত্মপ্রকাশিনী সরলতা এবং গভীর স্বদেশপ্রীতির সঙ্গে সঙ্গে বিশ্বব্যাপী সহানুভূতি। হোমার হইতে হুগো, বাল্মীকি হইতে আরম্ভ করিয়া কবিকঙ্কণ, ভারতচন্দ্র, ভিক্টর ঈমানুয়েল হইতে 'ঈশ্বরী পাটনী'; আকাশের তারা হইতে 'শ্রীমন্তের টোপর' কিছুই কবির আনন্দদৃষ্টি, প্রীতিদীপ্তি এবং মমতানুভূতি হইতে বাদ পড়ে নাই! বাহতঃ পৈতৃক সমাজদ্রোহী হইয়াও, সাহেবিয়ানায় রত থাকিয়াও মধুসূদন মনে-প্রাণে ভারতবাসী-হিন্দু এবং 'বাঙ্গালীর বাঙ্গালী' ছিলেন। মধুসূদনের সাহিত্যচর্যা যেমন কেবল যশোলিপ্সায় আত্মবিলাস মাত্র ছিল না,

তেমন উহার কেন্দ্রগত পরিচালনা-শক্তিটাও ছিল স্বদেশপ্রীতি। 'শর্মিষ্ঠা' হইতে আরম্ভ করিয়া 'চতুর্দশপদী-কবিতাবলী' পর্যন্ত কেবল উক্ত প্রীতি-বীজের ক্রমান্বিত এবং নানামুখীন বিকাশ। কবির অহমিকা, কবির ধর্মান্তর গ্রহণ, তাঁহার রচনার মধ্যে বিদেশী বস্তু ও বিদেশী সাহিত্যের আবহাওয়া, তাঁহার শিল্পতন্ত্রের প্রাচীনতা-বিদ্রোহ-রীতি এবং উন্নতিলক্ষ্য, এ সমস্ত আমাদের তরুণ বয়সে এক নিদারুণ ভ্রম উৎপাদন করিয়াছিল—অনেকের মনেই করিয়াছে। 'দেশের সমাজ-হৃদয়ের সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র যোগ ছিল না, তাঁহার প্রতিভা আকাশে অস্থানিক শিকড় বিস্তার করিয়াই পুষ্ট হইয়াছে'—এরূপ স্থূল দৃষ্টি এবং অর্ধদৃষ্টির পরিচয়ও আমরা একদিন দিয়াছিলাম। শিল্পক্ষেত্রের যে বিদ্রোহমতি এবং উন্নতিলক্ষ্য হইতে বঙ্গসাহিত্যের এত লাভ উদ্বর্তিত হইয়াছে, তাহাই আপাতদৃষ্টিতে মধুসূদনকে অপরাধী করিয়াছিল। তাঁহার কাব্যের গ্রীক Humanism বা মানবিকতার আদর্শও দেবতাগণকে মানবিক সুখ-দুঃখ এবং ভাল-মন্দের প্রকৃতিতে প্রাকৃতভাবে উপস্থিত করিয়া একশ্রেণীর বিচারককে অত্যধিক রুষ্ট করিয়াছিল; 'মেঘনাদবধে'র 'রাবণ-সহানুভূতি' তাঁহার বিরুদ্ধে সাধারণ বাঙ্গালীর অভিরুচি বিরূপ করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু মধুসূদনের কাব্য মানুষের 'ভাল লাগে' কেন, বাঙ্গালীর 'ভাল লাগে' কেন, হিন্দুরও 'ভাল লাগে' কেন—এসকল প্রশ্নের মীমাংসা-চিন্তাই আমাদের চিত্তকে কুবিচারের বশবর্তিতা হইতে রক্ষা করিতে পারে। এরূপ চিন্তা পথেই মধুসূদনের সর্ব-মানবিক রসাদর্শ ও স্বাদেশিক ভাববস্তুর ভিত্তি উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। সর্ব-জনতার সহিত স্বাদেশিকতার সম্মেলন না করিয়া কোন কাব্যই স্থায়িত্ব-অর্জন করিতে পারে না। 'শর্মিষ্ঠা' হইতে আরম্ভ করিয়া মধুসূদনের যাবতীয় কাব্য-কবিতা-নাটক এইরূপে অন্তরঙ্গভাবে সর্বজনীন হইয়াও ভারতবর্ষীয়ত্ব এবং বাঙ্গালীত্ব সিদ্ধি করিয়া যে দাঁড়াইয়াছে, তাহাই আমাদিগকে 'হৃদয় দিয়া' বুঝিতে হইবে। এমন কি, স্বদেশীয় সমাজতা এবং ধর্মতার ক্ষেত্রে স্বয়ং বিধর্মী হইয়াও মধুসূদন যে কিছুমাত্র বিদ্রোহভাব প্রকাশ করেন নাই, তাহা সাহিত্য-

শিল্পী মাত্রের বিস্ময়স্থলী হইয়া থাকিবে। নিজের শিল্পাদর্শ এবং শিল্পি জীবনকে দেশকালের সর্বপ্রকার সঙ্কীর্ণতা হইতে বিশেষভাবে অসঙ্গ (detached) রাখিতে না জানিলে এরূপ অপূর্ব ঘটনা কখনও সম্ভবপর হইত না। দেখিতে হইবে, এরূপ অসঙ্গতা অপর কোন আধুনিক বাঙ্গালী কবির সাধ্য হয় নাই। ধর্ম্ম ও সমাজ বিষয়ে সর্বপ্রযত্নে সংস্কারক, প্রচারক অথবা বিশ্বাসীর গোঁড়ামি ছাড়াইয়া, তিনি যেমন কেবল মানবিক স্থায়ীভাবের ক্ষেত্রেই স্বকীয় কাব্য-কবিতার শিল্পতা সিদ্ধি করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, তেমন অন্যদিকে, গোঁড়া হিন্দু বা শাক্ত-শৈব-বৈষ্ণব অথবা খ্রীষ্টান না হইয়াও প্রকৃত শিল্পীর মতই স্বদেশের প্রাকৃতিক ও মানবিক সৌন্দর্যে চিরকাল পরমমুগ্ধ মমত্ব বুদ্ধিই সাধন করিয়া গিয়াছেন। বিদেশী ভাববস্তু এবং সাহিত্যরীতির পথে হইলেও, তাঁহার শিল্পের একটি প্রধান সিদ্ধিই উহাদের বাঙ্গালীত্ব! বঙ্গমাতার অপর এক ভারতরত্ন এবং মধুভক্ত বরপুত্র, বর্তমান যুগের কর্মক্ষেত্রেই প্রকৃত জাতীয়তা-সাধক বরপুত্র স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, মধুসূদনের দেশপ্রাণতাকে প্রাণে-প্রাণে আস্বাদন করিয়া যাহা বলিয়াছেন, তাহাই এস্থলে উদ্ধার করিব—"মধুসূদন ইয়োরোপে ছিলেন, কিন্তু অন্তর তাঁহার ভারতে বিশেষতঃ বঙ্গে পড়িয়াছিল। কবে বাঙ্গালার শ্রীপঞ্চমী, কবে শরতে শারদার অর্চনা, কবে বিজয়া দশমী, কপোতাক্ষ নদ কেমন কুল্‌কুল্ করিয়া বহিয়া যায়, কোন্ ঘাটে ঈশ্বরী পাটনী খেয়া দিয়াছিল—সুদূর ফরাসী দেশে বসিয়া, বিলাসের তরঙ্গে যে দেশ প্লাবিতপ্রায় সেই স্থানে বসিয়া, তিনি বঙ্গের এ সমস্ত সুখস্মৃতি মনে জাগাইতেন ও না-জানি কতই আনন্দ পাইতেন! বাঙ্গালার মেঘমুক্ত শারদাকাশে সায়ংকালের তারা যে কত সুন্দর, তাহা তিনি ভারসেল্‌সে (Versailles) বসিয়া কল্পনানেত্রে দেখিতে পাইতেন! জন্মভূমি সাগরদাঁড়ীর অবিদূরে, নদীতীরে, বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির নিশাকালে পর্যটকের মনে যে কি ভাব জাগাইত, কেমন একটা ঘুমে নয়ন ছাইয়া আসিত, সে-সমুদয় তিনি সাগর-পারে থাকিয়াও অনুভব করিতে পারিতেন। ফলতঃ তাঁহার হৃদয় যথার্থ-ই মধুময় ছিল। 'বাঙ্গালার ফুল

বাঙ্গালার জলে, বাঙ্গালার মাটি বাঙ্গালার ফলে' তাঁহার অন্তর-বাহির ভরপুর হইয়া গিয়াছিল।"

এই তো 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র দেশ-প্রাণ এবং মধুপ্রাণ বাঙ্গালী মধুসূদন!

তবে মধুকবির অনেক ক্ষুদ্র কবিতার মধ্যে নানাস্থানে একটা ব্যাহতশক্তি এবং পদগতির একটা অসচ্ছলতা পাঠকমাত্রেই লক্ষ্য করিতে পারিবেন। আজ, পঞ্চাশ বৎসর পরে [১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ], তাঁহার আবিষ্কৃত কবিত্ব-পথে যাতায়াত করিয়া আমাদের অনেক ক্ষীণশক্তি এবং ক্ষীণমস্তিষ্ক কবিতা-লেখকও যে স্থূল-দৃষ্টিতে তদপেক্ষা বহুতর বা আপাততঃ ভাববত্তর ক্ষুদ্র কবিতা এবং গীতি কবিতা চয়ন করিতে পারিতেছেন, তাহাও অনেকেরই ধারণা হইতে থাকিবে। কিন্তু মধু ছিলেন বৃহৎ ভাব-প্রাণতার বিমুক্ত আকাশবিহারী পক্ষী (অ্যাল্‌ব্যাট্রস্—ঝড়ের পাখী)। গীতি কবিতার বিশেষতঃ আধুনিক বঙ্গের এই সঙ্গীত জাতীয় কবিতার ক্ষুদ্র পঞ্জরের মধ্যে তাঁহার পাখা মেলিবার এবং নিঃশ্বাস ফেলিবার অবকাশও যেন হয় না! এজন্য কোন কোন কবিতায় যেন মধুসূদনের শিল্পাদর্শটিই পৃথক বলিয়া মনে হইবে। উহারা যেন তাঁহার চিত্ত-স্পন্দনকেই ধরিতে পারিতেছে না! উহাদের ছন্দ, তাল, ভাষা এবং ভাবভঙ্গী যেন পরস্পর সহযোগী হইতে জানে নাই; কোথাও হয়ত 'বুদ্ধি' আসিলে ভাব আসিতেছে না, ভাব আসিলে ভাষা বিগ্‌ড়াইয়া যাইতেছে! গতি, দীপ্তি, কায়া এবং আত্মা ওতপ্রোত হইয়া উহাদিগকে এক একটি স্বতন্ত্র 'প্রাণী'রূপে খাড়া করে নাই; অথচ প্রাণী না হইলে কবিতাই হয় না। কিন্তু, যেমন বলিয়া আসিয়াছি, অপরাধ শিল্পীর ততটা নহে, যতটা অপ্রাপ্তবয়স্কা বঙ্গ-বাণীর! বঙ্গের সরস্বতী তখন যাবৎ, সংস্কৃত-তন্ত্রের বাহিরে, কেবল বৈষ্ণবী প্রেম-ভাবুকতা এবং 'গ্রাম্যজীবন'তার পথেই স্বাধীন শক্তি-সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন; কিন্তু, মধুসূদনের মর্মগত 'বিশ্বজন'তা, বলিষ্ঠ সাহিত্য-বুদ্ধি এবং পৌরুষ-প্রশস্ত ভাবুকতার ধারণাপথে তখনো যেন 'সমর্থ' হইয়া উঠিতে পারেন নাই! মধুসূদনের ইংরেজী কবিতাগুলির পাশাপাশি রাখিলেই

বুঝিতে পারি, তাঁহার ইংরেজী ও বাঙ্গালা কবিতার শিল্প-শক্তির মধ্যে পার্থক্যটি কোথায়! ঠিক 'নওল কিশোরী' এবং পূর্ণযৌবনা ভাবিনীর মধ্যে যাহা পার্থক্য। যেমন 'ব্রজাঙ্গনা'য়, তেমন 'চতুর্দশপদী' কবিতা'য় কবি যেখানেই না গভীর মনস্তত্ত্বের সম্মুখীন হইয়াছেন, সেখানে ন্যূনাধিক ব্যাহতি এবং ইচ্ছাকৃত বিরতির ভাবটিই যেন আমাদের চিত্তকে আঘাত করে। মনে হয়, ইংরাজী ভাষায় হইলে কবি যেন আরও কত সুন্দর ও গভীরতর ভাবুকতায় ডুব দিতে পারিতেন, বঙ্গভাষাতেই আর কিছুকাল সাহিত্য-জীবন অব্যাহত রাখিতে পারিলে আরও কত কি যেন করিয়া যাইতে পারিতেন! এসকল কবিতা-গ্রন্থ উহাদের স্বক্ষেত্রে, ভাব-সামর্থ্য এবং আন্তরিকতায় এখনও বঙ্গসাহিত্যে অনতিক্রান্ত আছে সত্য—কিন্তু মধুসূদনের মনোযোগী সঙ্গী হইলেই বুঝিতে পারিব আরও কিছুকাল আত্মপথে চলিলে তিনি বঙ্গভাষাতেই উহাদের বস্তু এবং ভাবকে কি উজ্জ্বলতর মূর্তি এবং গভীরতর স্ফূর্তি দান করিতে পারিতেন! বঙ্গে দ্বিতীয় মধুর জন্ম হইবে না; এবং একালে উহার সম্ভাবনাও নাই। মধু বঙ্গভাষার আর্য-অংশে যে শক্তিসাধনা আরম্ভ করিয়াছিলেন, তাহা কোন কোন দিকে পরকালের বঙ্গসাহিত্যে পরিণতি লাভ করিয়াছে; কিন্তু অনেক দিকে যে পারে নাই, তাঁহার আরব্ধ কার্যই যে সুসম্পূর্ণ হয় নাই, তাহা বঙ্গসাহিত্যের সাধক মাত্রেই বুঝিতেছেন।

এখন 'কৃষ্ণকুমারী'র কথা পড়িয়াই এ-সূত্রের উপসংহার করিব। শর্মিষ্ঠা ও পদ্মাবতী বঙ্গসাহিত্যকে সুখান্ত নাটক (comedy) দিয়াছে; বিষাদান্ত নাটকের (tragedy) অভাব ছিল। মধুসূদন 'কৃষ্ণকুমারী' রচনা করিয়া সে অভাব পূর্ণ করিয়াছেন। এস্থলেও একটা প্রচণ্ড বিদ্রোহ! সংস্কৃতের মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত উভয়ে বিষাদান্ত হইলেও ভারতীয় আর্যজাতির মন ভবজীবনের অবসানকে —মানুষের মহাযাত্রা এবং মহাপ্রস্থানকে—সমুচিতভাবে হৃদয়ঙ্গম করিতে জানিলেও, প্রাচীনভারত তাহার সামাজিক নাট্যোৎসব-আদিতে কোন বিষাদান্ত প্রয়োগ আদবেই যেন পছন্দ করে নাই! সমাজের বাহিরে চতুর্থ আশ্রমের একটা স্বতন্ত্র সর্বনাশ এবং

সর্বত্যাগের-আদর্শের প্রতিষ্ঠান ছিল বলিয়াই, বোধ করি সংসারজীবনের মধ্যে আবার উহাকে আমল দিতে চাহে নাই! ঐরূপে সন্ন্যাসের মধ্যেই পূর্ণস্বাধীনতা এবং সর্ব-সমতার আদর্শ পরিপোষিত ছিল বলিয়া, আবার সমাজগণ্ডীর মধ্যেও সমতা এবং স্বাধীনতার প্রাবল্য পোষণ করিতে যেন চাহে নাই। যেরূপেই হউক, ভারতীয় সাহিত্যে বিষাদান্ত নাট্যাভিনয় আদবেই জন্ম অথবা পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। [সম্প্রতি গবেষক ও পণ্ডিতগণের অত্যুৎসাহে মহাকবি ভাস-এর কয়েকটি 'বিষাদান্ত নাটক'—(tragedy)এর সন্ধান নাকি পাওয়া গিয়াছে] ভারতের সাহিত্য-শাস্ত্রাদিও উহা পুনঃপুনঃ নিষেধ করিয়াছে। গ্রীকসাহিত্যের নব-পরিচয় যেমন খ্রীষ্টান ইয়োরোপকে বিষাদান্ত নাটকের সহমর্মী হইবার পথ প্রদর্শন করিয়াছে, তেমন একালের সকল ইয়োরোপীয় সাহিত্যেই যেমন গ্রীক-আদর্শের তেমন খ্রীষ্টান-আদর্শের বিষাদান্ত নাটকও সৃষ্টি করিয়াছেন। গ্রীক নাটকের পরিচালক-তত্ত্ব যেমন fate বা অপরিহার্য অদৃষ্ট, তেমন খ্রীষ্টানী আদর্শের বিষাদান্ত নাট্যতত্ত্বকেও 'Sacrifice' বা আত্মোৎসর্গ বলিয়াই নির্দেশ করিতে পারি। বলা বাহুল্য, উভয় আদর্শ ই স্বতন্ত্র অথবা সম্মিলিত ভাবে বিষাদান্ত নাটকের নিয়ামক হইতে পারে। ভারতবর্ষ, গ্রীক-'অদৃষ্ট' অথবা খ্রীষ্টান-'উৎসর্গ'—উভয়ের সহিত অবাধে সহানুভূতি করিতে পারে, তাহার সমাজবুদ্ধি এবং ধর্মবুদ্ধির ক্ষেত্রেও **উভয়** আদর্শের চূড়ান্ত সহানুভূতি ঘটিতে পারে। এ প্রসঙ্গে সেদিকে আর বাক্যব্যয় করিব না। মধুসূদন বিশ্বনাথের ['সাহিত্য দর্পণ'-লেখক বিশ্বনাথ কবিরাজ-এর] 'পাতি' [dicta] উপেক্ষা করিয়াই বঙ্গের সাহিত্যে এই নব নাটকের প্রতিষ্ঠা করিতে উদ্যত হইলেন, এবং ছয় সপ্তাহের মধ্যেই 'কৃষ্ণকুমারী'র সৃষ্টি করিয়া ফেলিলেন! অভিনয়ের সুবিধার জন্য মধুসূদন কবিত্বের দাবী এবং প্রেরণা উপেক্ষা করিয়াও অভিনেতা এবং সামাজিকের হস্তে আত্মসমর্পণ করিলেন —অর্থাৎ নাটকটি গদ্যেই রচিত হইল। কিন্তু হায়, যেজন্য মধুসূদনের এই পরাজয় স্বীকার, আকাশবিহারী পক্ষীকর্তৃক ইচ্ছাকৃত পক্ষচ্ছেদ, সে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ হইল না। অশুভান্ত নাটক বলিয়া, বেলগাছিয়ার কর্তৃপক্ষগণ আপনাদের গৃহে ঐ 'অমঙ্গল্য'

অভিনয়ের স্থান দিতে অস্বীকৃত হইলেন! তৎপূর্বে মধুর প্রহসন দুইটি এরূপ একটা 'প্রবলবাধা'-র জন্য অভিনীত হইতে পারে নাই। 'একেই কি বলে সভ্যতা' এবং 'বুড়ো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' ভালমন্দ উভয়দিকে তৎকালের সমাজ জীবনের এত নিখুঁত প্রতিকৃতি হইয়াছিল যে, উহাদের তালিম দেখিয়াই শ্রোতৃবৃন্দ গায়ে পড়িয়া সমাজের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তিকে ঐ সমস্ত সাহিত্যচরিত্রের একেবারে 'আসল' স্থির করিয়া ফেলিল! উক্ত সমস্ত ক্ষমতা শালী 'আসল' ব্যক্তিগণের রোষ-দৃষ্টি এবং বাধা-বিঘ্নের ফলেই প্রহসন দুইটি অভিনীত হইতে পারে নাই। মধুসূদন সে ঘটনা স্মরণ করাইয়া দিয়াই লিখিলেন, "মনে রাখিও, তোমরা ইহার পূর্বে প্রহসন দুটির বেলাতেও আমার পক্ষচ্ছেদ করিয়াছ, এখন তোমরা নাটকটাও অভিনয় না করিলে আমি বঙ্গভাষায় কলমই ছাড়িয়া দিব—না হয় হীব্রু অথবা চীনা ভাষাতেই লেখনী চালাইতে হইবে।" ['......Mind, you all broke my wings once about the farces; if you play a similar trick this time, I shall forswear Bengali and write books in Hebrew or Chinese! '—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ] কিন্তু, কৃষ্ণকুমারীর অভিনয় ঘটিয়া উঠিল না। বলিয়া রাখি, উহার প্রকাশের প্রায় ছয় বৎসর পর, বাঙ্গলায় স্বাধীন রঙ্গমঞ্চ স্থাপিত হওয়ার পরেই উক্ত 'অমঙ্গল্য' নাটকটির প্রথম অভিনয় হয়। মধুসূদনের নাটক রচনার তৃষ্ণা উক্ত প্রতিকূলতা হইতে চিরকালের জন্য একেবারে নির্বাপিত হইয়া যায়; উক্ত ঘটনা হইতে তাঁহার জীবনেও একটা অসাধারণ স্থল-কম্পের সূচনা হয়।

মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, 'রাজারা যদি প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা নাটককে উৎসাহিত করেন, আমি অসম্ভবকেও সম্ভব করিতে পারি। যদি না করেন, তবে 'মাথা কুটা' ব্যতীত আমাদের উপায়ান্তর কি? অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছি— Alas! born an age too soon!' 'How will you answer at the bar of Posterity!' পরকালের পাঠক, এস্থলে দাঁড়াইয়া বুঝিয়া লউন, কবি-হৃদয়ের ইহা যে গভীরতম দীর্ঘনিঃশ্বাস! মধুসূদন সংসারজীবনে দুঃখ-দৈন্য-

দুরদৃষ্টের তাড়নায় আর যত দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়াছেন, উহাদের কোনটি-ই ইহার সমতুল্য নহে ; কিংবা ইহার তুল্য এত বড় অনিষ্টফলও প্রসব করিতে পারে নাই। সংসারে কবির এস্থলেই প্রধান দুরদৃষ্ট —হাহাকার —মৃত্যু-যন্ত্রণা ! —'অকালে, অসময়ে জন্মগ্রহণ করিয়া মরিয়া গেলাম ! আমার স্থিতি হইল না—দেশের লোক আমার পোষকতা করিল না--দেখিল না, বুঝিল না ! কি করিতাম—কত করিতে পারিতাম !' এস্থলেই মধুর কবি-জীবনের আর একটি বড় ঘটনা—বাঙ্গালার নাট্য-সাহিত্যের মস্তকেও সর্বাপেক্ষা বৃহৎ বজ্রপাত ! এই অসাধারণ শক্তিশালী কবি সুযোগ এবং সুবিধা পাইলে কি করিতে—কত করিতে পারিতেন ! মধুর পর আর যে সমুচ্চ কবি, শক্তিশালী প্রকৃত নাট্য-প্রতিভার সংঘটনা বঙ্গে ঘটে নাই, তাহা দ্রষ্টামাত্রেই বুঝিতেছেন। এঘটনা আমাদের চিরকালীন অনুশোচনার স্থান হইয়া রহিল।

বলিতে হইবে, 'কৃষ্ণকুমারী' মধুসূদনের শ্রেষ্ঠ নাটক। টডের 'রাজস্থানকুসুমের কাহিনী' সকলের পরিচিত ; মধুসূদন উহাকে অবলম্বন করিয়া একটি সুন্দর করুণান্ত ('Tragedy) নাটক রচনা করিয়াছেন। পরিকল্পনা এবং সৃষ্টিশক্তির এবং প্রকৃত নাট্য-রচনা শক্তির বহুল পরিচয় ইহাতে আছে। এখন যাবৎ বাঙ্গালার কোন নাটক উহাকে শিল্পতা-বিষয়ে অতিক্রম করিতে পারে নাই। উৎসাহ পাইলে মধুসূদন যে কি করিতে পারিতেন, এ নাটক হইতে তাহার পরিচয়ও লাভ করিতে পারি ! কবির দীর্ঘনিঃশ্বাসটির পুনরাবৃত্তি করিয়াই বলিতে ইচ্ছা করে—
—'Alas, born an age too soon' !

নাটকটিকে সেকালের অভিনয়যোগ্য করিবার উদ্দেশ্যে মধুসূদন তাঁহার কবিত্বের ডানা স্বয়ং কাটিয়া, মাটিতে হামাগুড়ি দিয়াছেন বই নহে—উহাকে সাহিত্য হইতে দেন নাই। সেক্সপীয়রের নাটকগুলির ন্যায় সাহিত্য-আদর্শে রচিত হইলে উহা বঙ্গসাহিত্যের একটা চিরগৌরবের সম্পত্তি হইতে পারিত! তবু যাহা পাইয়াছি তাহার মহাত্ম্যই আমাদের চিন্তা করা উচিত। কৃষ্ণকুমারী রচনার উপলক্ষে মধুসূদনের যে সকল চিঠিপত্র পাওয়া গিয়াছে—সে সমস্তও বঙ্গীয় নাট্য সাহিত্যসেবী মাত্রের পুনঃপুনঃ চিন্তার বিষয় হইয়াই আছে।

উদয়পুরের রাণা ভীমসিংহের দুহিতা কৃষ্ণার সৌন্দর্য-রবে আকৃষ্ট হইয়া জয়পুরের কামুক রাজা জগৎসিংহ এবং মারবারের রাজা মানসিংহ উভয়ে তাঁহার পরিণয় প্রার্থনা করেন—উভয়ের প্রতিজ্ঞা, কৃষ্ণাকে না পাইলে তাঁহারা উদয়পুর ধ্বংস করিবেন। রাজা ভীমসিংহের অবস্থা তখন অতীব শোচনীয়; অথচ প্রতিদ্বন্দ্বিগণ উভয়েই প্রবলতর; সুতরাং রাজা এবং পাত্রমিত্র সকলে মিলিয়া কৃষ্ণকুমারীকে হত্যা করাই জল্পনা করেন। কিন্তু কৃষ্ণকুমারী দেশের কল্যাণে এবং বংশের মর্যাদা রক্ষার উদ্দেশ্যে স্বয়ং বিষপানেই প্রাণত্যাগ করেন। এই ইতিহাসকে অবলম্বন পূর্বক মধুসূদন কৃষ্ণকুমারী রচনা করিয়াছেন। "আমি জগৎসিংহকে ইতিহাসে যেমন পাইয়াছি, তেমনই করিয়াছি—ক্ষুদ্রচেতা এবং বিলাসী ব্যক্তি। ভীমসিংহ বিষণ্ণ প্রকৃতি এবং গম্ভীর চরিত্রের লোক; ভীমসিংহের মহিষীও তাঁহার মতই বিষণ্ণ চরিত্র এবং গম্ভীরা না হইয়া পারেন না"। বিলাসী জগৎসিংহের দিক হইতেই কবি ঘটনার সৃষ্টিপূর্বক নাটকের চক্র নিয়মিত করিতেছেন। এই বিলাসীর আবার একটা 'বিলাসিনী' তাহার আবার একজন সখী এবং ধনদাস নামক একজন দুষ্কর্ম-সহচর সৃষ্টি করিয়া কবি ঘটনাচক্রকে ঘর্ঘর রবে ছুটাইয়াছেন। "ইহা যখন বিষাদান্ত নাটক, আমি কেবল হাস্য-উদ্রেকের উদ্দেশ্যে কোন দৃশ্যের অবতারণা করি নাই। উহাতে নাটকটির স্থায়ীভাব বিনষ্ট করিত। কিন্তু চলিবার পথে যখন কোন হাস্যকর কথা সহজে আসিয়া গিয়াছে, তাহাকেও উপেক্ষা করি নাই। এবিষয়ে আমার উপদেশ এই হইতে পারে যে বিয়োগান্ত নাটকে ইচ্ছা করিয়াই হাসি তুলিবার চেষ্টা করিও না, তবে যদি কোন হাসির কথা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়, তা' হইলে গৌণ-দৃশ্যগুলিতে উহাকে উপেক্ষাও করিবে না, উহাতে বরং একটা আনন্দজনক বৈচিত্র্যই আসিবে। সেক্সপীয়রের তাহাই প্রণালী ছিল। তাঁহার শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটকগুলিতে সেক্সপীয়র কখনও ইচ্ছা করিয়া হাস্য-রসিক হইতে যান নাই।"

'কৃষ্ণকুমারী'তে নাটকীয় অবস্থা এবং ঘটনার স্বাভাবিক গতি হইতে এবং চরিত্রের ভাবগতির পরিণতি হইতেই মনে যে রসের উদ্রেক হওয়া সম্ভবপর,

কবি কেবল সে দিকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। কেবল ভাবপ্রধান কথা, সঙ্গীত-তন্ত্রীয় ভাবুকতা অথবা উচ্চকণ্ঠ বক্তৃতার দ্বারা মানুষকে আবিষ্ট করিতে যান নাই। তিনি যে-শিল্পতার আদর্শে চলিয়াছিলেন, তাহার পরিচয়ও পাইতেছি। "আমরা এসিয়াটিক জাতি; ইয়োরোপীয়গণ হইতে যে আমরা অতিরিক্তমাত্রায় ভাবপ্রবণ, তাহাতে সন্দেহ হয় না। সেক্সপীয়রের মহিমময় নাটকগুলির দিকে দৃষ্টি কর। Mid-Summer Night's Dream এবং 'রোমিও-জুলিয়েট' ও অপর দুই একটা ব্যতীত এমন নাটক নাই যাহাকে প্রকৃত প্রস্তাবে 'রোমান্টিক' বলা যায়। রোমান্টিক কিনা, যেভাবে 'শকুন্তলা' রোমান্টিক। উচ্চশ্রেণীর ইয়োরোপীয় নাটকে তুমি মনুষ্য-জীবনের কঠোর সত্যসমূহের ধারণা পাইবে, সমুন্নত ভাবুকতা এবং ভাবধর্মী বীরাচারই পূর্ণ পরিমাণে পাইবে। আমাদের মধ্যে কেবল মধুরতা, কেবল কোমলতা, কেবল 'রোমান্স'! আমরা জগতের সত্যমূর্তি বিস্মৃত হইয়া কেবল পরীরাজ্যের স্বপ্ন দেখিতেই লাগিয়া আছি! এদেশে প্রকৃত নাটক এখন যাবৎ সামান্য-মাত্রও উন্নতি কিম্বা পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে নাই। + + + ভাষার বিষয়েও আমি বঙ্গভাষার স্থায়ী প্রবণতার দিকেই লক্ষ্য রাখিব—সেক্সপীয়র যেরূপে ইংরেজী ভাষার স্থায়ী তত্ত্বটাকেই তাঁহার নাটকাদিতে অবলম্বন করিয়াছিলেন।

ইহাও প্রাচীন-তন্ত্রের বিরুদ্ধে আর একটা বিদ্রোহের সুর সন্দেহ নাই। কিন্তু, মধুসূদন যে উহার অনুসরণ করিয়া বঙ্গসাহিত্যে নূতন নাটকের সৃষ্টি করিবেন আশা করিয়াছিলেন, আরও ৩।৪ খানি নাটক রচনা করিয়া বাঙ্গালীকে যে দেখাইবেন ভাবিয়াছিলেন, সে আশা ফলবতী হইতে পারে নাই। 'কৃষ্ণকুমারী' নাটকেই তিনি গ্রীক-এবং খ্রীষ্টান-আদর্শের অপূর্ব সংমিশ্রণ দেখাইয়া গিয়াছেন! কৃষ্ণকুমারীকে তাঁহার পিতার আদেশে হত্যা করা হইলেই উহা হইত একটা গ্রীক নাটক—'অপরিহার্য অদৃষ্টবাদের নাটক', কিন্তু কৃষ্ণার ঐ নিয়তি না করিয়া মধুসূদন তাঁহার দ্বারা 'আত্মোৎ-

সর্গই দেখাইয়াছেন। গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং অন্তরাদেশ নামক পদার্থের ফল না হইলে কবিকে এই সূক্ষ্ম কথাটি যোগাইতেই পারিত না। আপাতদৃষ্টিতে সামান্য মাত্র আঁচড়েই সমগ্র নাটকের প্রবৃত্তি এবং রস-নিষ্পত্তি কি অভাবনীয় পরিবর্তন লাভ করিয়াছে! কৃষ্ণকুমারীর ভাষার মধ্যে মধুসূদন বঙ্গভাষার যে গার্হস্থ্যশক্তি, যে গ্রাম্যতাবর্জিত অথচ 'আটপৌরে'-সামর্থ্য আয়ত্ত করিয়াছেন, তাহাও সর্বতোভাবে অপূর্ব! বাক্যপ্রতিভাশালী মধুসূদন ব্যতীত এই অভূতপূর্ব আবিষ্কার-ঘটনা এবং সাহিত্যের ক্ষেত্রে উহার অবতারণা যে সম্ভব ছিল না, তাহাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। এইরূপ 'শিল্প-দৃষ্টি' বিদ্যাসাগর কিংবা হুতোম, প্যারীচাঁদ বা রামনারায়ণের মধ্যে নাই। কৃষ্ণকুমারীর এ মাহাত্ম্য অনেক সমালোচকের দৃষ্টি এড়াইয়া গিয়াছে।

মধুসূদন লিখিয়াছিলেন, " 'শর্মিষ্ঠা' নাটকে আমি অনেক সময়ে নাট্যকারের ক্ষেত্র অতিক্রম করিয়া কবির ক্ষেত্রে অনধিকার প্রবেশ করিয়াছি, কবিত্বের অনুরোধে আমি সত্যকে বিস্মৃত হইয়াছি। বর্তমান নাটকে আমি নিজের দিকে সচেতন দৃষ্টি রাখিতে চাই। আমি কবিত্বের জন্য চারিদিক খোঁজ করিয়া চলিব না—অবশ্য আপনাআপনি আসিয়া পড়িলে আমি উহাকে ছাড়িয়াও যাইব না। তবে, ঐরূপে চলিতে গিয়া কবিত্বের সঙ্গে অনেকবার দেখা পাইব আশা করি। আমি এমন সমস্ত চরিত্র সৃষ্টি করিতে চেষ্টা করিব যাহারা স্বাভাবিক মতেই কথা কয়, কেবল কবিত্ব কপ্ চাইতেই চায় না। সেক্সপীয়রের উহাই ত আদর্শ ছিল।"

কথাগুলি নাট্য-শিল্পীর পক্ষে কত মূল্যবান্! এই শক্তিমান্ কবি হইতে আমরা অনেক আশা করিতে পারিতাম। কিন্তু যে মহাশক্তি মধুসূদনকে পরিচালিত করিতেছিলেন, তাঁহার (সেই মহাশক্তির) গতি বিরূপ হইল—মধুসূদনকে বিলাত ছুটিতে হইল। 'কৃষ্ণকুমারী'র প্রতিষেধ যে মধুসূদনের জীবন-পরিবর্তনের একটি প্রবল কারণরূপে দাঁড়াইয়াছিল, তাহাও আমাদিগকে বুঝিতে হইবে। উহা হইতেই যেন নিজের শক্তি-সম্মানহীন সাংসারিক

অবস্থার দিকে তাঁহার দৃষ্টি অত্যধিক সজাগ হইয়া উঠিয়া মধুসূদনকে অসহিষ্ণু করিয়া তুলিল ; ফলতঃ, একেবারে উন্মত্ত করিয়া তুলিল! দুরবস্থার অপচ্ছায়াকে ডিঙ্গাইবার জন্যই কবি সাগর লঙ্ঘন করিলেন—ছায়াটিও সঙ্গে সঙ্গেই রহিল! মধুসূদনের পক্ষে বিলাত যাওয়া এবং Madhusudan Dutt, Esq., হওয়ার অর্থই হইতেছে—জীবনের নবগুণ অভাব-বৃদ্ধি অথচ অর্থাগমের হ্রাস। সহিষ্ণুতার স্খলন হইতেই সর্বনাশ ঘটিয়াছিল, বলিতে পারি। কবি (মধুসূদন) মর্মযাতনায় লিখিয়াছিলেন, 'এ দেশে টাকা ব্যতীত কোন সম্মান নাই। তোমার যদি টাকা থাকে, তাহা হইলেই তুমি বড় মানুষ। এ জাতি এখনো অধম অবস্থা অতিক্রম করে নাই। এদেশে বড়লোক কে? চোরবাগান এবং বড় বাজারের অস্তিত্বহীন ব্যক্তিসমূহ। টাকা চাই ভাই, টাকা! যদি মনে কর, আমি সাহিত্যে কিছু করিয়া যাইতে পারিতাম—আমার শক্তি ছিল। কিন্তু আমি অবস্থাগতিকে শক্তিকে চূড়ান্তভাবে কাজে লাগাইতে পারিলাম না। আমি যাহা করিয়া গেলাম, হে আমার স্বদেশ, উহাতেই সন্তুষ্ট হও!'

এখানেও ডাকিনীর কণ্ঠ শুনিতে পাইতেছেন না কি? যে ব্যক্তি সরস্বতীর পদামৃত পান করিয়াছে, অমর হইয়া গিয়াছে, এই নশ্বর দুনিয়ার বড় বাজারের এবং চোরবাগানের লক্ষ্মীপেঁচাদের দেখিয়া তাঁহার এমন বুদ্ধিভ্রংশ হইল কেন? মধুসূদন দত্ত নামক বঙ্গদেশের চিরজীবী লোকটি, নিজের অহংতত্ত্বে এমন নিত্য-সচেতন ব্যক্তিটি কতকগুলি ক্ষণজীবী এবং ব্যক্তিত্বহীন মনুষ্যের সমক্ষে নিজেকে ছোট মনে করিতে পারিল! নিজেকে এত ছোট মনে করিল যে, নিজের অমর কৌলীন্যটুকু ভুলিয়া ঐগুলাকে একেবারে ঈর্ষা করিয়াই বসিল! এ স্থানেই নিয়তি—একেবারে গ্রীক-অদৃষ্ট! চিত্তের যে অসামান্য সংযমের সাহায্যে মধুসূদন কাব্য লিখিতেন—অসাধারণ সংযম ব্যতীত ঐ সমস্ত কাব্যের এক পংক্তিও যে লেখা হইতে পারে না তাহাই বুঝিয়া লউন—সে অসামান্যতার সঙ্গে সঙ্গেই এত বড় প্রচণ্ড পাগলামি!

এ স্থলেই মধুকবির জীবনমর্মের নিদারুণ এবং দুর্বোধ্য অদৃষ্ট! যিনি সাহিত্যে সরস্বতী-মাতার চরণ কমলের মধুপ্রার্থী, তাঁহাকে যে সর্বাগ্রে নিজের সাংসারিক অদৃষ্টে 'যদৃচ্ছালাভ সন্তুষ্ট' হইতে হইবে। এদিকে বরঞ্চ একেবারে সন্ন্যাসী হওয়াই যে দরকার! যে-গুণে তিনি তপস্বী হইয়া মানুষের জন্য অজানা ভাব-রাজ্যের বাণী-দূত হইবেন, সে-গুণটিই যে তাঁহাকে দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে ন্যূনাধিক তপস্যাহীন করিবে! আবার, অপরিচিত রাজ্যের খবরদারী করেন বলিয়া, সে গুণটিই যে তাঁহাকে প্রথম প্রথম সাধারণের নিকট অশ্রদ্ধেয়, এমন ক, হেয় এবং অবজ্ঞেয় করিয়াও তুলিবে। সাধারণের অবজ্ঞার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া চলা-ই যে তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য অদৃষ্ট! বাণী-মাতার পদামৃতই তাঁহাকে যদি বলদান করিতে না পারে, তবে এ সংসারে তাঁহার আর যে কোন সহায়ই রহিল না! মধুসূদনের এইটি ভুল হইয়াছিল যে, তিনি মনে করিলেন, কবি থাকিয়াই দুনিয়াদারীর ক্ষেত্রে অপর সমস্ত লোকের ন্যায় অর্থ-তপস্বী হইতে পারিবেন; তিনি নিজের অধিকার ভুলিয়া পরের ক্ষেত্রে অধিকার বিস্তার করিতে গিয়াছিলেন।

ইহা মধুচরিত্রের একটা অসাধারণ দুরদৃষ্ট! আমরা দেখিতেছি, এ দুর্বলতার পথেই তাঁহাকে সংসারে নিদারুণ কষ্টভোগ করিতে হইয়াছে; পরিশেষে প্রাণে বাঁচিয়া থাকিয়াও, সরস্বতী-মাতার দয়াবঞ্চিত হইয়া নিদারুণ হাহাকারে দিন কাটাইতে হইয়াছে। আশ্চর্য এই যে, তথাপি মধুর সহৃদয়তার হ্রাস হয় নাই—তিনি মনুষ্যদ্বেষী অথবা বিষাক্ত-হৃদয় হইয়া পড়েন নাই। মধু তাঁহার এক সমালোচককে কি লিখিয়াছিলেন দেখুন "আমি তোমার বন্ধু বলিয়া কেবল বন্ধুতার খাতিরে মুখ-চাওয়া-সমালোচনা বা-প্রশংসা একেবারেই করিও না। ঠিক যাহার উপযুক্ত মনে কর, তাহাই আমাকে দিও। আমার মতন এমন পোষা কুকুর সাহিত্যের ক্ষেত্রে আর লেজ নাড়ে নাই!" ["If you should review the work, pray, don't spare me because I am your friend. Pitch it into me as much as you think I deserve.

I am about the most docile dog that ever wagged a literary tail."—রাজনারায়ণ বসুকে ১৫ই মে, ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত কবি মধুসূদনের পত্র। —সম্পাদক।]

পৌরুষনিষ্ঠ সাধুতা এবং সহৃদয়তার সঙ্গে সঙ্গেই অন্যদিকে ঐরূপ স্থিতি-চঞ্চল দুর্বলতা! কোনরূপ বিরুদ্ধ সমালোচনাতেই যে মধুসূদনকে বিরূপ করিতে পারে নাই, উহার মূলে যে আত্মনিষ্ঠা এবং কেন্দ্রনিষ্ঠা আছে, তাহার সঙ্গে কবির উক্তরূপ আত্মবিস্মৃতির সঙ্গতি করা যায় না। কবিগণের মধ্যে এইরূপ একটি না একটি দুর্বোধ্য অসঙ্গতি সময় সময় দেখা যায়। আমরা বঙ্গের এমন এক বড় কবিকে—একেবারে অমৃতপদে উত্তীর্ণ কবিকেই—জানিতাম, যাঁহার আত্মাদর এবং আত্মচৈতন্যই তাঁহাকে জীবনপথে আত্মবল দান করিতে যেন পর্যাপ্ত নহে, যিনি কোনরূপ বিপক্ষতা এবং বিরুদ্ধ সমালোচনার লেশমাত্র সহ্য করিতে পারেন না, ভক্তি, পূজা এবং প্রণামাঞ্জলি ব্যতীত যাঁহার দিন চলাই ভার হইয়াছিল, যিনি নিজের সমালোচক নামক দুরদৃষ্ট জীবটিকে কোথাও দেখা পাইলে একেবারে খুন করার মতই ভাবগতিক না দেখাইয়া পারেন নাই! একেবারে ব্যাঘ্রের অনুরূপ জিঘাংসাদৃষ্টি এবং জাতিসর্পের রোষ-বৃষ্টি! ললিত কলার কোন সিদ্ধ-সেবক এবং অকৃত্রিম সারস্বত জীবনে কি করিয়া এইরূপ অনভীষ্ট পদার্থের সম্ভাবনা এবং অবকাশ ঘটিতে পারে? এরূপ পরপ্রেক্ষা এবং পরজীবিতার প্রয়োজন থাকিতে পারে? উত্তর-ইয়োরোপের অমর শিশু গল্প-শিল্পী হান্স এণ্ডার্সনের জীবনীতেও ইহার দৃষ্টান্ত আছে। ঘনিষ্ঠ দৃষ্টি করিলে হয়ত অনেকই মিলিবে। কিন্তু কবির প্রতি স্নেহ-সহকারে দৃষ্টি করিতে পারিলেই এ দুর্ঘটনা সহ্য করিতে পারা যায়। এঘটনা যে অনেকের পক্ষেই একরূপ অপরিহার্য! যে ভাবতন্ত্রতার দরুণ তিনি বড় কবি, যে স্নায়ুতন্ত্র বহিঃ-সংসারের সুখ-দুঃখের সম্পর্কে অপরূপভাবে সংগ্রাহী হইয়া তাঁহার দেহকে কবি-দেহ করিয়াছে, যাহাতে তাঁহার দেহকে ভাবের উপযুক্ত গ্রাহক এবং কবি-আত্মার-উপযোগী 'গৃহ'রূপে স্থির করিয়াছে, সেই ভাব-ধর্ম এবং স্নায়ু-ধর্মই তো

আবার তাঁহাকে সমালোচনায় অসহিষ্ণু, বিরুদ্ধবাদে অসহন এবং অহং-ভাবুক করিয়া গিয়াছে! যে গুণে তিনি একজন বিশেষধর্মী বড় কবি, সে গুণেই তিনি একটি বিশেষ-দোষান্বিত অসামাজিক জীব! দেখা যাইবে শিল্পী মধুসূদনের প্রতিভা-চরিত্রে তাদৃশ কোনরূপ অসহিষ্ণুতা অথবা পরাপ্রেক্ষা ছিল না; থাকিলে, পুলিশ কোর্টের ঐ আমলাটি, সমাজের সঙ্গে সকল প্রীতিযোগভ্রষ্ট ঐ দরিদ্র ব্যক্তিটি চারিদিকের এত বিরোধ, বিপক্ষতা এবং নিন্দাঠাট্টা-টিট্‌কারীর মুষলপাত মাথায় বহিয়া অবিচলচিত্তে সেকালের ক্ষেত্রেই আপন পথ কাটিয়া লইতে এবং অপরিচিত ভাব-গঙ্গার প্রবাহকে অনিচ্ছুক বাঙ্গালীর দ্বারদেশে রাখিয়া যাইতে পারিতেন না।

আবার, মধুসূদন কেবল তো কবি ন'ন, একজন পণ্ডিতও ছিলেন! কোন কবির পক্ষে পুঁথি-পাণ্ডিত্য অথবা অর্জিত বিদ্যার যে পরিমাণে প্রয়োজন মধুসূদন উহা চূড়ান্তমাত্রাতেই অর্জন করিয়াছিলেন। দেখিতে হইবে, তথাপি তাঁহাকে পাণ্ডিত্যের প্রধান রোগটি স্পর্শ করিতে পারে নাই। জ্ঞানের ক্ষেত্রে ইতিবৃত্ত-বুদ্ধি, অগ্রগতির প্রবৃত্তি এবং পরাক্রমের প্রবৃত্তিই হয়ত প্রকৃত পণ্ডিত-ব্যক্তির প্রধান গুণ। উহা হইতেই মনুষ্যের মন নিত্যকাল নব নব ক্ষেত্রে পরাক্রমী হইয়া আপনাকে প্রসারিত করিতেছে, অজ্ঞাতের নব নব অন্ধকার-দেশে বিজ্ঞানের বিজয়-বৈজয়ন্তী অগ্রগামী করিয়া চলিয়াছে, বিচার-বিতর্ক নির্বাচন করিয়া, গ্রহণ-বর্জন এবং স্বয়ং অর্জন করিয়া জ্ঞানের অধিকার-সীমা বর্ধিত করিতেছে। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনের অধ্যাত্মক্ষেত্রে এই প্রবৃত্তি ও প্রণালীর পাপবিপত্তি এবং অনিষ্ট সম্ভাবনাও নিতান্ত কম নহে! পাণ্ডিত্যের ঐ পরাক্রমী বিচিকিৎসা হইতে যেমন পরের প্রতি আক্রমণ, আত্মরক্ষা ও বিজিগীষার উৎপত্তি হয়, তেমন জ্ঞানীব্যক্তির অধ্যাত্ম-তরফেই অতি সহজে অনাদর, অপ্রেম, রোষ-বিষ-বিদ্বেষ এমন কি জিঘাংসার উৎপত্তি হইতে পারে। উহা হইতেই মনুষ্য আত্মায় প্রীতি-ভক্তি এবং পূজা-দাক্ষিণ্যের দিব্যগঙ্গা এবং অমৃতরসের মন্দাকিনী ধীরে ধীরে শুকাইয়া আসিতে পারে! পরবিদ্বেষ, পরদ্রোহ, অসহিষ্ণুতা এবং

আত্মম্ভরিতার প্রাবল্য ঘটাইয়া পণ্ডিত-ব্যক্তিকে রুক্ষ চরিত্র, সংসারদ্বেষী, জীবদ্বেষী এবং জীবন-দ্বেষী করিয়াই রাখিয়া যাইতে পারে! অধ্যাত্মক্ষেত্রে হয়ত এ স্থলেই পাণ্ডিত্যের মহাপাতক এবং মহারোগ। অনেক গ্রন্থজীবী পণ্ডিত, Philosopher (দার্শনিক) এবং বিদ্যাব্যবসায়ীর মধ্যে এই অধ্যাত্মরোগের নিদারুণ লক্ষণ এবং উপসর্গসমূহ লক্ষ্য করা যাইবে। ইঁহারা সরস্বতী-মাতার চরণাশ্রয়েই একদিকে উত্তুঙ্গ জ্ঞান-কৌলীন্য এবং পূজ্য-পদবীতে উত্তীর্ণ হইয়াও অন্যদিকে যেন কেবল অর্ধমনুষ্য ব্যতীত আর কিছুই হ'ন না! কেবল বাহ্যিক পাতকই তো পাতক নহে! ইঁহারা সংসর্গী মনুষ্যের হৃদয় এবং চরিত্রকে অধ্যাত্মলোকে পাতিত করিতেই সাহায্য করেন; উহাকে অপ্রেম, আত্মম্ভরিতা এবং বিষাগ্রতাই শিক্ষা দেন! এ-কারণেই হয়ত অনেক শুষ্ক পণ্ডিত এবং দার্শনিক বাহ্যতঃ একেবারে নিষ্পাপকর্মা হইয়াও মানবসমাজে কদাপি অমৃত-পদবী কিংবা মনুষ্যের অধ্যাত্মরাজ্যে রাজ-পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ, স্থল বিশেষে, হয়ত তাঁহাদেরই শিষ্যসেবক কবি ও ভক্ত—তাঁহাদেরই দীক্ষা-প্রাণিত ধর্ম-সাধকগণ উক্ত পদবীতে দাঁড়াইয়া আছেন! মধুসূদনের মধুচরিত্রে—গ্রন্থপাণ্ডিত্যের বিশালতা এবং সংসারের সহস্র দুর্ব্যবহার ও তাঁহার নিজের অসামান্য দুরদৃষ্ট সত্ত্বেও—এই অপ্রেম এবং রুক্ষতা যে শিকড় গাড়িতে পারে নাই, তিনি যে 'নিত্যকাল মধু ছিলেন', এ পুণ্য-লক্ষণটিই আমাদের হৃদয়কে তাঁহার পক্ষপাতী করিয়া রাখিতেছে।

মধুসূদনের সহৃদয়তা ও সাহিত্যচর্যার 'যজ্ঞ'-আদর্শ টুকু না বুঝিলে কবির প্রকৃত অধ্যাত্মমূর্তি বুঝিতে ভুল হইবে। মধুসূদন, বিশেষতঃ কিশোরবয়স্ক যুবক মধুসূদন, নানাদিকে ইয়োরোপীয় টাইটানিক ভাব, self-assertion বা "চণ্ডমুণ্ড'-দলের প্রচণ্ডতা-ধর্মের বাধ্য হইয়াই যে সাহিত্য-ক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াছিলেন, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। এ-কারণে, তিনি কেবল অহমিকা, প্রবল আত্মবিলাস এবং উৎকট যশোলিপ্সা হইতেই সাহিত্য-সেবা করিয়াছেন বলিয়া আপাততঃ ভ্রম জন্মিতে পারে। এক সময়ে আমরাও এই ভ্রান্ত ধারণার বাধ্য

হইয়াছিলাম। কিন্তু, যেমন পূর্বে বলিয়া আসিয়াছি, তিনি পৈতৃক রক্ত-ধর্মেই অন্তরাত্মায় ক্ষাত্ররীতির যজ্ঞবিলাসী এবং দাতা ছিলেন। এ যজ্ঞধর্মেই তিনি বঙ্গসাহিত্যের উন্নতিঅর্থে চিরকাল সুখচিন্তা এবং আত্মাভিমানকে বলি দিয়াছেন; ক্রমে, উক্ত ধর্মই মুখ্য হইয়া মধুর সকল সাহিত্য-চেষ্টাকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে। পরিশেষে তিনি যেন কেবলই বলিয়াছেন,—"চাই, কেবল চাই আমার স্বদেশের সাহিত্য-উন্নতি! আমি যে পর্যন্ত পারিলাম করিয়া গেলাম। প্রাণমনে এই প্রার্থনা আমা' অপেক্ষাও শক্তিধর এবং ভাগ্যবান্ লোক আসিয়া আমার সাহিত্যকে বাড়াইয়া যাউক।" ইংরেজী ছাড়িয়া যখন বাঙ্গালা ধরিয়াছেন, বঙ্গভাষার শক্তি-সামর্থ্যের তরফে নব-উপনয়ন লাভ করিয়াছেন, "মাতৃভাষারূপে খনি পূর্ণ মণিজালে" চিনিয়াছেন, তখন যেমন এই কামনা; যখন সরস্বতী-সেবা পরিহার করিয়া লক্ষ্মীর কৃপা-লক্ষ্যে "জলধি বাঁধিবার" জন্য উদ্যত হইয়াছেন তখনও এই প্রার্থনা—

"এই বর হে বরদে, মাগি তব কাছে,
জ্যোতির্ময় কর বঙ্গ ভারত রতনে।"

আমি না পারিলাম, আমার পর এ বঙ্গদেশে এমন সমস্ত লোকের জন্ম হউক, যাহারা ভারতবর্ষের গৌরবমণি হইয়া আলোক বিকীর্ণ করুক! বঙ্গভাষার অন্তঃসুপ্ত প্রভূত সামর্থ্য এবং উহার মহনীয় সম্ভাব্যতায় আশান্বিত হইয়া আমাদের কয়জন বাণীসাধক এমন দীপ্তভাবে বলিতে পারিয়াছেন—

'নব শশিকলা তুমি ভারত আকাশে,
নব ফুল কাব্যবনে, নব মধুমতী!'

দেশের জন্য কবির এই অহমিকা-বিস্মৃতি তাঁহার কবি চরিত্রের 'মধু' হইয়া উত্তরোত্তর প্রকাশ পাইয়াছে এবং 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে আসিয়া উহাই প্রধান হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই 'মধু' বঙ্গের অন্য কোন কবির মধ্যেই পাইব না। অনেকে এই অহমিকা লইয়া কবিকৃত্য আরম্ভ করেন, তাহা হইতে দীর্ঘ জীবনেও উত্তীর্ণ হইতে পারেন নাই! মধুসূদনের একটি পত্র দেখুন, 'আমার

এই ভবিষ্যদ্বাণী লিখিয়া রাখ, অমিত্রচ্ছন্দ বঙ্গভাষায় মহীয়ান্ হইবে! কালে, আধুনিক ইয়োরোপীয়গণের ন্যায়, আমরা প্রাচীন 'ক্লাসিক' কবিগণকে অতিক্রম করিতে পারি বা না পারি, অন্ততঃ তাঁহাদের সমকক্ষ হইব। আমাদের সাহিত্যে ইদানীং এমন সমস্ত লোকের প্রয়োজন, যাহাদের প্রাণে উন্মাদনা আছে, যাহারা উৎসাহের সহিত তপঃখেদ বরণ করিতে পারে। নিজেদের মধ্যে যদি প্রতিভা না থাকে, আমরা অন্ততঃ ভবিষ্যৎ বংশের জন্য পথ পরিষ্কার করিয়াই যাই। কখনও কি স্যাক্‌ভিলির নাম শুনিয়াছ? ১৫২৭ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার জন্ম হয়। ঐ ব্যক্তির 'গরবোডাক্' নাটকই প্রথমতঃ ইংরাজীতে অমিত্রচ্ছন্দের প্রবর্তন করে—পরকালে শেকৃস্‌পীয়র যে ছন্দকে মহীয়ান্ করিয়াছেন! বাতি জ্বালো—জ্বালো ভাই, নিজে জ্বলিয়া যাও!'

সারস্বত-জীবনের এই নিষ্ঠা-পূত, বিনয়মধুর এবং বিশ্বাস-বরিষ্ঠ আদর্শ! এরূপ সহৃদয়তাও কবিজীবনের একটি স্বতন্ত্র-সিদ্ধি, একটি দুর্লভ সাহিত্য-রস!

স্বদেশের সাহিত্য-সেবিগণের হৃদয়ে মধু-প্রাণ কবির এই দূরদৃষ্ট এবং অসম্পূর্ণ কর্মের অনুশোচনা চিরকাল ধিকি-ধিকি করিয়াই জ্বলিতে থাকিবে। কারণ, যেমন যায় তেমনটি আর হয় না। বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের চারিটি বৎসর মাত্র কাজ! এই চারি বৎসরে একটা ঝড়ের মতই মধুসূদন ট্রাজেডী ও কমেডী, প্রহসন, মহাকাব্য, খণ্ডকাব্য, ওড্, সনেট ও মেলোড্রামা প্রভৃতির অপূর্ব সৃষ্টি করিয়া এ সাহিত্যকে এক নিশ্বাসে প্রথম শ্রেণীর 'আধুনিক সাহিত্য' পদবীতে তুলিয়া ধরিয়াছেন! মধুসূদনের পূর্বে শতবৎসরাবধি ইংরেজী সাহিত্যের সহিত বাঙ্গালী চিত্তের সংশ্রব ঘটিয়া থাকিলেও অপর কেহ যে এ কার্য সমাধা করিতে পারেন নাই, উহাতেই মধু-কবির অতুলনীয় বিশেষত্ব এবং মাহাত্ম্য বুঝিতে পারা যাইতেছে। এই মধু-সংঘটন না হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের বর্তমান উন্নতিও সম্ভবপর হইত কিনা তাহাও চিন্তাস্থল হইয়া আছে। ইয়োরোপীয় সম্পর্কে আসিবার পর ভারতের অপর কোন জাতি যে বাঙ্গালীর ন্যায় আধুনিক সাহিত্য-পন্থায় অগ্রসর হইতে পারে নাই, সে কথার

কোন অর্থ থাকিলে উহার প্রধান কারণ-স্বরূপে মধুকেই নির্দেশ করিতে হয়। ভারতের অনেক জাতি সাহিত্যে আধুনিকতন্ত্র এবং ইউরোপীয়তার মধুপথ হয়ত এখনো খুঁজিয়া পায় নাই। অমিত্রচ্ছন্দটিই ভারতীয় সাহিত্যক্ষেত্রে মধু-প্রতিভার কত বড় আবিষ্কার—বঙ্গসাহিত্যে উহা কত বড় দান তাহা বুঝিতে চাহিলে, এটুকু বুঝিলেই পর্যাপ্ত হয় যে ভারতের বহু প্রাদেশিক-ভাষা এখনও উহার ধ্বনি এবং কায়াপ্রাণের প্রকৃত রহস্যের ঠিক পায় নাই! এখনও বহু সাহিত্যে ছন্দ-ভগীরথের জন্ম হয় নাই! উহাতেই ধারণা হইবে, সে সকল সাহিত্য এখনও আধুনিক বাণী-পন্থা হইতে কত দূরে আছে! এখনও স্বাধীন ভাবুকতার মধুচ্ছন্দা-ভাগীরথী নবজীবন এবং নব-উপনয়ন দানে উহাদের উদ্ধার সাধন করে নাই! তাই, সুযোগ পাইলে মধুসূদন আরও-কত-কি যে করিতে পারিতেন, সেকথা চিন্তা করিতেই মন বিষাদে আক্রান্ত হয়। সৃষ্টিশক্তিশালী ভাবুকতার ওজন করিয়া বলিতে হইলে, মধু অপেক্ষা বৃহৎপ্রাণ ও সৃষ্টিশক্তিমান্ পুরুষ তো এসাহিত্যে জন্মায় নাই! কবির নিজের কথাটির পুনরুক্তি করিয়াই বলিতে বাধ্য হইতেছি—'Alas! born an age too soon'!

(৮)

সাহিত্যের তরফ হইতে মধুসূদনের সাংসারিক জীবনগতির দিকে সম্যক দৃষ্টি করিতে বসিলে আমরা কি পাই? কোন্ লক্ষণ মুখ্যভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে? দুইটি বিষম সাংসারিক ভুল। প্রথম, খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ; দ্বিতীয়, বিলাতে গিয়া ব্যবহারজীবী হইয়া প্রত্যাবর্তন। অন্তরাত্মার ধর্মপিপাসা অপ্রতিবিধেয় হইয়া এবং তাঁহার বলাধান করিয়া যে তাঁহাকে হিন্দুধর্ম পরিত্যাগ করিতে প্রেরণ করে নাই, উহা পরজীবনের দৃষ্টান্ত এবং তাঁহার বন্ধু-বান্ধবের সাক্ষ্য হইতে উজ্জ্বল হইতেছে। সাংসারিক সুবিধা-বুদ্ধি, যাহা অনেক সময়েই ধর্ম-বুদ্ধি এবং কর্তব্য-বুদ্ধি বলিয়া ভ্রান্তি জন্মায়, তাহা হইতেই ধর্মান্তর গ্রহণ যেন তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য হইয়া উঠে! ঐ পরিবর্তনের মূলশক্তি সুতরাং

ধর্ম-সাধনা অথবা পরমার্থ-কামনা নহে—অর্থ-কামনা। আবার ব্যারিষ্টার হওয়ার মূল-শক্তিও অর্থকামনা। উভয় কার্যই যেমন তাঁহাকে হিন্দু-সমাজের ঘনিষ্ঠ সহানুভূতি হইতে বঞ্চিত করিয়াছে, তেমন তাঁহার আর্থিক অভাব বৃদ্ধি করিয়াছে এবং পরিশেষে তাঁহাকে দাতব্য চিকিৎসালয়ের শরণাপন্ন হইতে বাধ্য করিয়াছে; আবার তেমনি, তাঁহার আর্থিক অবস্থাকেও একান্তভাবে কেবল অসহায় আত্মচেষ্টার অধীন করিয়াই রাখিয়া গিয়াছে। অথচ, তাঁহার চরিত্রে অর্থধ্যান, অর্থতপস্যা বা অর্থসাধক-পুরুষকার কখনও প্রবল ছিল না—এ ক্ষেত্রে তাঁহার প্রকৃত স্বাধিকার ছিল না। তিনি অন্তরাত্মার অতিপ্রবল ভাবুক, ভাবসাধক এবং অন্তরাত্মার স্বধর্মেই 'সারস্বত' ছিলেন। এঅবস্থায়, যেমন সকল শ্রেয়ঃকামী সাহিত্যিকের বুঝা উচিত, যেমন মনুষ্য মাত্রের বুঝা উচিত, তেমন মধুসূদনেরও বুঝা উচিত ছিল যে 'স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ'! বস্তুতঃ, প্রত্যেক মানুষের শিক্ষার আদিম এবং প্রধান লক্ষ্য হওয়া উচিত—এই অধিকার বা স্ব-ধর্ম-নিরূপণ। আমি কে? আমি জীবনে কি করিতে পারি? জীবনের শ্রেয়ঃকামী পথিকমাত্রকেই আদিবন্ধে এ-প্রশ্নের মীমাংসাপূর্বক জীবনক্ষেত্রে আপনার অধিকার এবং ব্যবসায় নিরূপণ করিতে হয়। অনেক মনুষ্যের, অনেক শক্তিশালী মনুষ্যের জীবন সংসারে বিকল এবং নিষ্ফল হইবার মূলতত্ত্ব হয়ত এইরূপ অধিকার-নিরূপণের অভাবের মধ্যেই দেখিতে পাইব! ধর্ম-ত্যাগী হইয়াও, পিতার স্নেহবশে তিনি তো একরূপ অপ্রত্যাশিত-ভাবেই পৈতৃক বিত্তের উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন। তাঁহার পক্ষে উচিত কর্ম ছিল—উহার উপর নির্ভর করিয়া, মধ্যবিত্ত ভাবেই সাংসারিক জীবন নিয়মনপূর্বক সারস্বতী-সিদ্ধিকে লক্ষ্য করা। তিনি তাহা করিলেন না—ঐ অর্থ ব্যারিষ্টারী উপার্জনে অপব্যয় করিলেন! আন্তর-ধর্ম এবং ব্যবসায় কর্মের বিরোধ মধুজীবনের উজ্জ্বল অধ্যাত্মলক্ষণ! তাঁহার সকল সাংসারিক ব্যর্থতার মূলতত্ত্বও হয়ত এ-স্থানেই মিলিবে। দুইটি মহাডাকিনী নিত্যকাল মধুসূদনকে দুইদিকে ডাকিয়াছে! প্রচলিত কথায় বলিতে গেলে,

উহাদের নামই লক্ষ্মী এবং সরস্বতী। স্বভাবসিদ্ধ সারস্বতী-প্রকৃতি,—'কবি'-প্রকৃতি ও পৈতৃকী-অর্থবিলাসিতা এবং ঐশ্বর্যলিপ্সা! হায়, মধুজীবনের সকল বিপদুৎপাতের মধ্যে এই Law of heredity, এই পৈতৃক পাপ, পাপের উত্তরাধিকার এবং উহার প্রায়শ্চিত্ত-ফল এত প্রবল এবং পরিস্ফুট যে, এমিলী জোলার কোনো নবেলী নায়ক-নায়িকার মধ্যেও বোধ করি এতটা পরিস্ফুট হইতেছে না! নব্যবঙ্গের প্রথম কবি পিতৃপুরুষীয় পাপের জন্যই প্রায়শ্চিত্ত করিয়া গিয়াছেন। 'মানুষ'-মধুসূদন পৈতৃক পাপে অহর্নিশি পুড়িয়াছে; 'কবি'-মধুসূদন সকল জ্বালাপোড়ার মধ্যেও আপনার সুবর্ণধর্ম অক্ষুণ্ণ রাখিয়া বঙ্গসাহিত্যের 'অমর'-লোকে উহাকে উত্তীর্ণ করিয়া গিয়াছে। একজনের মধ্যেই দুইটি ব্যক্তি! যে-পর্যন্ত এ-দুটি ব্যক্তি একযোগে, একান্তঃকরণে কার্য করিয়াছে, সে-পর্যন্তই মধুসূদন কবি—সে-সহযোগিতার মধ্যেই কবি মধুসূদনের জীবন-শক্তি এবং শক্তি-প্রয়োগের সাফল্য! মধুসূদনের জীবনতলে অর্থ-দুরাকাঙ্ক্ষা প্রবলতা এবং প্রকট আধিপত্য লাভ করার পর হইতেই কবির বিক্ষিপ্ত-চিত্ততা, উৎকেন্দ্র-গতি এবং অধ্যাত্ম-মৃত্যুর সূচনা! এরূপে সাংসারিক-মধুসূদনের মৃত্যুঘটনার বহু পূর্বেই 'কবি'-মধুসূদনের মৃত্যু ঘটিয়াছিল।

বঙ্গের অহমিকাধর্মী কবিগণের মধ্যে মধুসূদন অন্যতম, ইহা পূর্বে সঙ্কেত করিয়া আসিয়াছি। মনুষ্যের পক্ষে যে অহংকার একেবারে পরিত্যাগ করা কত কঠিন, তাহা দার্শনিকতার তরফ হইতে সকলেই বুঝিয়া উঠিতে পারেন এবং কবিগণের অহঙ্কারটিও সদয়ভাবে সহ্য করিতে পারেন। এক্ষেত্রে একেবারে ক্ষমার দাবী তো চলে না—সদয় বিচার। জীবনে পরম মধুরতা এবং লালিত্য-কর্ষণার সতর্কসাধক কবিগণের অন্তঃপুরেই কি করিয়া অবিনয় এবং বর্বরতার এ-প্রকার একটি 'আগাছা' দৃষ্টি এড়াইয়া থাকিয়া যাইতে পারে? কাব্যের সকল পুণ্যরস নষ্ট করিয়া উহার সত্যমূল্য এবং গৌরবের হানি করিতে পারে, এমনকি, ভক্তপাঠকের মনের আস্থা হ্রাস করিয়া উহাতে একেবারে বিদ্রোহ এবং ঘৃণার বিষ সঞ্চারিত করিয়া দিতে পারে, এমন শত্রু-পদার্থ তো জগতে

আর নাই! এ-সকল রসিকব্যক্তি এমন বেরসিক এবং রসবিদ্রোহী কি করিয়া হইতে পারেন? এই দুর্বলতাটুকুর প্রতি হৃদয়বান্ ব্যক্তিরই দয়া হওয়া উচিত। আমাদের সাংখ্যদর্শনের মতে অহংকার ব্যতীত নাকি সৃষ্টি-ই হইতে পারে না! সাহিত্যে কাব্যের সৃষ্টি এবং প্রকাশের মূলেও হয়ত ঐ অহংকার পদার্থটি নানাদিকে এবং অনেকের বেলাতেই অপরিহার্য! এইদিকে, অনেক কবির মধ্যে হয়ত একেবারে মদমত্ততাই প্রধান শক্তি! উহা এ-ক্ষেত্রে 'the last infirmity of noble minds!' কিন্তু, মধুসূদনের অহংকারে—বোধ করি তাঁহার পরিণাম জানি বলিয়া—যেন চোখে জল আসে! নবীন-চন্দ্রের অহংকারে—উহা এত সরল এবং মোটা যে—হাসি পায়। আর রবীন্দ্রনাথের অহংকার তাঁহার অনেক রচনার ভাঁজে-ভাঁজে, তাঁহার কথার মুন্শীয়ানার সুরভঙ্গীর পরতে-পরতে যেন বৃশ্চিকলোমে কণ্টকিত করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া স্পর্শমাত্রই সচেতন পাঠকের অধ্যাত্মদেহে বেদনা জন্মাইতে থাকে! বলিতে কি, এ-সমস্ত পাঠকের ঘোর অধ্যাত্মশত্রু; এবং এ-স্থলেই হয়ত মনুষ্য-রসনায় তাঁহাদের কবিত্বের অমৃতমধ্যে একটুকু কটুতা আছে। ইহার মধ্যে হয়ত একটি ঔৎকেন্দ্রিক-রুক্ষতা আছে—একটা সৌজন্য-মিষ্টতা এবং লালিত্যেরও অভাব আছে, যাহা হেয় না হইয়া পারে না। অনেকের সঙ্গে সামাজিক মিলন এবং আলাপ-ব্যবহারের সময়েও হয়ত এই অহংকারটি সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত স্থলে অকস্মাৎ 'দাঁড়া তুলিয়া' কামড় দিতে আসে! কোন কোন কবি একদিকে যেমন ভক্তগণের প্রণতি-পুষ্পাঞ্জলি লাভ করিয়া থাকেন, অন্যদিকে বিপক্ষগণ হইতে তেমন হাসি-ঠাট্টা-টিট্কারী এবং মস্করাও যে বহন করেন, উহার অধিকাংশ যে এই অহমিকা বা দম্ভের প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিপ্রসবস্বরূপেই সামাজিকের চিত্তে উৎপন্ন হইয়া থাকে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। তাঁহাদের পুরস্কার এবং তিরস্কার উভয়ই অসাধারণ! সরস্বতীর অন্য কোন বিভাগের সেবকের অদৃষ্টে উহার বিংশতিতম অংশও ঘটে না। এ-সকল অসাধারণ ব্যক্তির হস্তে অনেক সময় যেন সাধারণ শিষ্টাচারটুকুই

প্রত্যাশা করা চলে না! কেবল নির্বিকল্প ভক্তিমান্ এবং পূজারী হইয়া উপস্থিত হইতে পারিলেই বুঝি এই বেদনার কিঞ্চিৎ উপশম আশা করা যায়। কিন্তু উপায়ান্তর আছে কি? এরূপ বেদনা এবং শত্রুতার দিকে কোমর বাঁধিয়াই তো তাঁহাদের সঙ্গ করিতে হইবে! আর মনে রাখিতে হইবে, ভারতীয় সাহিত্যে নানাদিকে অভিনব এই অহং-বাদ, আধুনিক কবিতার এই 'আসুর'-ধর্ম, এই টাইটানিক-আদর্শ! ইহার প্রধান ভিত্তিটাই বহুস্থলে যেন অভিমান! ইহাদের 'মধু' উপভোগ করিতে হইলে, সুতরাং 'হুল'-টুকুও সহিয়া লইতে হইবে। এসকল মহানুভব ব্যক্তিকে স্বদোষ বিষয়ে একেবারে অচেতন বলাও তো চলে না। অকপট মধুস্দন অনুতাপ করিয়াছেন, 'মাৎসর্য্য বিষদশন কামড়য়ে অনুক্ষণ'; রবীন্দ্রনাথও যেন চীৎকার করিয়াই উঠিয়াছেন,— 'আমার মাথা নত করে দাও হে তোমার

চরণ-ধূলার তলে।

সকল অহংকার হে আমার

ডুবাও চোখের জলে॥'

দেখা যাইবে, জানিয়া বুঝিয়াও স্বদোষক্ষেত্রে তাঁহাদের হাত নাই। দেখিবেন ভগবৎ প্রার্থনার মধ্যে, চোখের জলের পশ্চাতে উক্ত অভিমানটাই যেন ফিরিয়া উঁকি দিতেছে! উহা যেন ভক্তির অশ্রু নহে—আহত অভিমানের বিদাহ-জনিত অশ্রু! অভিমান তো ছাড়ে না! এই অভিমান এবং সংসারের বিভিন্ন রুচি মনুষ্যের বিরুদ্ধতা ও বিপক্ষতা হইতেই সুতীব্র 'অপমান'-বুদ্ধি এবং 'অবজ্ঞা'র জ্বালা অনেককে ভগবৎ সান্নিধ্যেও যেন শান্তিলাভ করিতে দেয় না! ফিরিয়া-ফিরিয়া, মর্মশূল জাগাইয়া রাখিয়া নীচের দিকেই টানিতে থাকে! কবি-কৃত্যের মধ্যে, কবির ব্যবসায়ের মধ্যে হয়ত এ স্থলেই প্রধান অধ্যাত্ম-সঙ্কট! কবি এবং ঋষির মধ্যে এস্থলেই যেন বিজাতীয়তার দুরতিক্রম্য ব্যবধান। এই চেতঃ-খিল ছড়াইতে পারিলেই হয়ত কবিগণ ঋষিত্ব লাভ করেন।

যাহোক, আমরা যাহাকে 'অহংকার' বলিয়া আসিয়াছি, আধুনিক সভ্যতার

ক্ষেত্রে, উহারই ভদ্রজনোচিত আধুনিক পরিভাষা—আত্মাদর। এই অহংকার প্রকুপিত হইলে মনুষ্যকে বিনাশ করে সত্য, কিন্তু সাম্য অবস্থায় সংসার পথে তাহাকে নানা মতে রক্ষাও করিয়া থাকে।

বলিতে পারি, উক্ত অহংকারটুকুই সংসারবর্ত্মে দরিদ্র মধুসূদনের প্রধান বল ছিল এবং উহাকে হারাইয়াই তাঁহার অধঃপতন। তিনি বাণীপুত্র, বাণী-পুত্রগণকে ঈর্ষা করিয়া আপনার কৌলীন্য-লাঘবরূপ সেই যে মহাপাতক তিনি করিলেন, সমস্ত পরজীবনে তিনি উহার জন্য শাস্তি ভোগ করিয়াছিলেন বলিলেই যেন তত্ত্বকথা বলা হয়। মধুজীবনের মধ্যে অন্য সমস্তই লঘু পাপ, কেবল ইহাই অতিপাতক বলিয়া আমরা মনে করি। লক্ষ্মীর পুত্রগণকে ঈর্ষা! তাঁহার সকল দুঃখ-দুর্দশা এবং একদা কবিত্বশক্তির একেবারে বিলোপ উক্ত অতিপাতকের উত্তর-ফল! তিনি যতকাল অনুবাদক (Translator) ছিলেন, তাঁহার অভাব কম ছিল। যেমন বলিয়া আসিয়াছি, সাহিত্যসেবীমাত্রকে আদৌ সাংসারিক অভাববোধ হ্রাস করিতে হয়—উহাকে সারস্বত-জীবনের প্রধান 'স্বতঃসিদ্ধ' বলিয়া ধরিতে হয়। অভাব অধিকন্তু অভাববোধ অল্প ছিল বলিয়াই তিনি অপেক্ষাকৃত নির্দ্বন্দ্ব এবং নিষ্কলুষ মনোজীবন যাপন পূর্বক 'কবি মধুসূদন' হইতে পারিয়াছিলেন; তিনি মানসসরোবরের বাণীচরণ-বিলাসিনী ভাবুকতার শুক্লপদ্ম চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন! উক্ত পাতকের পরেই যেন সরস্বতী-মাতা প্রিয়পুত্রের নিকট হইতে পরমদুঃখে চিরবিদায় গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন! তাঁহার অবশিষ্ট জীবনের সারস্বত-ফল চিন্তা করিলে এ-সত্য হৃদয়ঙ্গম হইবে। ধনীদরিদ্র-ভেদ মনুষ্যমনের অভাববোধের মধ্যেই নহে কি? এক্ষেত্রে যে ব্যক্তি নিজেকে দরিদ্র বলিয়া মনে করে তাহার মত দরিদ্র যে কেহ নাই! বাণীপুত্র মধুসূদন নিজের চিত্তে লঘু এবং দরিদ্র হইয়া পড়াতেই তাঁহার পাতিত্য ঘটিয়াছিল। বিলাতগমনের পর হইতে মধুসূদনের সাহিত্য-প্রতিভা কাহিল হইয়া, নব-নব ক্ষেত্রে ঋদ্ধি এবং বৃদ্ধি-লাভে অশক্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। 'সুভদ্রাহরণ' ও 'সিংহলবিজয়' প্রভৃতি কাব্যের যে পরিমাণ খসড়া আমাদের হস্তগত

হইয়াছে, তাহাতেই বুঝিতে পারি যে উহাদের সঙ্কলিত রচনা কেন অগ্রসর হইতে পারে নাই। 'মেঘনাদবধ' এবং 'বীরাঙ্গনা'র পর মধুসূদন ভাবুকতার কোন প্রৌঢ়তর ক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে পারেন নাই; হয়ত, স্বভাবধর্মে তাঁহার ক্ষমতার লাঘব বিশেষতঃ লাঘববোধ হইতেই উহাদের রচনা ব্যাহত এবং পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু, অনেক স্থলে ভাবচর্যা এবং ঐকান্তিক ধ্যানযোগের অভাব হইতেই কবি-প্রতিভা নব-নব উন্মেষের ক্ষেত্রে দুর্বল এবং অসমর্থ হইয়া দাঁড়ায়। আমরা দেখিতে পাইব, ঐরূপেও লক্ষ্মীর একান্ত সেবা হইতে হেমচন্দ্রও একদিন সারস্বত-ঋদ্ধি হারাইয়া, বাহ্যিক অন্ধতা অপেক্ষাও ঘোরতর আধ্যাত্মিক অন্ধতার মধ্যে ন্যূনাধিক ষোড়শবর্ষকাল জীবনযাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ন্যূনাধিক ঐকান্তিকতা হইতেই বরং নবীনচন্দ্রের কাব্যপ্রতিভা কিঞ্চিৎ অধিককাল বর্তিয়াছিল এবং রবীন্দ্রনাথও এখন যাবৎ—'পলাতকা'র সময় পর্যন্ত—নিজের পথে, গীতি-কাব্যতার ক্ষেত্রে নব-নব উপার্জন করিয়া চলিতে পারিতেছেন। প্রতিভা একেবারে বিলুপ্ত হইতে পারে; এবং জন্মসিদ্ধ কবিগণও সরস্বতীর কৃপা হারাইয়া একদা হৃতসর্ব্বস্ব এবং ভিখারী হইয়া পড়িতে পারেন। সরস্বতীর পথও 'ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া'। নিয়তভাবে জাগ্রৎ-চৈতন্যময় এবং অতন্দ্রিত থাকিয়াই যে এপথে চলিতে হয়।

এই মধুসূদনের মধ্যে একটি বালক আছে। তাঁহার নিজেরই অপরিচিত, সুধামত্ত বালক। তাঁহার জীবনের মধ্যে বালকটিকে দেখিতেছি, তাঁহার কবিতার মধ্যেও সে-বালকটিকে শুনিতেছি! তাঁহার অপরিসীম দানবিলাসিতার মধ্যে সেই বালক। যেমন অর্থদান, তেমনি হৃদয়দান। জীবনের সর্ব অবস্থায়, সকল সুখ-দুঃখের মধ্যে, সকল গোঁয়াতু মির মধ্যে আনন্দ-নর্তনশীল সেই বালক। জগৎ-বৃন্দাবনের জীবহৃদয়বিহারী, বংশীধারী সেই বালক। ভোলানাথের কৃতপুত্র, সুপথে-অপথে নির্বিচারে বিচরণশীল অথচ উদাসীন প্রমথ-বালক। এক্ষেত্রে হেমচন্দ্র গভীর অন্তর্দৃষ্টি সহকারে মধুসূদনের প্রবল চরিত্র-তত্ত্ব দর্শন করিয়াছিলেন—

'গেলে চলে মধু কাঁদায়ে অকালে
পাইয়া বহুল ক্লেশ।
ক্ষিপ্তগ্রহ প্রায় ধরায় আসিয়া
কাঁদিয়া হইলে শেষ।
ছিলে উদাসীন, গেলে উদাসীন
জয়মাল্য শিরে পরি'।

শিল্পী মধুসূদনের অনেক দোষ আছে—'তিলোত্তমাসম্ভব' এবং 'মেঘনাদ-বধে'ই অনেক শিল্পাপরাধ আছে। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরাও হয়ত ঐ সমস্ত চিনিয়া লইতে পারে। আমরা সে সমস্ত লইয়া মাথা ঘামাইব না। কিন্তু ঐ বালকটিকে চিনিয়া উঠিতে পারেন কয়জন? মেঘনাদে যে যে স্থানে বালকটির কণ্ঠস্বর ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা অনির্বচনীয়ভাবেই মধুর—সম্যক্ দেখা এবং বোঝারও বহির্ভূত। আমাদের নিজের হৃদয়কন্দরবাসী অনির্বচনীয় নিত্য-বালকটিই উহা চিনিয়া উঠিতে পারে। এস্থানেই মধুসূদনের প্রকৃত কবিত্ব—অননুকরণীয়, অমর কবিত্ব! ইহাও সত্য যে, সংসার ঐ বালকটিকে জাঁতায় ফেলিয়া পিষিয়া মারিতে চাহিয়াছিল—পারে নাই।

কবি কে! যিনি চিন্তা করেন বুদ্ধির ভাষায়, প্রকাশ করেন হৃদয়ের ভাষায়। যিনি দ্বিভাষী। যাঁহার কথা শোনামাত্র আমরা একপদে দুটি ভাষাই বুঝিতে পারি। যিনি যাদুকর—এক বলিতে ঐরূপে দুটি কথা বলিবার যাদুবিদ্যা যাঁহার আছে। আমাদের এই বালক, নিজের স্বীকারেই দার্শনিক নহে। মানবহৃদয়ের সূক্ষ্মতর সৌন্দর্যে এবং তত্ত্বপদার্থে কোনরূপ সূক্ষ্মদৃষ্টি, সূক্ষ্মবুদ্ধি এবং সূক্ষ্ম-অনুভূতি ইহার নাই বলিলেই চলে! এই বালক বন্ধুকে লিখিয়াছিল 'I hate philosophy.' তাহার দৃষ্টি বৃহতের দিকে এবং মহৎভাব-পদার্থের বিকাশেই নিবদ্ধ। কিন্তু তাহার হৃদয় যেমন আপনার ভাবগতির সঙ্গে সঙ্গে পরমানন্দে ছন্দ রাখিয়াই চলে, যেমন তাহার ছন্দ এবং ভাষাও ঐ আনন্দচ্ছন্দে মত্ত হইয়া এবং উহার তালে-তালে পা ফেলিয়াই চলিতে

পারে, তেমন আনন্দকে পরের হৃদয়ে তড়িৎপ্রবাহে সংক্রামিত করিয়াই চলিতে পারে। আনন্দমূর্তি বালককে দেখামাত্র সমপ্রাণতার অবিতর্কিত সাধর্ম্যেই আনন্দিত না হইয়া কে থাকিতে পারেন! উহার দিকে সপ্রেম দৃষ্টি না করিয়া এবং স্বয়ং বালকভাবেই আবিষ্ট না হইয়া থাকিতে পারেন এমন পাষাণহৃদয় সাহিত্য-পথিক কে? মধু-কবিতার এই স্বতঃসিদ্ধ আনন্দমত্ততা এবং অনির্বচনীয় সংক্রামনী-শক্তির মধ্যেই উহার প্রকৃত কবিত্ব। মধু যেমন ক্ষুদ্র কবিতার কবি নহেন তেমন তাঁহার কবিতার অল্পপদ-পংক্তিতে অর্থ-ধারণার শক্তিও খুব জবরদস্ত নহে এই বালক কোনপ্রকারে আত্মচিন্তক অথবা তত্বচিন্তক না হইয়াও, কেবল ভাবুকতা ও ভাবানন্দের সৌভাগ্য এবং ভাবের সংযোগিনী-শক্তির বলেই কবি—চিরকালের সম্ভজনীয় কবি। তাহার শিল্প-বুদ্ধি এবং শিল্পশক্তি সর্বত্র ন্যূনাধিক অবিকল থাকিতে পারিয়াছে।

সাহিত্য রসিককে সর্বাগ্রে সাহিত্যের ধারা পরিচয় করিতে হয়। ঐতিহাসিকের নেত্রে সাহিত্যে ভাবের নূতন ধারা, নবজীবন, নব আবিষ্কার, এসকল মুখ্য কথা। মধু যেমন কাব্যে, নাটকে ও প্রহসন প্রভৃতিতে, উহাদের ছন্দ এবং আকৃতি-প্রকৃতির আদর্শে বঙ্গে নবযুগের প্রবর্তন করিয়াছেন; তেমন, মধু-প্রবর্তিত খণ্ড-কবিতা এবং গীতি-কবিতার যুগও যে এখন যাবৎ বঙ্গে চলিতেছে, উহা তাঁহার সনেটগুলি দৃষ্টেই ধারণা হইবে। আধুনিক গীতি-কবিতা নানা ছন্দে কেবল সনেটেরই ভাবগত অথবা বস্তুগত বিকাশ। মধু-সূদনের 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'র শ্রেষ্ঠ সনেটগুলির মধ্যে যে ভাবুকতা ও চিন্তাশক্তির দেখা পাই, যে সুস্থির ধৃতি এবং নিসর্গ ও মনুষ্য প্রকৃতির দিকে যে অবিক্লবা সহানুভূতি ও অবিকারী মস্তিষ্কের পরিচয় পাই, উহাদিগকে বঙ্গীয় কাব্য-সাহিত্যে মহার্ঘ ও দুর্লভ পদার্থ বলিয়াও উল্লেখ করিতে পারি। ঐ সমস্ত কবিতার মধ্যে কুত্রাপি ভাবোন্মত্ততা বা একদেশদর্শী আবিষ্টতা নাই। সাহিত্যের প্রাচীন মহাকবিগণের ভাবুকতার মধ্যে, তাঁহাদের দৃষ্টি এবং বাক্য-প্রণালীর মধ্যে যে একটা বৃহৎ সামর্থ্য এবং সংযমের লক্ষণ আমাদের

হৃদয় প্রত্যক্ষ করে, তাহা এ সাহিত্যে মধুসূদনেই সর্বপ্রথম পরিদৃষ্ট হইয়াছে। উহা মধুসূদনকে যেমন 'তিলোত্তমাসম্ভবে', তেমন 'মেঘনাদ', 'বীরাঙ্গনা', এবং 'ব্রজাঙ্গনা'তেও তাঁহাকে সর্বপ্রকার বিশেষ পথ-পক্ষপাতী ভাবোন্মত্ততা হইতে রক্ষা করিয়াছে। হেমচন্দ্রই মধুসূদনের এই আন্তর-ধর্মের প্রকৃত সহানুভূতিশীল উত্তরাধিকারী এমন কি অনুকারী ছিলেন। হেমচন্দ্র যে সময় সময় সংযম-ক্ষেত্রেই বরং অতিরিক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন তাহাই আমাদিগকে দেখিতে এবং বুঝিতে হয়। ভাবুকতার সংযমশীল পৌরুষ এবং বীরধর্মী সৌন্দর্য-দৃষ্টিই মধুসূদনের শিল্পী-আত্মার প্রধান লক্ষণ। নবীনচন্দ্রের কাব্যে এবং রবীন্দ্রনাথের গীতিকবিতা ও সঙ্গীতে আসিয়া এই ভাবুকতা যে কোন কোন দিকে বিহ্বলতা, বিক্ষিপ্ততা এবং অতিরিক্ততা অবলম্বন করিয়াছে, হয়ত উক্ত পথেই স্থানে স্থানে গভীরতর বারি-বিহারী হইয়া আমাদের সহানুভূতির দাবী করিতেছে, তাহাও আমাদিগকে বুঝিয়া লইতে হইবে। এই শিল্পতার দিকে দৃষ্টি করিলে মধুসূদন ও হেমচন্দ্র যেমন বিলাতী 'ক্লাসিক' আদর্শের কবি, তেমনি নবীনচন্দ্র এবং রবীন্দ্রনাথও 'রোমাণ্টিক' আদর্শের কবি বলিয়াই সংস্কার উদ্রেক করিতে থাকিবেন। 'চতুর্দশপদী'র 'বঙ্গভাষা,' 'কমলে কামিনী,' 'অন্নপূর্ণার ঝাঁপি,' 'কালিদাস,' 'কৃত্তিবাস,' 'পরিচয়-১।২,' 'কবি', 'শ্রীপঞ্চমী', 'কবিতা', 'আশ্বিনমাস', 'সায়ংকাল', 'সায়ংকালের তারা,' 'নিশাকালে নদীতীরে', 'বটবৃক্ষতলে শিবমন্দির', 'বিজয়াদশমী', 'পৃথিবী', 'আমরা', 'মিত্রাক্ষর', 'শনি,' 'সমাপ্তি' প্রভৃতি পাঠ করুন। বঙ্গদেশের মধুসূদন বিশ্বসাহিত্যের রঙ্গভূমিতে পূর্ণচেতন শিল্পবুদ্ধি এবং হৃদয় লইয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন; সুতরাং ইয়োরোপীয় সাহিত্যের পূর্বসূরীগণের বিশেষ বিশেষ মাহাত্ম্যে তিনি যেমন জাগ্রত আছেন, তেমন ভারতবর্ষের বা বঙ্গদেশের সমাজ-সাহিত্য-নিসর্গের কোন সৌন্দর্যে অথবা মাহাত্ম্যেই তাঁহার হৃদয়দ্বার কোনদিকে অর্গলিত নহে! কবি প্রত্যেকের উপস্থিত বিশেষত্বই সৌন্দর্য-মুগ্ধনেত্রে দর্শনপূর্বক সুনিপুণ শিল্পসাধকের প্রণালীতে বিভাবিত করিতেছেন! সকল কার্য চূড়ান্তরূপে সমাহিত বা সুষমাময় হইয়াছে কি না, সে বিচার করিব না। কিন্তু শমতা,

সমপ্রাণতা এবং সহানুভূতি! যাহা হেমচন্দ্র-নবীনচন্দ্রে বা পরকালের কোন কবিতে সুলভ নহে, তাহাই যেন মধুর মধ্যে আসিয়া গিয়াছে! পরকালের গীতি-কবিতা হয়ত মধু হইতে কোন-কোনদিকে অগ্রগামী এবং সূক্ষ্মতর দেশগামী হইয়া গিয়াছে। কিন্তু কবি-আত্মার ঐ সৌন্দর্যবিহ্বল আনন্দের সুসংযত এবং সমশীর্ষ প্রকাশ—যাহা মধুসূদনে পাই তাহা যে অন্যত্র দুর্লভ! বঙ্গের অন্তরঙ্গে যে রাধা-আনন্দ আছে, যাহার দরুণ প্রথমেই কানুসঙ্গীতের উষাকীর্তন পূর্বক বঙ্গভারতী জাগিয়া উঠিয়াছিলেন, এই খ্রীষ্টান্-কবির চিত্ত তাহাও যেন অতর্কিতে ধরিয়া ফেলিয়াছে! কোনদিকে অতিরিক্ততা না করিয়া শান্তসুন্দর স্নিগ্ধ এবং সংযত ভাবেই ধরিয়াছে। মধু কবির এই সুসংযত ভাব চেতনা, এই সেন্টিমেণ্টাল না হইয়াই সৌন্দর্য-ধারণা—ইহাকে একেবারে অনন্যসাধারণ বলিতে পারি। এইরূপ সংযম গুণেই কাব্যসাহিত্যে সাংসারিক লোকের দৃষ্টিতে, নীতিধর্মের সাধকগণের দৃষ্টিতে যুবক-হৃদয়ের পক্ষে 'কুসঙ্গী' বিবেচিত না হইয়া পারে। এই সংযত এবং বলিষ্ঠ চিত্ত, দ্রঢ়িষ্ঠ স্নায়ুতন্ত্র—যাহা সৌন্দর্যমুগ্ধ অথচ আবেশধর্মে কুত্রাপি আত্মবিস্মৃত নহে! মধুশিল্পীর এই শক্তি-সিদ্ধি, সবল শাক্ত-আদর্শ, এই অপ্রমত্ত ভাব-শক্তি, এই সমশীর্ষতা—এই level headedness! এ সমস্ত বঙ্গীয় কাব্য-জগতে এখনো মধুসূদনের বিজয়ী বিশেষত্ব বলিয়া নির্দেশ করা যায়। এই শিল্পি-বিশেষত্বের নিরূপণ সূত্রেই আমরা অন্যত্র বলিয়াছিলাম—মধুসূদন শাক্ত, হেমচন্দ্র শৈব এবং নবীনচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ বৈষ্ণব।

শিল্পক্ষেত্রে এই সমশীর্ষতা এবং চিত্ত-প্রসারের দরুণই হয়ত শিল্পী মধুসূদনের কাব্যাদিতে স্বাজাত্য এবং স্বাদেশিকতার কোনরূপ গোঁড়ামিলক্ষণ বলীয়ান্ হইতে জানে নাই। ইহা নিশ্চিত যে যে রাষ্ট্রীয় অধীনতা এবং উহার উৎপীড়নার জ্ঞান হইতে উত্তরকালে হেম, নবীন ও বঙ্কিমের মধ্যে শিল্পক্ষেত্রেই স্বাজাত্য বা ন্যাশন্যালিজমের লক্ষণ প্রবল হইতে পারিয়াছে, উহা ইংরেজ রাজত্বের ও বঙ্গে বিলাতী প্রভাবের সেযুগে তখনো সবিশেষ চৈতন্য অথবা প্রাবল্য লাভ করিতে পারে নাই। প্রবল হইলে পাশ্চাত্ত্যকর্ষণায় শ্রদ্ধাশীল এবং খ্রীষ্টধর্মস্বীকারী কবির

মধ্যে উহা কোন্ মূর্তি অবলম্বন করিত, তাহাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু মধুসূদন যে নিদানতঃ কেবল 'কবি মধুসূদন' ছিলেন, তিনি সাহিত্যের তপোবনে নিজেকে যে নিবিড় অসঙ্গতায় স্থির রাখিতেই সমাহিত ছিলেন, নিজেকে যে তিনি কেবল সর্বমানবিক ভাবুকতার সাম্যক্ষেত্রে 'কবি'রূপে প্রতিষ্ঠিত করিতেই লক্ষ্য করিতেন, তাহা চিন্তা না করিয়াও গত্যন্তর নাই।

মনের উদ্ভাবনী শক্তি এবং হৃদয়ের সৌজন্য-সহানুভূতিময় প্রসার বিষয়ে ইহাপেক্ষা বড় প্রতিভা এ-যাবৎ বাঙ্গালীর সাহিত্যে দেখা দেয় নাই। বিধাতা যুবক-সেক্‌স্‌পীয়র ও মিল্‌টন্‌-প্রকৃতির প্রতিভাকেই যেন এক-যুক্ত করিয়া পাঠাইয়াছিলেন! উহার মধ্যে মিল্‌টনের বীর্যবত্তা এবং কণ্ঠসমুন্নতির সঙ্গে সঙ্গে যুবক-সেক্‌স্‌পীয়রের বহুমুখিতা, পৌরুষ-তেজস্বী হৃদয়াবেগ, উদার সহানুভূতি এবং অমায়িক রসিকতার আভাসটিই নানাদিকে পাইতেছি! তবে এ সমস্ত সদ্‌গুণ-বীজ উচিতমত বিকাশ লাভ করিতে পারে নাই। এলিজাবেথ-যুগের কবিগণের ন্যায় নাট্যক্ষেত্রেই উড়িবার মতন কবিত্বের পাখা মধুসূদনের ছিল—কেবল বঙ্গ-সমাজ এবং বাঙ্গালার সাহিত্য-আকাশে তখনও সেরূপ পাখা লইয়া উড়িবার মত অবকাশ ছিল না। একটু পাখা মেলিতে এবং নড়িতে-চড়িতে পারিলেই তাঁহার মধ্যে সেক্‌স্‌পীয়রের তীক্ষ্ণচরিত্র সৃষ্টি, ভাবুকতার বিদ্যুৎবৃত্তি এবং পরিপূর্ণ গঠনশক্তি ছিল কিনা পরীক্ষা হইতে পারিত! মধুসূদনের নাটকীয় রীতির প্রধান পরিচয়—অবলম্বিত বিষয়বস্তুতে তাঁহার সহানুভূতি, অমায়িক হৃদয়যোগ—অবিকৃত এবং নিরভিমান সহযোগ। নবীনচন্দ্র বা রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি, তাঁহাদের বিষয়বস্তু যতই প্রাচীন বা দূরবর্তী অথবা বিভিন্নক্ষেত্রী হউক না কেন—কখনও যেন ভুলিতে পারেন না যে তাঁহারা ঊনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী, আপন উদ্দেশ্যতন্ত্রী কবি বা দার্শনিক। তাঁহাদের নাটকীয় চেষ্টাতেই, তাঁহাদের চাল-চরিত্রে, কথাবার্তায়, ইঙ্গিতে-ভঙ্গীতে স্ব স্ব ভাবুকতার বিশিষ্ট অভিমান ফুটিয়া-ফুটিয়া পড়িতেছে! কিন্তু মধুসূদনের নাটকীয় সহানুভূতি এত প্রবল ছিল যে, 'ব্রজাঙ্গনা'য় বা 'বীরাঙ্গনা'য় তিনি যে 'বহুরূপী খেলা' খেলিয়াছেন উহাতে অমিত্রছন্দের 'মধুসূদনী-গন্ধ' টুকুন ব্যতীত শিল্পীর

অপর কোন ব্যক্তিত্ব-পরিচিহ্ন স্পর্শ করিতে পারে নাই। বলিতে হয় যে, মধুসূদন তাঁহার প্রতিভার যে জাতি এবং কৌলীন্য দেখাইয়া গিয়াছেন, এ পর্যন্ত বাঙ্গালার অন্য কোন কবি উহার 'মেল' অথবা সাদৃশ্য দেখাইতে পারেন নাই। তিনি শিল্পের যে ঋজু-মধুর ভাবুকতার পথ, স্বাভাবিকতার যে মধুপথ দেখাইয়া গিয়াছেন, উহার প্রকৃত কোন উত্তরাধিকারী কিংবা স্বাধীন বৃদ্ধিকারী এ পর্যন্ত বঙ্গদেশে জন্মে নাই। দুঃখকে এত ঘনিষ্ঠভাবে বুঝিয়া ট্রাজেডী রচনা করার স্বাভাবিক যোগ্যতা, অনম্য-মেরুদণ্ডী বীর-জীবনের নিদারুণ অদৃষ্ট-নিয়ন্ত্রণা এবং মৃত্যুবিজয়ী বিনিপাত অঙ্কিত করিবার এমন শিল্পক্ষমতা অপর কোন বঙ্গকবিই লাভ করিতে পারেন নাই। প্রথম জীবনে যখন মনোবৃত্তি-সমূহের আগ্রহ সতেজ থাকে, অন্তরাত্মার গ্রাহিকা-শক্তি ও পরিপাকের ক্ষমতা যখন তীব্র ও সচেতন থাকে, তখন যদি কবির অদৃষ্ট-দেবতা একবার তাঁহাকে সত্যজীবনের সর্বরসের সদাব্রতে স্বয়ং-কর্তা অথবা ভোক্তা হইবার অবসর দেন, জীবনের সত্য-অনুভূতির বিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং অভিজ্ঞতার পথেই তিনি যদি অন্তরাত্মার সর্বতোমুখিতা উপার্জন করিতে পারেন, তাহা হইলে কবিত্বের ক্ষেত্রে তদপেক্ষা সৌভাগ্যযোগ আর নাই! স্বয়ং জলিতে-পুড়িতে হইলেও কবির পক্ষে উহাই সৌভাগ্য। মধু-জীবনের দিকে দৃষ্টি করিয়া দেখিতেছি, জীবনদেবতা তাঁহাকে 'সত্য'-শিক্ষার সে মাহেন্দ্রযোগ দিয়াছিলেন; হৃদয়রক্তের বিনিময়েই তিনি 'কবি' হইবার যোগ্যতা-পাশ উপার্জন করিয়াছিলেন! তাঁহার সত্য-বুদ্ধি এবং হৃদয়ের প্রসার, সর্ববিধ অবস্থা অথবা ঘটনায় নিপতিত মনুষ্যের সহিত সংহানুভূতি করিবার শক্তি এবং সৃজনী-শক্তিও সামান্য ছিল না; ঘটে নাই কেবল উপযুক্ত ভূমি এবং অবস্থার অনুমতি। নাট্য-ক্ষেত্রে সৃষ্টি চেষ্টায় ভাব-তন্ময় হইবার জন্য অদৃষ্ট-দেবী যেমন তাঁহাকে অবকাশ দেন নাই; সামাজিক পরিবেষ্টনীকেও তাঁহার সহকারী করেন নাই; ভাবপ্রকাশের উপযোগী ভাষা, ছন্দ এবং প্রয়োগ-প্রণালী পর্যন্ত সহজলভ্য করেন নাই। কবিকে সমস্তই 'করিয়া-কর্মিয়া' লইতে হইয়াছিল! সেক্‌স্‌পীয়রের পূর্বে যেমন চসার, স্পেন্সার, মার্লো ছিলেন, বঙ্গ সাহিত্যে মধুসূদনের স্বক্ষেত্রে তেমন কোন পূর্বসূরি ছিল না।

মনুষ্যজীবনের এই যে অপরিহার্য দুঃখতত্ত্ব, সংসারে মহৎ-জীবনের পক্ষেই অধ্যাত্মতঃ অপরিহার্য এই যে ভীষণ-করুণ দুরদৃষ্ট—ইহা সাহিত্যক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর কবিপ্রতিভার সামর্থ্য এবং কৃতিত্ব পরীক্ষার স্থল! উহাই দেবতার ইচ্ছা বা Fate-আদর্শবাদী গ্রীক-কবির মধ্যে আসিয়া প্রমীথিয়স্, ঈডিপস্, আন্তিগণ এবং আজেকস্ রচনা করিয়াছিল; গ্রীকপরিচয়-প্রভাবে ঐ দুঃখ-দৃষ্টিই মনুষ্যজীবনের পাপ-পুণ্য-সমর এবং পুরুষকার ও ঘটনা সংঘর্ষের গভীর তত্ত্বদর্শী হইয়া ম্যাক্‌বেথ্, হ্যাম্‌লেট্, ওথেলো এবং কিং লীয়র রচনা করিয়া আসিয়াছে; আধুনিক যুগে, খ্রীষ্টানী-আদর্শের প্রজ্ঞা লাভ করিয়া উহাই নবেলের ক্ষেত্রে Toilers of the sea এবং ঝেনোনী প্রভৃতির সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে। ভারতীয় হিন্দু-কর্ষণার পক্ষে উভয় দৃষ্টিভূমির সঙ্গেই সহানুভূতি করা কত সহজ এবং সুলভ তাহা পূর্বে সঙ্কেত করিয়াছি। অদ্বৈতবাদী, জন্মান্তরবাদী, কর্মফলবাদী এবং সকল অশুভ দৃষ্টান্তের মধ্যেও শুভতত্ত্বে দৃষ্টিশীল হিন্দুর চিত্ত গ্রীক এবং খ্রীষ্টান উভয়ের অপরূপ সামঞ্জস্য-ক্ষেত্রে আপনাকে স্থির করিয়াই ট্রাজেডি সিদ্ধি করিতে পারে—রামায়ণ-মহাভারতের সমাধান মধ্যে প্রত্যেক সূক্ষ্মদর্শী শিল্পীর সমক্ষে এই অতুলনীয় সামঞ্জস্যই প্রমূর্ত হইয়া আছে। ভারতীয় আদর্শের এই মহনীয় সম্ভাবনাকে আধুনিক সাহিত্য-জগতে অনুরূপভাবে প্রমূর্ত করার কর্তব্যটি এখন এদেশের আধুনিক শিল্পীমাত্রকে আহ্বান করিতেছে। সাহিত্য-জগৎ প্রাচীন-তন্ত্রে বীতস্পৃহ হইয়া, একঘেয়ে প্রাকৃতবাদে ঝালাপালা হইয়াই যেন নূতনত্বের জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়া আছে। বর্তমান ক্ষেত্রে জগৎকে নূতন কথা শুনাইবার ক্ষমতা এবং সঙ্গতি কেবলমাত্র ভারতবর্ষেরই আছে। আধুনিক ইয়োরোপেও বরং প্রকৃত গ্রীক-শিষ্যতার পরিচয় পাই, এ যুগের শ্রেষ্ঠ নাট্যকার হেবেলের ট্রাজেডিগুলির মধ্যে। যেমন গ্রীক্ আদর্শের, তেমন প্রকৃত ভারতীয় আদর্শের ট্রাজেডিও কি হইবে? ধর্মতার সংগ্রাম, অধ্যাত্মক্ষেত্রের ব্যক্তিত্ব-সংগ্রাম—আত্মধর্ম বা আত্মব্যক্তিত্ব রক্ষা করার জন্য অদৃষ্টের বিরুদ্ধে জীবনপণ সংগ্রাম—আপাততঃ নিহত হইয়াও ধর্মতার বিজয় লাভ—মৃত্যুর কবলগত হইয়াও আত্মধর্মের অমৃতলাভ! ইহা উচ্চতম ট্রাজেডির এবং মহত্তম কবি-

প্রতিভার সাধ্য-বিষয় নহে কি? এই মহাকর্ম যে মধুসূদনের ট্রাজেডি-প্রতিভার বীজশক্তির সুসাধ্য ছিল, 'মেঘনাদবধ' কাব্যের সমাধান তাহাই প্রমাণিত করে। উহা সংসাধিত হইতে পারে নাই। সুতরাং গ্রীক্-আদর্শের মহতী কারুণ্য-গাথা এবং উচ্চজাতীয় কাব্যের বিষয়ে বা উচ্চতম ধর্মতা-সংগ্রামের নাট্য-ট্রাজেডির বিষয়েও মধুসূদনের বংশাভাবের তত্ত্বই বরং দেদীপ্যমান হইয়া আছে।

নাট্য রচনার ক্ষেত্রেও মধু যে কবিত্বশক্তির সংযোগ করিয়াছেন উহাতে যুবক সেক্স্পীয়রের আত্মীয়তার গন্ধ পাইতেছি। শব্দ-সমষ্টির মধ্যে মধুসূদন যে আনন্দ সংগ্রহ করিতে জানিতেন, উহা মধ্যযুগের সংস্কৃত সাহিত্যে কেবল কালিদাসাদির মধ্যেই পাওয়া যায়। মধুসূদনের এই শব্দ-চিত্রের এবং শব্দ-সন্ধানের প্রবৃত্তিকেও 'নব্য'-বঙ্গের অপর কোন কবি অনুসরণ করিতে, কিংবা উহার উন্নতি বিধান করিতে পারেন নাই। হেমচন্দ্র ও নবীনচন্দ্র সেদিকে যা'ন নাই; রবীন্দ্রনাথও বিভিন্ন পথে আপন সাহিত্য-জীবনের অতুলনীয় সার্থকতায় উপনীত হইয়াছেন। বঙ্গ-ভাষা সোজাসুজিভাবে কত দূর ধরিতে পারে, কতদূর পর্যন্ত ভাবকে 'মূর্তিমান্' করিতে পারে, বঙ্গ-ভাষার আর্য-অংশের শক্তিই বা কতদূর, তাহার পরীক্ষা মধুসূদনের পর আর ঘটে নাই বলিলেই হয়। মধুসূদন যে বঙ্গ-সাহিত্যের অদ্বিতীয় ছন্দঃশিল্পী ও বাক্যশিল্পী, তাহা কখনও অস্বীকার করিতে পারা যাইবে না; ছন্দঃশিল্পী মধুসূদন বঙ্গভাষার অন্তরঙ্গশক্তি, উহার আর্য অংশের এবং দেশীয় অংশের সামর্থ্য কতদূর হৃদয়ঙ্গম করিয়াছিলেন, উহা তাঁহার অমিত্রছন্দের ও নবনব. মিশ্র ছন্দগুলির সমাধান এবং ধ্বনিতত্ত্বের মধ্যেই প্রত্যক্ষ হইয়া আছে। এক্ষেত্রে বঙ্গ-সাহিত্যে যুগান্তকারী যুগপুরুষ এই কবি! একটি জাতির হৃদয়দ্বার অপূর্ব-তর্কিত শক্তিপথে অবারিত করিবার সৌভাগ্য-গৌরবেই পূজনীয়পদে অধিষ্ঠিত কবি! বঙ্গাভিধানের ক্ষেত্রেও উহার নানা সমস্যার সমাধান বিষয়ে দৃঢ়সবল, উন্নতি-দৃষ্টি এবং উন্নতির আদর্শেই নিত্যসচেতন কবি! যেমন বলিয়া আসিয়াছি, ভাবকে পরিস্ফুট মূর্তিদান করাই সাহিত্য-জগতে সংস্কৃত

কবিগণের প্রধান মাহাত্ম্য। ভারতীয় ভাব-বুদ্ধি, ভারতীয় সাহিত্য-শিল্প-ধর্ম—সমস্তই মূর্তিবাদী! একদিকে মহা-অদ্বৈতবাদী হইয়াও ভারতবর্ষের অন্তরাত্মা চিরকাল ভাবকে মনুষ্যের জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অনুভূতিগম্য 'পরিকল্পনায়' স্থির করিতে এবং স্থায়ী করিতেই চাহিয়াছে। সঙ্গীততন্ত্রের অভাবনীয়, অনির্বচনীয় রাগ-রাগিণীকেই যেরূপে মূর্তিদান করিতে চাহিয়াছে! বলা বাহুল্য, সকল শিল্প-তন্ত্রের চূড়ান্ত কথা, এই মূর্তি! সকল কারিগরির প্রধান সঙ্কট-সমস্যাও মূর্তি-নিরূপণের ক্ষেত্রে। মূর্তি ব্যতীত কোন শিল্পই স্থায়ীভাবে দাঁড়াইতে পারে না। সেই আর্য-মাহাত্ম্যে প্রকৃত উন্নতিশীল উত্তরাধিকারী মধুসূদনের পর আর মিলে নাই। মধুকবির এই পৌরুষনিষ্ঠ রসানন্দ এবং ভাবের রসানন্দ-মধুর প্রমূর্তিবাদ হইতে বঙ্গ সাহিত্যের গতি ইদানীং দূর হইতে দূরতর হইয়াই চলিয়াছে।

তথাপি, স্বীকার করিতে হয়, মধুসূদন হইতে আমরা যাহা পাইয়াছি তাহার মূল্যই মানুষের একজীবনের পক্ষে যথেষ্ট। তাঁহার প্রত্যক্ষ উপার্জন-গুলিই মধুসূদনকে অমর করিয়াছে। বঙ্গ-সাহিত্যে মধুসূদনের অমর পদবী একটি স্বতঃ-প্রমাণিত উজ্জ্বল পদার্থ। উহা কোনরূপ সাম্প্রদায়িকতা অথবা ধর্মধ্বজার উপর সংস্থাপিত নহে যে, ধর্মরুচির পরিবর্তনে উহার মূল্য কমিয়া যাওয়ার আশঙ্কা হইবে; উহা এমন কোন দার্শনিক অথবা সামাজিক সমস্যা-ভঞ্জনের প্রতিজ্ঞা অথবা সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করিতেছে না যে, অদ্যকার দুর্লভ সত্য আগামীকল্য মামুলীকথা বা 'পচা কথা' হইয়া যাইবে। উহা মুখ্যতঃ মনুষ্যহৃদয়ের নিত্য-সত্য স্থায়ীভাবের উপর প্রতিষ্ঠিত। এজন্যই হয়ত সাহিত্য-দার্শনিকগণ কাব্যে স্থায়ীভাবের এত মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন! 'মেঘনাদবধ' মনুষ্যহৃদয়ের এমন একটি চিরস্থায়ী ভাব-ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়াছে যে, যে-পর্যন্ত এতদ্দেশে বাঙ্গালা-ভাষা-ভাষী মনুষ্য আছে, এবং ঐ মনুষ্যের হৃদয় বলিয়া পদার্থ আছে, যে-পর্যন্ত মনুষ্যজীবনের মধ্যেও দুরদৃষ্ট এবং দুঃখ-দুরবস্থার উৎপাত আছে, পুরুষকারের পরাজয় এবং সর্ববিনাশী নিষ্ফলতা আছে, সে-পর্যন্তই মধুসূদনের মাহাত্ম্য নষ্ট হইতে পারিবে না, সে-পর্যন্ত ঐ 'মেঘনাদবধ' পাঠ করিয়া, মানুষ কাঁদিয়া-কাঁদিয়াই মধুসূদনকে প্রেমালিঙ্গন দান করিবে।

মধুসূদন শিল্পের ক্ষেত্রে philosophyকে (দার্শনিকতাকে) ঘৃণা করিয়াছেন। কথাটা বুঝিতে পারিলেই আমরা 'কবি'-মধুসূদনকে প্রকৃত প্রস্তাবে জানিতে পারিব। মধুসূদন চিন্তা-শিল্পী নহেন, ভাব-শিল্পী। তিনি এক্ষেত্রেই প্রাচীন বাঙ্গালী কবিগণের বংশ-সূত্রে দাঁড়াইয়াছেন। বাহ্যিক শিক্ষাদীক্ষায় পূরাদস্তর ইয়োরোপীয় হইলেও মধুসূদন যে স্বভাবতঃ এবং অন্তরঙ্গতঃ 'বাঙ্গালী কবি' ছিলেন, উহা তাঁহার শিল্প-প্রণালীর 'জাতি' বিচার করিলেই বুঝিতে পারিব। বাঙ্গালী কবিগণের দৃষ্টি সাধারণতঃ চিন্তা (thought) অপেক্ষা ভাবের (sentiment) দিকেই সমধিক প্রবণতা দেখাইয়া আসিয়াছে। কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস হইতেই নাভি-সম্পর্কে মধুসূদন তাঁহার কবিত্বের রক্ত-সন্ততি লাভ করিয়াছিলেন। বাঙ্গালী কবিগণ—বিশেষতঃ কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাস—যে চিন্তা অপেক্ষা ভাবকেই মুখ্য করিয়া আর্যভারতের মহাকাব্যদ্বয়কে 'বাঙ্গালীমূর্তি' প্রদান করেন, তাহা সাহিত্য-চিন্তক-মাত্রকেই স্বতন্ত্রভাবে বুঝিতে হয়; আরও দেখিতে হয় যে, ভাবুকতাই হয়ত শিল্পের ক্ষেত্রে বাঙ্গালীত্বের সর্বপ্রধান লক্ষণ। বাঙ্গালী পাঠকের মধ্যেও, এখন যাবৎ, চিন্তাজীবী অপেক্ষা ভাবজীবীর সংখ্যাই অধিক আছে; এবং উভয়ের সমুচ্চ সামঞ্জস্য-সাধক শিল্পীর সংখ্যাও হয়ত এখন যাবৎ পরিমিত আছে। মনুষ্যমধ্যে সাধারণতঃ কাহারও idea, কাহারও বা sentiment প্রবল। হয়ত উহা রুচিভেদ ব্যতীত আর কিছুই নহে—সুতরাং এক্ষেত্রে কোনরূপে শ্রেষ্ঠতা-কনিষ্ঠতার নির্ধারণাও হয়ত দাঁড়াইতে পারে না। দেখা যা'ক, ভাব-শিল্পী কি করিয়া ফিলজফী (দার্শনিকতা) ঘৃণা করিয়া পারেন! কাব্যশিল্পের ক্ষেত্রে ফিলজফী-র প্রধান সামর্থ্য কি লইয়া? পদার্থের প্রাণতত্ত্বে যোগ বা অভিনিবেশ। পদার্থের যে-লক্ষণে কবি পাঠককে অভিনিবিষ্ট করিতে চাহেন, তাহাতে স্বয়ং দৃষ্টি-সিদ্ধ হইয়া, উহার সঙ্গে স্বয়ং যুক্ত হইয়াই পাঠককে অনির্বচনীয়ভাবে সংযুক্ত করিবার শক্তি! পদার্থ যে অধিপতি-লক্ষণে পাঠকের মনে মুদ্রা লাভ করে—স্ফুট প্রতীতির উৎপত্তি করে—অথবা কবি উহার যে লক্ষণে পাঠককে সুপ্রতীত করিতে লক্ষ্য রাখেন, তাহাকে ধরিতে পারা লইয়াই ভাবুকতার প্রধান শক্তি। কবি স্বয়ং পদার্থ তত্ত্বে যুক্ত

হইয়া, ভাষা-দ্বারে যে-কোন প্রণালীতে পাঠকের মনে উহার স্ফুটপ্রত্যয় উদ্রেক করুন না কেন, উহা পারিলেই তিনি সত্যের বর্ণনায় কবি-সিদ্ধি লাভ করিলেন। এ ক্ষেত্রে কেবল 'ফলেন পরিচীয়তে', ফলেই প্রমাণ! প্রকাশের ক্ষেত্রে কবির এই প্রত্যয়-সাধনের উপায়টির নাম দিতে পারা যায়—ভাষার 'মন্ত্র শক্তি'। সুতরাং, কবিত্বের প্রধান লক্ষণটাই যদি রস-প্রত্যয় বা আধুনিকের ভাষায় সৌন্দর্য-প্রত্যয় এবং সৌন্দর্যের অনুভাবনা হয়, তন্মধ্যেও এই স্ফুটনীশক্তি এবং ভাষার মন্ত্র-সিদ্ধির কার্যই তো দেখিতে পাইতেছি!

এখন, মধুসূদন ভাবুকতার এই স্ফুটনীশক্তি এবং ভাষার মন্ত্রশক্তি বিষয়ে যে অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন, philosophy ঘৃণা করিয়াও যে উহা আত্মসিদ্ধ করিয়াছিলেন, তাঁহার কাব্যগুলি প্রতিপদে তাহা প্রমাণ করিবে। মধুসূদনের বর্ণনা-প্রণালীর, বিশেষতঃ তাঁহার করুণ বর্ণনা এবং বিলাপগুলিরও অভ্যন্তরেই দৃষ্টি করুন! এই বর্ণনার বিশেষত্ব কি? উহার নাম দিতে পারি বৈচিত্ত্যভাব —রাস্কিন যাহাকে 'Pathetic fallacy' বলিয়াছেন, বৈষ্ণব রস-দার্শনিকগণের পথানুসারে বলিতে পারি, উহার নাম 'বৈচিত্ত্য'। কবিগণ যেমন ভাষার স্ফোটশক্তির সাহায্যে পদার্থের স্বরূপ বর্ণনা বা সত্য বর্ণনা করেন, তেমন রসাবিষ্ট মনের বিবর্ত এবং বিকার বর্ণনার পথেও রসোদ্রেক করেন। পদার্থের বিদ্যমানে-অবিদ্যমানতা এবং অবিদ্যমানে-বিদ্যমানতার আরোপ করিয়া, অতীতের সুখ-দুঃখময় স্মৃতি উদ্ঘাটিত করিয়া এবং ভবিষ্যতের আশঙ্কা জাগাইয়া মধুসূদন কি সহজভাবে পাঠকের হৃদয়কে করুণাবিষ্ট করিতেছেন! কোন দার্শনিক তত্ত্বোদ্গার এই সরলতা এবং এই সহজ কারুণ্যের সমান উপপত্তি দান করিতে পারে না! মধুসূদনের যে-কোন করুণ বর্ণনার অভ্যন্তরে দৃষ্টি করিয়াই বুঝিতেছি যে, কবি নিজের জন্মসিদ্ধ সহানুভূতি ও সত্যানুভূতির ভূমি হইতে এই ভাবযোগ এবং রসোদ্রেকের সারল্য (naivete)-রূপী অসাধারণ ফল চয়ন করিতে পারিয়াছিলেন। এই সারল্য আধুনিক তত্ত্ববাতিক-গ্রস্ত যুগে একেবারে দুর্লভ—ইহা প্রাচীন মহাক্‌বি হোমার ও বাল্মীকি-ব্যাসের আত্মসিদ্ধি। ফিলজফী না-ই বা থাকিল! এবং কবিও নামটি না-ই বা স্বীকার করিলেন!

অপরিসীম গ্রন্থ-পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও মধুসূদনের মধ্যে যে একটা নবতা এবং রস-মধুর 'তাজা ভাব' আছে, বালকত্ব-সুলভ লীলার লক্ষণ আছে, তন্মধ্যেই তাঁহার প্রধান কবিত্ব এবং তাঁহার মহাত্মতা। উহা ঠিক 'বুনো' নিসর্গের বা গিরি-নদী-সমুদ্রের এবং অরণ্যানীর 'তাজা ভাব' নহে; কলিকাতা সহরের 'ইডেন' উদ্যানের কৃত্রিমতা-সজ্জিত তাজা লক্ষণও নহে। উহা নগরের ইট-পাথর এবং গ্যাসালোক সম্পর্কের চৌহদ্দি হইতে বহু দূরে, ভাবুকতার ভারতসমুদ্র-বক্ষে নবদ্বীপভূত নবীন ব্যক্তিত্বের নিত্যরস-নবীন এবং মলয়জশীতল শ্যামলতায় পরিস্ফুট 'তাজা' ভাবের লক্ষণ। এস্থলেই মধুসূদন ক্ষিতিপরিব্রাজক এবং বিশ্বরস-গ্রাহী হইয়াও বঙ্গসাহিত্যের বাঙ্গালী কবি! এই সবল সরসতার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার মধ্যে ভাবুকতার কৌলীন্য এবং কণ্ঠের অভ্যুন্নতি! মধু বাঙ্গালার গ্রামীণ অথবা গ্রামণী যেমন নহেন, তেমন বাঙ্গালার 'ব্রাহ্মণ পণ্ডিতও' নহেন। যেমন বলিয়াছি, তিনি আধুনিক বঙ্গসাহিত্যের ক্ষেত্রে প্রথম বিশ্বতা-দীক্ষিত এবং বিশ্ব-অধিবাসী বাঙ্গালী। কাব্যের রসাত্মা-বিষয়ে তিনি প্রাচীন ঋষিপুত্র কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের শিষ্য; শিল্পতন্ত্রে বস্তু এবং ভাবের সামঞ্জস্যময় প্রবর্তন এবং প্রয়োগের প্রণালীতে তিনি হোমারের এবং হোমারশিষ্য ইয়োরোপীয় মহাকবিগণের পথানুবর্তী। তাই তিনি হোমারের বস্তুনিষ্ঠ পথে মেঘনাদবধ রচনা করেন; এবং হোমার-শিষ্য ভার্জিলের ঈনীড্ (Aenid) পথে 'সিংহল বিজয়' সূচনা করেন। ইয়োরোপের আধুনিক কবিতার যাহা প্রধান ঝোঁক অর্থাৎ কাব্যের মধ্যে কবির আত্মপ্রচার এবং আত্মভাবুকতা—সে বিষয়েও তাঁহার স্বল্পমাত্র সহানুভূতি। 'আত্মবিলাপ' এবং 'বঙ্গভূমির প্রতি' প্রভৃতি কবিতার অভ্যন্তরে ঐরূপে বায়রনী (Byron) দীক্ষা এবং বায়রনী অহং-সম্পর্কের লক্ষণটিই যৎকিঞ্চিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। প্রয়োগ-কলার এই 'বস্তুগত' রীতি এবং গ্রীক-আদর্শ গতিকেই ওয়ার্ডসোয়ার্থ (Words-worth), শেলী (Shelley) অথবা ব্রাউনিং (Browning) জাতীয় আত্মিকতা এবং ভাবুকতার সঙ্গে মধুসূদনের কিছুমাত্র সহানুভূতি অথবা মমতা-পক্ষপাত নাই। সৌন্দর্যের বস্তু-দৃষ্টি এবং রসাবিষ্ট তন্ময়তা বিষয়ে 'তিলোত্তমা-

সম্ভবে'র কবিকে বরঞ্চ ইংরেজী সাহিত্যের সেই 'আধুনিক প্যাগান' (Pagan) কীট্‌স্‌ (Keats) কবিরই সমধিক নিকটবর্তী বলিয়া অনুভব হইতে থাকিবে। সুতরাং, প্রতিভার 'জাতি', নির্ণয় করিয়া বলিতে পারি যে, কবিগণের কুলপঞ্জী মধ্যে মধুসূদন 'গ্রীক'! জন্মতঃ ভারতীয় হিন্দু ও শাক্ত এবং স্বীকারতঃ খ্রীষ্টান হইয়াও মধুসূদন তত্ত্বতঃ গ্রীক এবং প্যাগান। নিরপেক্ষ সৌন্দর্যবাদ, যাহার মধ্যে কোনরূপ তত্ত্ব-বাতিকগ্রস্ত দার্শনিকতা, ছায়াবাদিতা, রহস্যবিলাস অথবা ধর্মধ্বজিতা নাই, কোনরূপ ভাবোন্মত্ততাও নাই, অথচ যাহা কোনদিকে দুর্নীত, দুর্বিনীত অথবা শিল্পপাতকী নহে—যাহা অকুৎসিত-কর্মা, প্রকৃতিস্থ রস-ভাবে এবং সত্য-তন্ত্রে সংযত এবং সুস্থির—তাহা শিল্পের ক্ষেত্রে অব্যাকুল গ্রীক লক্ষণ। যে গ্রীক-জাতির মধ্যে কোনরূপ ধার্মিকতা অথবা ধর্মান্ধতা ছিল না, যাহাদের মধ্যে কোন 'বাইবেল' ছিল না, অথচ যাহারা আপনাদের সহজ ও সরল দৃষ্টি এবং শিল্প-দৃষ্টির সৌভাগ্যেই জীবনে, শিল্পে এবং সাহিত্যে অসুন্দর এবং কুৎসিত হইতে সুরক্ষিত ছিল! সংসার এবং জীবনের প্রতি আদিম বালক-দৃষ্টির সৌভাগ্যেই সত্য-শিব-সুন্দরকে চিনিয়াছিল! এই গ্রীক-লক্ষণ যেমন ভারতে, তেমন বঙ্গদেশের সাহিত্য-তন্ত্রেও নানা দিকে অভিনব; বাঙ্গালীর 'শাক্ত'-আদর্শের সঙ্গেই উহার সান্নিধ্য এবং নানাদিকে সামঞ্জস্য। মধুসূদনও নাকি অনেক সময় বলিতেন, 'লোকে আমাকে চিনিতেছে না, my writings are three-fourths Greek'. [মধুসূদনের এই মূল্যবান্‌ উক্তিটি, ৪ মাস হইল, তাঁহার সমসাময়িক বন্ধু অশীতিপর বৃদ্ধ শ্রীযুক্ত প্রিয়নাথ কর মহাশয় হইতে সংগ্রহ করিয়াছি—লেখক।]

মধুসূদনের মধ্যে কোন্‌ দিকে কি-কি অভাব আছে, বিশ্ব সাহিত্যের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া সে-সমস্তকে একে একে নিরূপণ করিবার জন্য ইহা স্থান নহে। উক্ত প্রকার আলোচনা হইতে হয়ত কোন সুফলও প্রত্যক্ষ করা যায় না। শিল্পের ক্ষেত্রে অভাবাত্মক প্রণালীর বা 'নেতি নেতি' প্রণালীর দ্বারা বিশেষ কোন লাভ হয় না বলিয়া, উহাতে আমাদের উদ্দেশ্যও হয়ত উজ্জ্বল হইবে না। দার্শনিকতার আদর্শে মধুসূদনের হৃদয় হয়ত 'পূর্ণ অভিষেক'

লাভ করে নাই; বিশ্বের এই বহির্মুখী সৌন্দর্য-কায়ার অন্তরালে, এই ছায়াপটের অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবার জন্য ক্ষমতাও হয়ত তাঁহার যথেষ্টমত প্রবল নহে। মনুষ্যহৃদয়ের গুপ্তগভীর রহস্য-রাজ্যে, মনুষ্যের জীবন-মধ্যে অবস্থা ও ঘটনা, উদ্দেশ্য এবং ক্রিয়ার নৈতিক দ্বন্দ্ব-বাজ্যে, সুখ-দুঃখ, ধর্মাধর্ম, মৃত্যু এবং অমৃতের ঘাতপ্রতিঘাতময় আন্তর-রাজ্যে হয়ত মধুসূদনের শিল্প-বুদ্ধির সচেতন অধিকার, সবিতর্ক এবং প্রশস্ত গতিবিধি নাই; মনুষ্যত্বের অধ্যাত্ম-ক্ষত-সমূহের জন্যও তাঁহার হস্তে সবিশেষ অমোঘ সুধালেপ নাই; মনুষ্যজীবনকে দিব্য-নেত্রে পরিদর্শন পূর্বক ভেষজ প্রয়োগ করিবার জন্য কোন স্বতন্ত্র দার্শনিক-পথেও তিনি হয়ত চূড়ান্ত উপনয়ন এবং উপায়-সিদ্ধি লাভ করেন নাই। কিন্তু, মধুসূদন শিল্পের ক্ষেত্রে সিদ্ধ কুলীনের সন্তান; কবিকুলে বনিয়াদি ভাব-জীবিতা এবং ভাবুকতা-রক্তের কৌলীন্য যে তাঁহার জন্মসিদ্ধ, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ হইতেছে না। না হইলে তিনি এই সহজ-সুন্দর এবং সঙ্গপাবন ভাবযোগ কোথায় পাইলেন? ভাবতত্ত্বে নির্বিকল্প-নিরায়াস পথে যুক্ত হইবার শক্তি—যে-যোগ লাভ করিলেই কবি স্রষ্টা এবং মন্ত্রদ্রষ্টা হইতে পারেন সেই শক্তি—অতর্কসিদ্ধ ভাবেই যেন তাঁহাকে পাইয়াছিল! উহার গতিকেই তাঁহার কাব্যের ঘটনা ও অবস্থার মধ্যে, উহার ছন্দমধ্যে, ভাষায় বাঁধুনির মধ্যে মন্ত্রশক্তি আছে, যাহার সংস্পর্শে অনির্বচনীয় এবং অবিতর্কিত পথেই পাঠক আকৃষ্ট ও মুগ্ধ হয়, যাহাতে তিনি কবি—হৃদয়বান্-পাঠক মাত্রেরই ভজনীয় কবি! তাঁহার সংস্পর্শ গঙ্গাজল এবং মলয়বায়ুর ন্যায় অনির্বচনীয় শক্তিতেই শীতল এবং অন্তরাত্মার স্ফূর্তিকর! এই জন্মকৌলীন্যের গতিকেই হয়ত তিনি নিজের বিতর্কবুদ্ধির অনধিকৃত, উচ্চতর এবং মহত্তর ক্ষেত্রেও পাঠককে তুলিয়া ধরিতে পারিতেছেন। যে-গুণে অরণ্যের আম-জাম এবং কামরাঙ্গা নিত্য পবিত্রা প্রকৃতির অনির্বচনীয় বিশেষ ধর্মেই, সহরতলীস্থ ময়রার দোকানের মিষ্টান্ন পদার্থ হইতে স্বতন্ত্ররসে নিত্যকাল হৃদয়গ্রাহী হইয়া আছে! উহা যেন স্বভাবে স্থিত মানবাত্মার স্বভাবপ্রিয় সহজ ফল! যেন সহরের কৃত্রিম উপবন এবং 'গরম ঘরের' আমদানীও নহে। মধুসূদন philosophy ঘৃণা

করিয়া থাকিলেও, সাহিত্যে দার্শনিকতার যাহা প্রধান শক্তি—পদার্থের প্রাণ-তত্ত্বে অভিনিবেশলাভ ও পাঠককে তন্মধ্যে অভিনিবিষ্ট করার শক্তি—তাহা যে তিনি স্বতঃসিদ্ধ ভাবেই পাইয়াছিলেন! 'তিলোত্তমাসম্ভব', 'ব্রজাঙ্গনা', 'বীরাঙ্গনা', 'মেঘনাদবধ'! ইহারা কবির ঐ স্বতঃসিদ্ধ ভাব-যোগের সহজ কৌলীন্যেই বঙ্গ-সাহিত্যে চিরকাল মহার্ঘ আসন লাভ করিতে থাকিবে।

মধুসূদনের সকল মাহাত্ম্যের চূড়ান্ত মাহাত্ম্য, বলিতে হয়, তাঁহার ছন্দরীতি অবলম্বনে পরিস্ফুট তাঁহার ব্যক্তিত্বটি! মধুসূদনের ছন্দের মধ্যে যে একটি মহাপ্রাণতা, সবলতা এবং উচ্ছ্বাসময়ী পূর্ণতা আছে, উহাকে আমরা স্বশক্তিতেই একটি 'মহাভাব' বলিয়া অন্যত্র উল্লেখ করিয়াছি। সাহিত্যের ক্ষেত্রে উহার মাহাত্ম্য কোথায়? আধুনিক নিয়মের কোন বুদ্ধিতন্ত্রীয় সূক্ষ্মতা, স্ত্রী-পুরুষের মনোবিকারের সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ-মূলক কোনপ্রকার ভাবুকতা, বহিঃ-প্রকৃতি বিষয়েও কোন প্রকার সূক্ষ্মতারসিক অভিনিবেশ, কোনরূপ Sentimentalism হয়ত উহার মধ্যে নাই; তথাপি উহা আপনার ওজনেই সাহিত্য-ক্ষেত্রে একটি মহাশক্তি! একটি পরমগভীর অনির্বচনীয় পদার্থ, অতুলনীয় কবিত্বেরই নিদর্শন! এ কবিতা পাঠ কর—তুমি হয়ত পরম আদরে মনস্থ বা মুখস্থ রাখার উপযুক্ত কোন ভাব বা কথা উহার মধ্যে পাইলে না, কিন্তু তুমি সমুদ্র-স্নান করিয়া উঠিলে! এই সমুদ্র-স্নানের ফল কি? তোমার অন্তরাত্মা একটি পরম গভীর উদাত্ত মর্মোচ্ছ্বাসের সংসর্গ লাভ করিয়াই সরল, সবল, পবিত্র এবং স্নিগ্ধ হইয়া উঠিল! তোমার বুদ্ধি উৎসাহিনী, উচ্ছ্বাসিনী হইয়া তোমার শিরা-উপশিরা শক্তিশালী করিল। তোমার অধ্যাত্ম-দেহও পেশল হইয়া উঠিল—উহাই তোমার সমুদ্র-স্নানের অতুল ফল! উহা সহৃদয়-বেদ্য এবং ভাল করিয়া উহাকে বুঝিতে-বুঝাইতে পারাটাই হয়ত শ্রেষ্ঠশ্রেণীর সাহিত্য-দার্শনিকের কার্য। মধু-সংসর্গী পাঠকগণ অন্তরে অন্তরে উহা অনুভব করেন, হয়ত বাক্যমুখে সম্পূর্ণ প্রকাশ করিতেই পারেন না। জগতের মহাকবিগণ সকলে অন্তরে অন্তরে মানবাত্মাকে এরূপ মহাভাবে স্নান করাইয়া উহাকে উল্লাসী, নিবেশী, বলিষ্ঠ এবং দিক্-দিগন্তদর্শী করিয়া তুলিয়াই সাফল্য এবং প্রতিষ্ঠা

লাভ করেন। হাজার মনস্তত্ত্বদর্শী সূক্ষ্মতায় কিংবা প্রকৃতবাদিতায় এ-মাহাত্ম্য লাভ করিতে পারে না। এই দিক হইতে দেখিবেন, বঙ্গের কোন কবিই হয়ত এ যাবৎ মধু-আত্মার সন্নিহিত হইতে পারেন নাই। যে-গুণে মিল্‌টন ইংরেজী সাহিত্যের পাঠকগণের, বিশেষতঃ উহার কবিগণেরই চির-পূজ্যতা লাভ করিয়া দাঁড়াইয়া আছেন, যাহার দরুণ হাজার তত্ত্ববাদী আধুনিকতাও তাঁহার মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে পারিতেছে না—মধুসূদন যাহাকে Divine বা দিব্য-মাহাত্ম্য বলিয়া প্রণাম করিয়াছেন—মধুসূদনও সে-জাতীয় একটি অসঙ্গ এবং অগম্য মাহাত্ম্যেই বঙ্গসাহিত্যে দাঁড়াইয়া রহিলেন!

এই কবির সকল রচনার মধ্যে, তাঁহার ভাবে, ভাষায়, ছন্দে এবং ভঙ্গীতে নির্বিশেষে ওতপ্রোত হইয়া যে শক্তি-পুত্র, যে ভাবজীবী, দুঃখ-সুখে ধৈর্যশীল-উদার ছন্দ-বিলাসী এবং প্রশস্ত বীর-হৃদয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে, উহার সামঞ্জস্যময় এবং একতা-অনুভাবক ব্যক্তিত্বেই মধুসূদনের প্রধান মাহাত্ম্য! তাহাই বঙ্গসাহিত্যে অনন্য-সুলভ, তাহাই দুর্লভ এবং মহার্ঘ! তাহাই বাঙ্গালী নিত্যকাল অমৃতবুদ্ধিতে পান করিয়া বলীয়ান্ হইবে—"আনন্দে করিবে পান সুধা নিরবধি।" দুঃখ-দৈন্য-দুর্দশার পুতনা-রাক্ষসী দিবারাত্রি চুমুকে-চুমুকে বুকের রক্ত পান করিতে থাকিলেও, যে অমর প্রতিভা-শিশুর হৃদয়তল-বাহিনী সুধার উৎসধারা কোনমতে শুকাইয়া তুলিতে পারে নাই, সেইরূপ অবিমিশ্র, বিকল্পবিরহিত, মনুষ্যের সহজদৃষ্টি-সমক্ষে অব্যাজসুন্দরী, মনুষ্যহৃদয়ের প্রত্যগনুভব-সমক্ষে নিত্য-মুগ্ধকারী, ভাবময়ী সুধা! এস্থলেই বঙ্গসাহিত্যে মধুসূদনের মধুশক্তিময় এবং মৃত্যুঞ্জয় মাহাত্ম্য!

পরিশিষ্ট (ক)

নির্ঘণ্ট

পরিশিষ্ট (খ)

গ্রন্থে ব্যবহৃত দুরূহ শব্দের অর্থ

প্রস্তুত গ্রন্থের পৃষ্ঠাঙ্ক	গ্রন্থে ব্যবহৃত শব্দ	অর্থ
৮৫	অধৃষ্য	অজেয় [ন-ধৃষ্ (পরাজয় করা) + য (র্ম)]
১২৯	অনৃজু	শঠ, কুটিল [ন = অন্ + ঋজু]
১২৯,১৩০	অনৃত	মিথ্যা [ন = অন্ + ঋত (সত্য)]
১৭২	অব্যাজসুন্দরী	সহজ সৌন্দর্যবিশিষ্টা [অব্যাজ = অ (ন)-ব্যাজ (কপটাচার)—সারল্য]
৮৫	অপরামৃশ্য	অস্পৃশ্য, অগ্রহণীয়, গ্রহণের অযোগ্য।
১৫৮	অবিক্লবা	প্রশান্ত, স্থির
৮৫	অভিমতি	বাসনা, উদ্দেশ্য, মত।
১৩৭	অমঙ্গল্য	অশুভ, অমঙ্গলজনক।
৩৮,৮৫	অরুন্তুদ	মর্মান্তিক, মর্মঘাতী।
৪৫,১৩১	অস্মিতা	অহংজ্ঞান, আমিত্ব।
৫২,৯৪,১০১	উল্বন	সুস্পষ্ট, বিশদ [উৎ (উপরি)-লু (যোগকরা) + অন্ (র্তৃ) নিপাতন]
৮১	উপপন্ন	সম্পন্ন, সিদ্ধ [উপ + পদ্ + ত (র্তৃ)]
১০১	উপপ্লব	উৎপাত, উপদ্রব [উপ-প্লু (গমন করা) + অ]
১১৭	উর্জস্বল	বলবান্, পরাক্রান্ত।
১৫৫,১৫৬	ঋদ্ধি	সম্পদ, শ্রী।
৯৪	কুলক	"এক কর্তা কিংবা একাধিক ক্রিয়াপদ দ্বারা চতুরধিক শ্লোকের অর্থ সমাপ্তি হইলে এই শ্লোক সমুদয়কে 'কুলক' বলে।"—জ্ঞানেন্দ্র মোহন দাস।

১৬০	দ্রঢ়িষ্ঠ	সুপ্রতিষ্ঠ।
১৬৯	দুর্নীত	অশিষ্ট, দুঃশীল।
৬০,৮৩	নির্জিত	পরাজিত, পরাভূত।
১২৪,১৬৬	নির্ধারণা	নির্ণয়, স্থিরকরণ।
৬৪	পরাবৃত্ত	জ্যামিতির হাইপারবোলা ('Hyperbola')।
৭৫	পরামৃষ্ট	সম্যক্ বিবেচিত, সম্পর্কিত, সংস্থ্ৃষ্ট।
১০	প্রক্রান্ত	তিরোহিত, দূরীকৃত।
১০১	বিজৃম্ভণ	বিকাশ, বিস্তার, ইচ্ছা।
১৪৬	বিচিকিৎসা	সন্দেহ, সংশয়।
১০৬	বিপ্রতিষিদ্ধ	নিষিদ্ধ [বি (বিশেষরূপে) + প্রতিষিদ্ধ (নিষিদ্ধ)]
১৩৬	ব্যাহতি	নিবারিত, বিফলীকৃত।
১৬৭	বিবর্ত	পরিণাম।
৬২	ভাবযুষ্ট	ভাবসমৃদ্ধ।
১৫৩	ভাববত্তর	অধিকতর ভাবসমৃদ্ধ।
১৩	রিক্থ	স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, ধন।
৯২	রিষ	হিংসা, দ্বেষ [সংস্কৃত ঈর্ষা > রীষ, কিন্তু 'রিষ' ব্যবহারও চল্‌ছে]
৪৪	শেমুষী	প্রজ্ঞা, জ্ঞান।

পরিশিষ্ট (গ)

মধুসূদনের ইংরেজী পত্রাবলী থেকে উদ্ধৃতি

পৃঃ ৩৯—'My life is more busy than that of a school-boy. Here is my routine: 6-8 Hebrew; 8-12 School; 12-5 Greek; 2-5 Telegu and Sanskrit; 5-7 Latin; 7-10 English. Am I not preparing for the great object of embellishing the tongue of my fathers.'

—মাদ্রাজ থেকে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

পৃঃ ৪০—'You must not fancy, my good friend, that I am idling here. I have nearly mastered French and Italian and am going on with German, all without any assistance from hired teachers….' '…Spanish and Portuguese will not be difficult after Latin, French and Italian…'

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে Versailles থেকে বিদ্যাসাগরকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

পৃঃ ৪৬—'….I am an enemy to what men call 'custom'… I have to teach the world something new. Don't get offended. Behold I have written a Sonnet in Blank Verse! What a rare experiment!…I have laid my scene in the Planet Saturn, because I despise everything earthly'.

'Evening in Saturn'—a sonnet in Blank Verse dedicated to a pigmy.'

—মধুসূদনের ১৭।১৮ বৎসর বয়সের রচনা।

পৃঃ ৫৪—'Ram Narayon's 'version', as you justly call it, disappoints me. I have at once made up my mind to reject his aid. I shall either stand or fall by myself. I did not wish Ram Narayon to recast my sentences—most assuredly not. I only requested him to correct grammatical blunders, if any. You know that a man's style is the reflection of

his mind, and I am afraid there is but little congeniality between our friend and my poor self. However, I shall adopt some of his corrections.'

—১৮৫৮ খৃষ্টাব্দে গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

পৃঃ ৫৭—'…Remember, that I am writing for that portion of my countrymen who think as I think, whose minds have been more or less imbued with western ideas and modes of thinking; and that is my intention to throw off the fetters forged for us by a servile admiration of everything Sanskrit…

Don't let thy soul be perturbed, old cock, for I promise you a play that will astonish the old…in the shape of Pandits.'

—গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

পৃঃ ৬৩—'…Now that I have got the taste of blood, I am at it again. I am now writing another play…'

গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ (.১৯ মার্চ, ১৮৫৯)

পৃঃ ৬৪—৬৫—'I am aware, my dear fellow, that there will, in all likelihood, be something of a foreign air about my Drama; but if the language be not ungrammatical, if the thoughts be just and glowing, the plot interesting, the characters well maintained, what care if there be a foreign air about the thing? Do you dislike Moore's poetry because it is full of orientalism? Byron's poetry for its Asiatic air, Carlyle's prose for its Germanism?'

—গৌরদাস বসাককে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ।

পৃঃ ৭০—'…You know that as yet we have not established a National Theatre, I mean we have not as yet got a body of sound, Classical Dramas to regulate the national taste, therefore we ought not to have Farces…'

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ (২৪ এপ্রিল, ১৮৬০)

পৃঃ ৭৬-৭৭—'...The book ('Tilottama') will come out soon, but the question is how many will read it. It is a pity you are not in Calcutta. If you were, I should have teased you to give lectures on the work.......I am afraid you think my style hard, but, believe me, I never study to be grandiloquent like the majority of the 'barren rascals' that write books in these days of literary excitement. The words come unsought, floating in the stream of (I suppose I must call it) Inspiration ! Good Blank Verse should be sonorous and the best writer of Blank Verse in English is the toughest of poets—I mean old John Milton! And Virgil and Homer are anything but easy. But let that pass. You no doubt excuse many things in a fellow's First poem. I began the poem in a joke, and I see I have actually done something that ought to give our national Poetry a good lift, at any rate, that will teach the future poets of Bengal to write in a strain very different from that of the man of Krishnagar—the father of a very vile school of poetry, though himself a man of elegent genius.'

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ (২৪ এপ্রিল, ১৮৬০)

পৃঃ ৭৮-৭৯—'...If I am spared, I intend to write 3 or 4 more plays of the classical kind just to give our countrymen a taste for the species of the drama, and then take up historical and other subjects. The subject you propose for a national epic is good—very good indeed. But I don't think I have as yet acquired a sufficient mastery over the 'Art of Poetry' to do it justice. So you must wait a few years more. In the meantime, I am going to celebrate the death of my favourite Indrajit. Do not be frightened, my dear fellow, I won't trouble my readers with 'vira rasa' (বীররস). Let me write a few Epiclings and thus acquire a pucca fist.

—(ঐ)

পৃঃ ৮০—'...He (Indrajit) was a noble fellow, and, but for that scoundrel Bivishan, would have kicked the monkey-army into the sea. By the bye, if the father of our Poetry had given Ram human companions, I could have made a regular Illiad of the death of Meghnad.…'

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত মধুসূদনের পত্রাংশ (১৪ জুলাই, ১৮৬০)

পৃঃ ১১১-১১২—'...I only hope I have given the Episode ('মেঘনাদ বধ') as thorough a Hindu air as possible. I never like to conceal anything from you, so that you must not think me vain if I say that in my heart I begin to believe that this Meghanad is growing to be a splendid Poem! I fancy the versification more melodious and Virgilian and the language easy and soft. You will probably miss in this Poem the rather roughish elevation of its predecessor."

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

পৃঃ ১১২—'I shall not conceal from you that some parts of it fill my heart with adulation. I had no idea, my dear fellow, that our mother tongue would place at my disposal such exhaustless materials, and you know I am not a good scholar. The thoughts and images bring out words with themselves,—words that I never thought I knew. Here is a mystery for you.'

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

পৃঃ ১১৭-১১৮,—'…He who is 'beautiful', 'tender,' and 'pathetic', with a dash of 'sublimity', is sure to float down the stream of time in triumph. All readers are sure to unite in loving and adoring him. Look at the Sanskrit Kalidas, the Latin Virgil, the Italian Tasso. I don't think England has a single poet worthy of being named with these; her Milton is a grander being. Like his own Satan, he is full of the loftiest thoughts but has little or

nothing that may be called amiable. He elevates the mind of the reader to a most astonishing height, but he never touches the heart. And what is the consequence? He has a glorious name but few readers. He is Satan himself. We acknowledge him to belong to a far superior order of beings; but we never feel for him. We hear the sound of his ethereal voice with awe and trembling. His is the deep roar of a lion in the silent solitude of the forest.'

—রাজনারায়ণ বসুকে লিখিত

পৃঃ ১১৮—'...In reading over my poem, you must look—1st to the imagery; 2nd to the language in which those images and thoughts are expressed; 3rd to the individual flow of each verse. Do not care for the general effect. Time will look to that. If I have succeeded in the above-mentioned particulars,—that is to say, if there is good poetry in the book, expressed in elegant and choice language, and if each verse is musical, then my friends need not be troubled on my account. The Book will float up—if not to-day or to-morrow, at least thirty years hence'.

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

পৃঃ ১৪০—'...I have tried to represent Juggut Sing as I find him in History, a somewhat silly and voluptuous fellow; Bheem Sing as a sad, serious man. ...The queen of such an unfortunately Prince, as the Rana Bheem Singh, cannot but be sad and grave ...'

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত (১ সেপ্টেম্বর ১৮৬০)

পৃঃ ১৪০—'...As the play is a tragedy, I have not thought it proper to begin any scene with the determination of being comic; in my humble opinion such a thing would not be in keeping with the nature of the Play.—But whenever in the course of the dialogue a pleasant remark has

suggested itself I have not neglected it. The only piece of criticism I shall venture upon, is this ;—never strive to be comic in a tragedy ; but if an opportunity presents itself. unsought to be gay, do not neglect it in the less important scenes, so as to have an agreeable variety. This I believe to be Shakespeare's plan. Perhaps, you will not find many scenes in his higher tragedies in which he is studiously comic."

—(ঐ)

পৃঃ ১৪১—'...I must here tell you, my dear G, what, I dare say, you will allow at least to some extent, viz, that we Asiatics are of a more romantic turn of mind than our European neighbours. Look at the splendid Shakespearean Drama. If you leave out the Mid Summer Nights' Dream, Romeo and Juliet and perhaps one or two more, what play would deserve the name of Romantic ? Romantic in the sense in which Sacoontala is Romantic ? In the great European Drama you have the stern realities of life, lofty passion and heroism of sentiment. With us it is all softness, all romance. We forget the world of reality and dream of Fairylands. The genius of the Drama has not yet received even a moderate degree of development in this country. Ours are dramatic poems ; and even Wilson, the great foreign admirer of our ancient language, has been compelled to admit this....'

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

পৃঃ ১৪২—'..In the Sarmista, I often stepped out of the path of the Dramatist, for that of the mere Poet. I often forgot the real in search of the poetical. In the present play I mean to establish a vigilant guard over myself. I shall not look this way or that way for poetry ; if I find

her before me I shall not drive her away; and I fancy, I may safely reckon upon coming accross her now and then. I shall endeavour to create Characters who speak as nature suggests and not mouth mere poetry. The proof of the Pudding, however, is in eating, and I hope to send you the First Act in time to enable you to read it with Jotinder Baboo (Jatindramohan Tagore) next Sunday. As for the language, the Drama to be written in, I shall follow Dr. Johnson's advice:—"If there be", says he, "what I believe there is, in every nation a style which never becomes obsolete, a certain mode of phraseolgy so consonant and congenial to the analogy and principles of its respective language, as to remain settled and unaltered, this style is to be probably sought in the common intercourse of life, among those who speak only to be understood, without the ambition of elegance". And he commends Shakespeare for having adopted this language; and this advice I mean to adopt except where the thoughts rise high of their own accord and clothe themselves with loftier diction, and that will be in the more Tragic parts of the play'.

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত

পৃঃ ১৪৩—'...Believe me, my dear fellow, our Bengali is a very beautiful language, it only wants men of genius to polish it up. Such of us as, owing to early defective education, know little of it and have learnt to despise it, are miserably wrong. It is, or rather, it has the elements of a great language in it. I wish I could devote myself to its cultivation, but, as you know, I have not sufficient means to lead a literary life and do nothing in the shape of real work for a living. I am too poor, perhaps, too proud to be a poor man always. There is no honour to be got

in our country without money. If you have money, you are বড়মানুষ; if not, nobody cares for you! We are still a a degraded people. Who are the 'বড়মানুষ' among us? The nobodies of Chorebagan and Barrabazar! Make money, my boy, make money. If I haven't done something in the literary line, if I do possess talents, I have not the means of cultivating them to their utmost content and our nation must be satisfied with what I have done!'

—গৌরদাস বসাককে লিখিত (Versailles, France, ২৬-জানুয়ারী, ১৮৬৫)

পৃঃ ১৪৮-১৪৯—'...Take my word for it, that Blank verse will do splendidly in Bengali and that in course of time like the modern Europeans, we too shall equal, if not surpass, our classic writers. What we want at present are men of zeal, of diligence, of energy, of enthusiasm, of liberal views to give our language a jolly lift. If we have no 'genius' among ourselves, let us prepare the way for future ones. Have you ever heard of Sackville—Lord Bluckhurst, born in 1527? (*) This nobleman's play, called 'Gorboduc' first introduced to Englishmen the form of verse in which William Shakspeare wrote. My motto is, 'Fire away, my boys!' The Namby-Pamby-Wallahs—the imitators of Bharat Chunder—our Pope, who has—

'Made Poetry a mere mechanical art,
And every warbler has his tune by heart!'

may frown or laugh at us, but I say—'Be hanged'—to them!'

—কেশবচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়কে লিখিত।

* সমসাময়িকালে প্রাপ্ত উপাদান থেকে মধুসূদন Sackville-এর জন্ম ১৫২৭ খৃষ্টাব্দ বলে নির্দেশ করেছেন। কিন্তু Sackville-এর এই জন্ম সালটি সঠিক কিনা সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে। বিভিন্ন গ্রন্থে এ বিষয়ে যে মতানৈক্য প্রকাশ পেয়েছে সে-বিষয়ে কৌতূহলী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্যে কয়েকটি প্রতিনিধিমূলক গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতি দেওয়া গেল:

(১) Encyclopaedia Britannica—Vol-19 (Edition 1947) page 796 Sackville-এর জন্ম ১৫৩০—মৃত্যু ১৬০৮

(২) The Columbia Encyclopedia (Second Edition, 1950) page 1728—Sacville ১৫৩৬—১৬০৮

(৩) Webster's Biographical Dictionary (First Edition) page 1299—Sackville ১৫৩৮—১৬০৮

(৪) Chambers's Biographical Dictionary (Edition—1946) page 815—Sackville ১৫৩৬—১৬০৮

পরিশিষ্ট (ঘ)

শুদ্ধিপত্র

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৯ (৪৯)	১৯ (৫)	হিন্দু	হিন্দু
২৯	২	নাকে	নাক
”	১৮	ফু্ঁ	ফুঁ
৩৯	১৬	ell win	well in
৪৩	১১	উৎতবে	উৎসবে
৪৪	৩	সে মুষীরূপে	শেমুষীরূপে
৫৬	১৫	প্রস্তাবন	প্রস্তাবনা
৭১	১২	মৃতি	মূর্তি
৮০	৮	রুপে	রূপে
৮৭	২৩	Chateaubriand's···	Chateaubriand's 'Rene'.
১০৫	৬	অরিতাকার্যরপেই	অরিতা-কার্যরূপেই
”	১২	প্রতিদ্বন্দ্বী	অপ্রতিদ্বন্দ্বী
১১১	১৯	সহৃতশক্তির	সহৃতাশক্তির
১১২	১৪	কবর	কবির
১১৩	১৫	......	Our
১১৯	১৮	গাহত	গর্হিত
১২০	১৫	খণ্ডাকাব্য	খণ্ডকাব্য
১২৪	১	গতকে	গতিকে
১২৮	১৪	আধূনিক	আধুনিক
১৪৪	৮	ক, হেয়	কি হেয়
১৫৫	৫	বাণীপুত্রগণকে	লক্ষ্মীপুত্রগণকে